স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪—জুন, ১৯১৭।

সূচী

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
মিলনে (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	...	৪১
শীলা (উপন্যাস)	...	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	...	৪২
হতাশের গান (কবিতা)	...	শ্রীমতী লতিকা দেবী	...	৪৬
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত	...	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি এল্	...	৪৭
সোণার দেশ (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	...	৫১
পূজার কথা	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়	...	৫১
উল্টা সৃষ্টি	...	শ্রীমতী লতিকা দেবী	...	৫৫
আয় ফিরে আয় (কবিতা)	...	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	...	৬২
মৃত-সৎকার	...	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র সাহা	...	৬৩
শোকাশ্রু (কবিতা)	...	শ্রীবীরকুমার বধ রচয়িত্রী	...	৬৫
গানের স্বরলিপি	...	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	...	৬৭
নমিতা (উপন্যাস)	...	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, স্বরসতী		৬৯
শোকোচ্ছ্বাস (কবিতা)	...		...	৭৬
স্ত্রীর কর্ত্তব্য	...	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	...	৭৭
পুস্তক সমালোচনা	...		...	৮০

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।
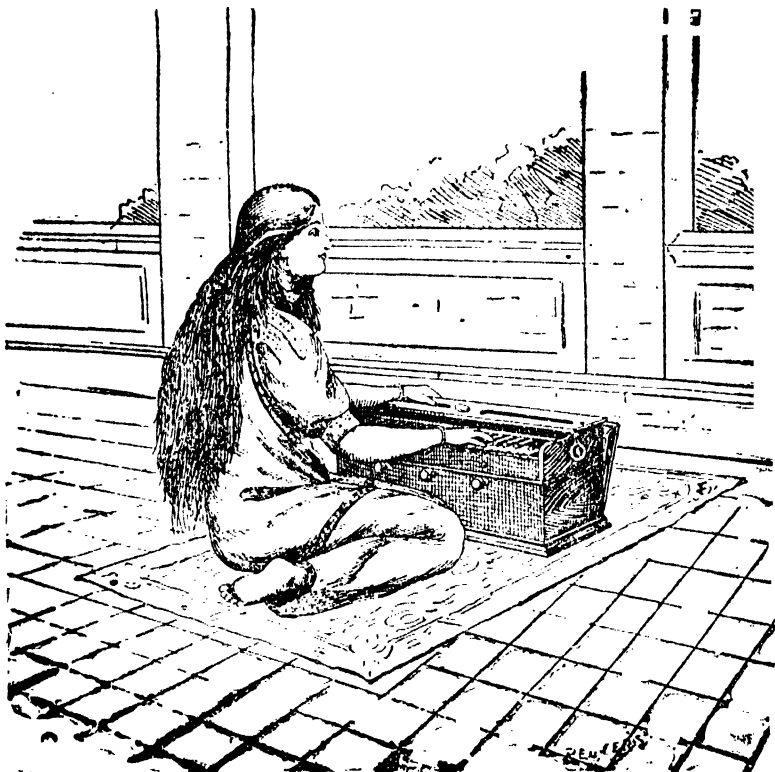
নিবেশ করিলেন; অপর ভদ্রলোকটী আমার পার্শ্বে বসিয়া নানারূপ কথোপকথনে আমাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। যদ্যপি তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তথাপি তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও কোমল আমন্ত্রণে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ছাত্রাবাস হইতে আমার পরমহিতৈষী বন্ধুবর বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন; তিনি এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। গাড়ী ছাড়িবার অধিক বিলম্ব নাই। তাঁহাকে বিদায় দিতে প্রাণে একটু কষ্ট হইল; তিনি আমার অসময়ের বন্ধু; আমার অজ্ঞাতে আমার জন্য যে কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও উপকার করিতে পারি নাই—আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত বল নাই। তাঁহার কথা ভাবিতে ভাবিতে হাবড়া ষ্টেসন ছাড়িয়া অনেকদূর চলিয়া আসিলাম।

নিবিড় তমসাচ্ছন্না রজনী—বাহ্যপ্রকৃতির কিছুই নয়ন-গোচর হয় না। সঙ্গিগণের অনুকরণে দেহ বিস্তার করিবা-মাত্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

অতিপ্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, গয়া-ষ্টেসন আরও ১৷৷০ ঘণ্টার পথদ্বারা ব্যবহিত; উষারাগ-রঞ্জিতা মধুময়ী প্রকৃতি মৃদু মৃদু হাসিতেছে! কি অপূর্ব্ব সে দৃশ্য! প্রভাত-সমীরণ উভয়পার্শ্বস্থ নিবিড় শালবন কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, মৃদু হিল্লোলে নাতিদীর্ঘ-তরুরাজি বেপথুমতী—বুঝি, একে অন্যের নিকট অস্ফুট-কণ্ঠে প্রাণের আবেগ জ্ঞাপন করিতেছিল! অরুণোদয়ে বালুকাময় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সোনার কিরণ ছড়াইয়া পড়িল, আর তৃণ-গুল্ম-সমাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি অনতিদূরে মধুচক্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল! চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র, মধ্যে ঘন-সন্নিবিষ্ট পর্ব্বতরাজি;—যেন বিশ্রাম-প্রয়াসী অর্দ্ধশয়ান করিযূথ! আবার বহুদূরে অত্যুচ্চ প্রস্তরময় পর্ব্বত-গুলি কৃষ্ণ-নীরদবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল।

অক্লান্ত গতিতে আমাদিগের গাড়িখানি দীর্ঘ বিসর্পিত লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া ছুটিতেছে—বিরাম নাই। অকস্মাৎ সব অন্ধকার—সব স্তব্ধ! সেই বাল-রশ্মি-বিধৌত বালুকাময় প্রান্তর—বুঝি বা, সমস্ত জগৎ—মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও করালবক্ত্রে প্রবেশ করিতেছিল, তাই এই বিচিত্র অনুভূতি! বোধ হইল, যেন আমরা এক ভয়াবহ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলাম। সেই নিবিড় অন্ধকারে ক্ষণকালের জন্য দৈত্যকুলের ভৈরবনাদের ন্যায় ভীষণ হুঙ্কার শ্রুত হইল; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই অরিকুলকে যেন ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিয়া বিজয়-গর্ব্বে আমাদের গাড়ী-খানি দ্বিগুণতর বেগে বাহিরে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। এবম্প্রকার অভিনব অভি-জ্ঞতার মধ্য দিয়া আমরা তিনটী 'টানেল' অতিক্রম করিলাম।

প্রাতে ৬টার সময় আমাদের গা[illegible] ষ্টেসনে উপনীত হইল। অমনি [illegible] দল, "চাই পুরী, কচুরী", "[illegible] ইত্যাদি নানাপ্রকার বি[illegible] বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দি[illegible] ও-দিক্ ছুটাছুটি ক[illegible] আরোহী অবত[illegible] কবলে কব[illegible]

ভাষায়।
শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী।

মুখ-হাত ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

আমাদের কামরায় ইত্যবসরে তৎপ্রদেশীয় পাঁচজন অভ্যাগত আসিয়া স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে ব্যস্ত; সকলেই থাকিয়া থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী আধার হইতে তাম্বূল-রচনান্তে চর্ব্বণ করিতেছিলেন;—সকলেই প্রৌঢ়, অথচ বেশ বিলাসী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিস্তীর টুপী তাঁহাদের শিরোদেশের মধ্যভাগ অতিসন্তর্পণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে;—অনাবৃত স্থানে নাতিদীর্ঘ কেশরাশি বক্রাকারে শোভা পাইতেছে। এই বেশ-বিন্যাসে তাঁহাদের যে একটী একতার আভাস পাইয়াছিলাম তাহা বঙ্গদেশে অতিবিরল।

গয়া-ষ্টেসন ছাড়িয়া ট্রেন দ্রুত-গতিতে চলিল। সৌরকরতপ্ত বালুকারাশি উত্তাপ বিকীরণ করিতেছিল। অকস্মাৎ ট্রেণের গতি সংযত হওয়ায় উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিলাম, একটী সুবৃহৎ সেতুবন্ধ; নিম্নে প্রশান্ত শোননদ দেহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে;—তাহাতে গর্জ্জন নাই, কল্লোল নাই, তরঙ্গের উৎক্ষেপ নাই, তরঙ্গভঙ্গ নাই; উভয়পার্শ্বে বালুকা-বিস্তীর্ণ পুলিন। বহুদূর পর্য্যন্ত স্বচ্ছ- ও বালুকারাশি ব্যতীত আর -গোচর হয় না। অমিত বলে ীর-গম্ভীরভাবে শোননদ যেন তেছে! তাহাতে তাহার নাই। কিন্তু প্রাবৃট্- নিতান্ত অসংযত করিয়া ভীম- 'লত্ব উপ- লব্ধি করিতে করিতে আমরা বহুদূরে চলিয়া গেলাম, কিন্তু তথাপি সেতুবন্ধের শেষ নাই! এতাদৃশ সুদীর্ঘ সেতু-বন্ধ আমার ক্ষুদ্র কল্পনায় সম্ভব হয় নাই।

বেলা ৯॥টার সময় মোগলসরাই-ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। ইহা একটী সুবিখ্যাত জংসন। এ স্থানে আউধ্-রোহিলখণ্ড রেলপথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-পথ সহ মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে অহোরাত্রব্যাপী যাত্রিকুলের কোলাহল এবং ব্যস্ততা! আমরা বোম্বে-মেল হইতে অবতরণ করিয়া, ওভারব্রীজ (overbridge) দিয়া ষ্টেসনের অপর-পার্শ্বস্থ প্লাট্‌ফরমে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহার পর জনতা ঠেলিয়া বহুকষ্টে একটী মধ্যম-শ্রেণীর কামরার নিভৃত কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিলাম।

এইবার সঙ্গিগণ সব বাঙ্গালী। গাড়ী অনেকক্ষণ প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইল। ইত্যবসরে অনেকেই সন্দেশাদি ক্রয় করিয়া গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। আমি নিশ্চেষ্ট; ভাবিলাম, লোকগুলি বড়ই উদর-পরায়ণ। একজন বৃদ্ধ একটী রোরুদ্যমান শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গিনীদিগের দূরত্বের জন্য নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন। কারণ, তাঁহার পরিবারাদি সকলেই স্ত্রীলোকদিগের কক্ষে।

এই সময় এক প্রামাণিক আসিয়া এক সুন্দরদর্শন যুবকের চিবুকে সফেন-তুলিকা-ঘর্ষণান্তে ক্ষৌর-চালনা করিয়া দিল। কিয়ৎকাল-মধ্যেই যুবকের বদনাকৃতি সংশোধিত হইল। আমার মনে পড়িল, দ্বিজেন্দ্র-

বাবুর কথা। বর্দ্ধমান ষ্টেসনে এমনই ভাবেই স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলালের হরিনাথ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। ধন্য কবিবর, ধন্য তোমার স্বাভাবিকী কল্পনা! তুমি নূতনভাবে যে হাসির উৎস ছুটাইয়া দিয়াছ, তাহা যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া বঙ্গের প্রত্যেক প্রাঙ্গণে প্রবাহিত থাকিবে।

গাড়ী মোগলসরাই ছাড়িয়া দ্রুতবেগে ছুটিল। রাস্তার দুইধারে কত কি দেখিলাম, মনে নাই; তখন উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ক্ষণকাল পরেই সেই পুণ্যদৃশ্য দেখিতে পাইব, নয়ন-মন সার্থক হইবে! যে পুণ্য তীর্থের নাম-স্মরণে মুমূর্ষু পুলকিত হয়, বৃদ্ধের জীর্ণদেহে বল-সঞ্চার হয়—পাপী তাপীর প্রাণ শীতল হয়, আজ কত সুকৃতির ফলে প্রাণ ভরিয়া তাহা দেখিব, জীবন ধন্য হইবে! এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমরা গন্তব্যস্থানের মধ্যবর্ত্তী ডফ্‌রীন সেতুর উপর আসিয়া পড়িলাম। গঙ্গার উপর সেই ডফ্‌রীন সেতু। তথা হইতে কাশীধামের দৃশ্য অতীব রমণীয়! দেখিলাম, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পূত-সলিলা জাহ্নবী পুণ্যতীর্থকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঘন-সন্নিবিষ্ট শুভ্র হর্ম্ম্যাবলী দেবাধিদেব বিশ্বনাথের পবিত্র হাস্যরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হইল। স্থানে স্থানে পবিত্র মন্দির-চূড় ত্রিদিবের সহিত পুণ্যতীর্থের নৈকট্য প্রতিপাদন করিতেছিল। গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় গতিশীল জনস্রোত! পবিত্র সলিলে অসংখ্য তরণী নাচিতেছে! এই পরম-রমণীয় দৃশ্য সন্দর্শনে প্রাণমন ভক্তিরসে আপ্লুত হইল; বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম।

অদূরে কাশী-ষ্টেসন (রাজঘাট)। ষ্টেসনের উপকণ্ঠে একটী ধরমশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়া এই ষ্টেসনেই অবতরণ করিলাম। অমনি দানবরূপী পাণ্ডাকুলের ভীষণ উপদ্রব। তাহাদের হস্তে নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রিগণের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। এই নিরক্ষর অর্থগৃধ্নু পাণ্ডাগণ শান্তিধামকে সর্ব্বক্ষণ ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছে; তাহাদের তাড়নায় ভক্তির উৎস শুষ্ক হইয়া যায়—প্রাণে দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

যাহা হউক, তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া একজন কুলীকে প্রদর্শক নির্ব্বাচনান্তে দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই ধরমশালায় উপনীত হইলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে কুলীপ্রবর দ্বিতলের একটি কক্ষে দ্রব্যজাত রক্ষা করিয়া, ঘরটী পরিষ্কার করিয়া দিল এবং ধরমশালার একজন ভৃত্যকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থলে এরূপ সহানুভূতি বিশেষ কার্য্যকরী, সন্দেহ নাই। ভৃত্যকে পুরস্কারের আভাস দিয়া, যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

ধরমশালাটী একটী সুবিস্তীর্ণ দ্বিতল চক্‌মিলান। প্রায় তিনশত লোক একত্রে অবস্থান করিতে পারে, এরূপ সুবন্দোবস্ত অ[illegible] ভিতরে একটী প্রাঙ্গণ, তাহাতে যা[illegible] ব্যবহারার্থ কুসুমোদ্যান এবং [illegible] আছে। এই ধর্ম্মশালায় [illegible] সংখ্যা অতিবিরল।

ক্ষণকাল বিশ্রামে [illegible] দেশানুসারে ক[illegible] স্নানার্থ গঙ্গার [illegible]

[illegible]রী, [illegible]র ভাষায়।

শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। চতুর্দ্দিক্ ধূলি-সমাচ্ছন্ন। সৌরকরতপ্ত রাজপথে ঘুরিতে ঘুরিতে গঙ্গা খুঁজিয়া পাইতেছি না; অবসন্ন হইয়া যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সকলেই গঙ্গার নৈকট্য জ্ঞাপন করে। অবশেষে প্রায় দুইক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক সঙ্কীর্ণ গলিমুখে উপনীত হইলাম ও আরও কত দূর যাইতে হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অবশেষে অগণিত প্রস্তর-সোপানাবলী অতিক্রম করিতে করিতে কেদার-ঘাটে নামিয়া একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম।

সহর হইতে গঙ্গা বহু নিম্নে। এজন্য তাহাকে নিকট হইতেও খুঁজিয়া পাওয়া না। অত্যুচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর ও সোপা-ত সহরটী সুরক্ষিত। খরস্রোতা গঙ্গা পাছে এই অমূল্য রত্নকে মা লেন, এইজন্য মানবের এত পায়। গঙ্গার অপর পার্শ্বে রিয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর গ্রাম বা জনপদ অদূরে রাম-নগর-রাজবাটী! রাজপ্রাসাদ গঙ্গাগর্ভের কিয়দ্দূর অধিকার করিয়া অচল-অটলভাবে দণ্ডায়মান।

এই স্থানে গঙ্গা অত্যন্ত বেগবতী। অবগাহনে তৃপ্ত হইলাম—ক্লান্তি বিদূরিত হইল, প্রাণ-মন শীতল হইল। যে গঙ্গার মাহাত্ম্য যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া সমগ্র ভারতে কীর্ত্তিত হইতেছে—যে নাম কীর্ত্তনে হিন্দুর গৃহকোণ অনুক্ষণ পবিত্র হইতেছে,—অন্তিম-শয্যায় ঘোরপাতকী যাহার আশায় উৎফুল্ল হইতেছে,—যাহার বারি বিন্দুমাত্র পান করিয়া মুমূর্ষু মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেছে, জন্মাবধি যাঁহার পুণ্যপ্রভাব প্রাণে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, আজ সেই পূত-সলিলা গঙ্গায় অবগাহন করিয়া প্রাণে বিমল আনন্দ উপভোগ করিলাম।

কাশীর গঙ্গা-তীর।

কেদার-ঘাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে কত দেব মন্দির দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথাও ঘণ্টা বাদিত হইতেছে, মন্দিরাভ্যন্তরে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, ধূপধূম বিনির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে; সদ্যঃস্নাত যাত্রিকুল অবিরাম

চলিতেছে ;—সর্ব্বত্র ব্যস্ততা এবং সজীবতা! সকলের মুখে 'হর হর'-রব, সকলেই ভক্তিরসে পরিপ্লুত।

ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রায় ১টা বাজিয়া গেল; স্থান-মাহাত্ম্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণার তীব্রতা অনুভব করিলাম। দগ্ধোদরের জন্য বহুতর কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিয়া রন্ধন করিলাম। জঠরানল নির্ব্বাপিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভারত-ভূমি।

ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ভারত-ভুবন,
অনন্ত রতন যাহে, সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার!
না আছে কোথাও আর এমন তুলন,
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী আমার!

পবিত্র এ পুণ্য-ভূমে লভিয়া জনম,
রাখিলা অতুল কীর্ত্তি মায়ের সন্তানে।
জ্ঞান, ধর্ম্ম, শৌর্য্য, বীর্য্য যতেক করম,
না দেখি ভারত-বিনা অন্য কোন স্থানে!

অতীত কালের গর্ভে কত বর্ষ গত!
যখন আছিলা মাতা সৌভাগ্যশালিনী,
ছুটিত সীমান্ত-পথে যশোরাশি যত,
মলয়-অনীল-সম অতি-গরবিণী!

অমর-বাঞ্ছিত হেথা সুন্দর-নগরী;
অধিষ্ঠিতা রাজ-লক্ষ্মী ভারত-আসনে!
হেরিয়ে মায়ের এই অপূর্ব্ব মাধুরী,
বিস্ময়ে চাহিত সবে প্রীতির নয়নে!

জ্ঞানজ্যোতিঃপূর্ণ এই ভারত-ভবনে,
অতুল বীরত্ব রাখি আর্য্য-সুতগণ
লভিল অমর কীর্ত্তি যশো-মান-ধনে;—
স্মরিলে হৃদয় হয় আনন্দে মগন।

সতীর আদর্শ-স্থল ভারত-ভুবন;
না আছে জগত-মাঝে তুলনা ইহার;
হিন্দু রমণীর শ্রেষ্ঠ সতীত্ব ভূষণ,—
হেলায় জীবন দেয় ধর্ম্ম করি সার!

তুমি মা জনম-ভূমি, রত্ন-প্রসবিনী!
কে বলে ভারতবাসী হইয়াছে দীন,
জননী যা'দের চির-সৌভাগ্যশালিনী,—
মাতৃস্নেহে সমতুল সুদিন-কুদিন?

ভবিষ্য আধারে যদি গিয়াছে মিশিয়া,
আছে মাত্র আর্য্যভূমে গৌরব-কাহিনী!
কাল-নীরে স্মৃতি কভু না যাবে ভাসিয়া;
দেখিবে ভারত-মাতা চির-গরবিণী!

এই আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে উচ্ছ্বাস-লহরী
ছুটেছে ত্রিদিব-পথে উজল প্রভায়,
ভকতি-প্রসূন ল'য়ে অমর-নগরী,
গাহিছে বন্দনা-গীতি মধুর ভাষায়।

শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা।

আজকাল ভারতবর্ষের পুরুষদিগের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে, এবং এই বিষয়ে অনেক মতভেদও হইতেছে। অধিকাংশ শিক্ষিত পুরুষ যে, এখন স্ত্রী-শিক্ষার অতিপ্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা-সম্বন্ধে সকলেই ভীত। আচ্ছা, শিক্ষা ও স্বাধীনতা, এই দুইয়ের তাৎপর্য্য কি?

অনেকে মনে করেন, উচ্চশিক্ষা কেবল উপার্জ্জনের জন্য, এবং তাহার অর্থ, কেবল গোটা কতক পাশ দেওয়া; এবং স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা। সেইজন্য কেহ কেহ স্ত্রীগণের উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতার অত্যন্ত বিরোধী। তাঁহারা বলেন, 'মেয়েরা বেশী লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে? তাহারা ত আর চাকরী করিবে না? স্বাধীনতা দিলেই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পড়িবে।' কিন্তু এই লেখাপড়া কি শুধু চাকুরীর জন্য? অথবা, কতকগুলি নভেল পাঠ করিতে ও প্রবন্ধ লিখিতে শিখিলেই কি শিক্ষার সমাপ্তি? পুরাকালে কি কেহ লেখা-পড়া জানিতেন না? এবং যাহারা জানিতেন, তাঁহারা আপনাদের অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোনও সৎকার্য্য করেন নাই কি?

কি পুরুষ কি নারী, শিক্ষা সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয় বস্তু। যাহা শিখিলে মানব-জাতির অন্তঃকরণে বিশুদ্ধতা আনয়ন করিতে পারে, যাহাতে আমাদের মনের পঙ্কিলতা ধুইয়া যায়, এবং যাহাতে আমরা অন্তরের সকল প্রকার ক্ষুদ্রত্ব ও সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া উদারতা ও মহত্ত্বের ভিতরে যাইতে পারি, সেইই শিক্ষা। যখন মানবের মনে স্বার্থত্যাগ ও একতা-জ্ঞান জন্মাইবে, ও যখন মানব সকল জাতির উপর সমভাবে প্রেম বিতরণ করিতে পারিবে, তখনই শিক্ষার সার্থকতা ও সম্পূর্ণতা লাভ হইয়াছে, মনে হইবে।

তাহার পর, স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। কারণ, স্ব অর্থে আপন। সুতরাং স্বাধীন অর্থাৎ আপনার অধীন। তাহার অর্থ এই যে, আপনার ইন্দ্রিয় এবং মন নিজের বশে রাখা। তাহা হইলেই সে স্বাধীন। অতএব ইহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজনীয়। যদি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে ক্রু[...] উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী হয়, সে-স্থলে পু[...] অপেক্ষা স্ত্রী অধিক অপরাধী হইবে ন[া]; কারণ, বিধাতার নিকট পক্ষপাতিত্ব নাই; তিনি ন্যায়বান্ বিচারক। অতএব তিনি [...] পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয়কেই সমদণ্ডে দণ্ডি[ত] করিবেন।

যদি আমরা আমাদিগের বাসনা ও রি[...] সমূহের দাস্যবৃত্তি না করিয়া, সেইগুলি[...] আপনাদিগের অধীনে রাখিতে পারি, [...] আমরা চিত্ত দমন করিতে শিখি, ইন্দ্রিয়-স[...] সংযত হয়, তবে আমরা অধীন কোথা[য়]? আর তখন স্বাধীনতায় কি ভয়? সে-[...] স্বাধীনতার প্রভাব সর্ব্বত্র। সুতরাং, স্বা[...]

হইতে হইলে আত্মমর্য্যাদাবোধ ও আত্মরক্ষা প্রধানতঃ শিক্ষণীয়। এই উপরি উক্ত বিষয়গুলি সকলই শিখিবার বিষয়। ইহা আপনা হইতেই হয় না। পুরুষ-মাত্রেই স্বাধীন; কিন্তু অনেক পুরুষও এরূপ দুর্ব্বলচিত্ত, যাহাদিগকে হয় ত, সমাজ ও লোকচক্ষে শিক্ষিত স্বাধীন পুরুষ বলিয়া জানা যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা সে পদের যোগ্য নহে। কারণ, যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে যথার্থ শিক্ষিত ও স্বাধীন-পদবাচ্য হয়, তাহাদিগের মধ্যে সে সকল গুণ নাই; তাহারা এ সকল শিক্ষা করে নাই।

অতএব দেখা যায়, শিক্ষা ও স্বাধীনতা পরস্পর সমসূত্রে গ্রথিত। শিক্ষা না পাইলে স্বাধীনতার ফল ভোগ করা যায় না; এবং যে [illegible]ীন নহে, সে মনুষ্যত্বও লাভ করিতে পারে [illegible]। সৎশিক্ষা ও সাধু আদর্শই স্বাধীনতা-[illegible]ভর একমাত্র প্রধান উপায়। আমরা [illegible]রূপ দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগের বেশ-[illegible]াস করিয়া থাকি, দর্পণে প্রতিবিম্বিত [illegible]কৃতি দেখিয়া আমাদিগের সুরূপতা-[illegible]পতা বিবেচনা করিয়া, সুরূপ-গ্রহণে [illegible]শীল হই, সেইরূপ জগতের লভনীয় উচ্চ [illegible] আদর্শগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া নিরন্তর [illegible]দ্ বিচার ও আত্ম-পরীক্ষা-দ্বারা আমা-[illegible]গর স্ব-স্ব জীবন গঠিত ও পরিচালিত [illegible]াতে হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য,—আমরা এই সৎশিক্ষা ও [illegible]ীনতা কোথা হইতে পাইব? শিক্ষাহীন [illegible]ক্তর জ্ঞান জন্মায় না; এবং যে অজ্ঞানী [illegible]ত্তভাগ্য। মানব তাহার চক্ষের জ্যোতিঃ [illegible]ইলে যেরূপ অন্ধ হইয়া থাকে, যে হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক নাই সে ব্যক্তিও তদ্রূপ অন্ধ। কিন্তু যাহার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ, তাহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তু-সকল দৃষ্টিগোচর হয়। যাহার অন্তর অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেখানে জ্ঞানের আলোক প্রবেশের বা প্রকাশের পথ নাই, তাহার উন্নতির পথও চিররুদ্ধ। যে জীবন উন্নতির সোপানে না উঠিয়া অবনতির দিকে নামিয়া যাইতে চাহে, সে কেবল ধ্বংসেরই লক্ষণ। যে মানব আপনার অন্ধত্ব ঘুচাইবার চেষ্টা না করিয়া জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, সে সর্ব্বদা অবনতির মুখে দাঁড়াইয়া আছে, সে কেবল প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে মাত্র। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু প্রকৃতির নিয়মাধীন। সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিলে বিধাতৃ-বিধি অমান্য করা হয়। আমাদের অজ্ঞতাকে দূরীভূত করা আবশ্যক। গীতায় আছে, 'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।—ইহ-লোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।' জ্ঞানই উন্নতির মূল সোপান। এই জ্ঞানের আধার শিক্ষা। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উৎপত্তি। শিক্ষার প্রধান পথ বা উপায় বিদ্যার্জ্জন।

আমরা গুরূপদেশ, সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, ও সদালোচনা প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু জানিতে বা বুঝিতে পারি, তাহাকেই বিদ্যার্জ্জন করা বলে। এই বিদ্যা-বলেই মানব-সমাজ আজ পৃথিবীর সকল জাতীয় জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আপনাকে প্রতিষ্ঠার আসনে বসাইতে হইলে, বিদ্যার্জ্জন তাহার সদুপায়। কি কর্ম্ম, কি ধর্ম্ম, সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের বিদ্যা-দ্বারা লাভ হয়। বিদ্যা-দ্বারাই আমরা আমা-

দিগের আদর্শ খুঁজিয়া পাই, বিদ্যা সদ্বিবেচনা আনয়ন করে এবং বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া জ্ঞানালোক প্রবেশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। যে দেশের লোকেরা এখনও অশিক্ষিত ও অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া বাস করিতেছে, তাহাদিগকে অসভ্য-নামে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধিহীন অবিবেচক নর পশুর মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে। স্থূলকথা,—মানুষকে মনুষ্যত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে একমাত্র বিদ্যাই আশ্রয়ণীয়। বিদ্যা ভিন্ন শিক্ষা হয় না। অতএব প্রকৃত শিক্ষা না পাইলে মনুষ্য-জীবন গঠিত হয় না, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এই যে শিক্ষা, ইহা কি কেবল পুরুষের জন্যই? সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে যাইতে হইলে শুধু পুরুষের শিক্ষা-লাভই কি যথেষ্ট? নর ও নারী উভয়কে লইয়াই মানবজাতির সৃষ্টি; অর্থাৎ, মনুষ্য বলিতে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়কেই বুঝায়। অতএব পুরুষের যদি শিক্ষা-লাভের আবশ্যকতা হয়, তবে স্ত্রীর হইবে না কেন? নারীজাতি কি মনুষ্যজাতির মধ্যে নহে? আর যদি নারীজাতি অন্য কোনও জাতী[য়] জীবের মধ্যেই পরিগণিত হয়, তবে আমাদে[র] পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে যে ধারণা হইয়[া] আসিতেছে যে, নারী নরের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, তাহ[া] কিরূপে সম্ভব হইত? অতএব কি নারী কি নর—মনুষ্যত্ব-লাভের সার্থকতা পাইতে হইলে শিক্ষা উভয়ের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ, মনুষ্যত্ব উভয়েরই বাঞ্ছনীয়। পুরুষের পুরুষত্ব ও নারীর নারীত্ব রক্ষা[ই] শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যথার্থ শিক্ষালা[ভ] করিতে পারিলেই আমরা আমাদের স্বাধীন[তা] অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি ও মনুষ্য-পদের যো[গ্য] হই।

এখন আমাদের দেশের অবস্থা যের[ূপ] দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইতেছে, তাহাতে নার[ী]দিগকে অন্ধকারে রাখিয়া পুরুষ একা জ্ঞা[ন] ধর্ম্মের আলোকে অগ্রসর হইলে কখ[নও] কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না।

শ্রীঅমলা দে[বী]

লক্ষ্মী-পূজা।

নমি পদযুগে হে মহালক্ষ্মি, রত্ন-আকর-সুতা,
বিশ্বরূপের প্রেয়সী গৃহিণী, বিশ্ব-বিভব-যুতা।
সম্বলহীন ধ্যান গায়ত্রী, আমি মা অধম দীন,
কুণ্ঠিত হৃদি বহিয়া এনেছি করিতে চরণে লীন!
সংগ্রহ করি শত উপচার, আয়োজনে
ঢালি প্রাণ,—
গরবে ছলিতে, আসি নি দেখাতে
কপট পূজার ভা[ণ]
ভরিয়া এনেছি নিঃস্ব হৃদয় অকপট প্রয়োজ[ন]
শূন্য দু'হাত পাতিয়া এসেছি,
নিলাজ পীড়িত ম[ন]
ধরার ক্ষুধা সে, ঈর্ষা ও দ্বেষে ক্রূর
ছলনায় [...]

আনে মা জীবনে শত অতৃপ্তি, প্রমাদ,
জড়তা-রাশি !
বাহ্য বিভব কামনায় তাই,
তৃষিত হৃদয়-ভাষা
ফুটে না ফুটে না ; সে শুধু ছলনা,
সে যে মিছা মূঢ়-আশা !

চাহে না সে-সব ক্ষুধাতুর দীন,শুষ্ক মলিন প্রাণ;
হে ধন-ধান্য-অধিষ্ঠাত্রি, দেহ মোরে শ্রেয় দান !
আত্মার কাছে নিত্য যা আছে,
দাও সে বিত্ত প্রাণে,
চিত্তের ক্ষুধা, তৃপ্ত কর মা, চির অমৃত দানে !

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পূজার কথা।

সতী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক ছিলুম সিদ্ধি কলিকায় সাজিয়া লইয়া, ভাল করিয়া উহাতে এক দম্ টানিয়া নন্দী ত্রিশূল-হস্তে সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "কৈ রে, আয়—আয়। যাত্রার সময় হোলো—কে যাবি এই বেলা আয়।"

মা একখানি গৈরিক বসন পরিয়া, হাতে, কাণে, গলায় ও মস্তকে কেবলমাত্র ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়া, সিংহবাহিনী হইয়া সেই-খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু বিষাদে ভরা, মুখে উৎসাহ বা আনন্দের কোনও চিহ্ন নাই—অঙ্গে একখানিও রত্ন-অলঙ্কার নাই।

ভৃঙ্গী ও ষাঁড়টী তাঁহার পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়িতেই তাঁহার চক্ষু এইবার কেমন সজল হইয়া উঠিল। অদূরে শিবের সাধনভূমি, কয়েকটী কেতকী-বৃক্ষের ফাঁক দিয়া অল্প অল্প লক্ষিত হইতেছিল। শিবের নয়ন-দু'টী তখনও মেঘ-লুক্কায়িত নবারুণের মত সেইখানে জ্বলিতেছে—দৃষ্ট হইল। সতী লুব্ধনেত্রে বারংবার সেই দিকেই চাহিতে চাহিতে কোনওরূপে আত্মসংবরণ করিয়া সিংহকে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত করিলেন। ভূতপ্রেতগুলি, কেহবা বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া, কেহ বা মড়ার হাড় লইয়া, কেহ-বা ডমরু, শিঙা ও ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া মহাকোলাহলে পার্ব্বত্যভূমি কাঁপাইয়া চলিল।

এ-দিকে এই কাণ্ড। ও-দিকে দক্ষের আলয়ে মহাসমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অবাধ্য জামাতার উপরে রীতিমত প্রতিশোধ লইবার জন্য, প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকেও দক্ষ নিমন্ত্রণ করিতে বাকী রাখেন নাই। ত্রিদিবের বড় বড় সকল দেবতা, যক্ষ, রক্ষ ও কিন্নরগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। দক্ষের আত্মীয়-দিগের মধ্যেও প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। অসংখ্য কন্যার মধ্যে সতী ছাড়া সকলেই

পতিপুত্র ও অন্যান্য পরিজনসহ উপস্থিত। জামাতারা প্রত্যেকেই এক এক দিকে এক এক কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যম, চন্দ্র ও অগ্নি—ইহারা সকলেই দক্ষের জামাতা;—তাঁহাদের ছুটাছুটিতে ও হাকে-ডাকে দক্ষপুরী সরগরম! কেহ নিমন্ত্রিতদের আহার্য্য পরিবেশন করিতেছেন, কেহ যজ্ঞ-স্থলের জিনিষপত্রাদির খবর্দ্দারি করিতেছেন, কেহ-বা আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্তে মন দিয়াছেন।

চন্দ্র নিতান্ত সুশীল; তিনি অভ্যাগত-দিগের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে যজ্ঞের কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল, সেই খবর লইতেছেন। যমরাজ শাসনকার্য্যে অত্যন্ত পটু;—তিনি চারিদিকের শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। অগ্নি আমোদ-প্রমোদাদির সুশৃঙ্খলা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনগণ আরও অসংখ্য কার্য্যে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

নিমন্ত্রিতেরা একে একে প্রায় সকলেই উপস্থিত হইলে দক্ষ কহিলেন, "আর দেরী কেন? এইবার যজ্ঞ আরম্ভ করা যাইতে পারে।"

ভৃগু প্রভৃতি কয়েক জন ঋষি এই শিবহীন যজ্ঞে দক্ষের প্রধান সহায়। তাঁহারা কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ও ভগবান্ প্রজাপতি কি কহেন, তাহা জানা দরকার।"

বিষ্ণু চুপ করিয়া একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন শিবের অভাবটা তাঁহার চক্ষে যজ্ঞভূমিটাকে নিতান্তই অসহ্য ও অপ্রীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিল। ঈষৎ মাথা নাড়িয়া তিনি কহিলেন, "তাই তো! ভগবান্ প্রজাপতি কি বলেন?"

ব্রহ্মাও নিরানন্দ এবং অন্যমনস্ক ছিলেন। বিষ্ণুর কথা শুনিয়া হঠাৎ বিশেষ কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, আর দেরী কেন? যজ্ঞ আরম্ভ হোক্।"

যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গেল মহাসমারোহে ভৃগু অন্যান্য কয়েক-জন হোতার সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। দক্ষ আসিয়া সদম্ভে নিকটে বসিলেন। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আবার ডাক পড়িল। তিনি কহিলেন, "নারদের সহিত একটু বাক্যালাপ করিয়া আসি, ক্ষণিক অপেক্ষা কর।" সে কথা শুনিয়া দক্ষ ঈষৎ ভ্রুকুটী করিলেন। কিন্তু উপায় নাই। স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু।—সকলেই স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় বাহিরে সুগভীর 'কিচিমিচি' শব্দ উত্থিত হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া মাথা তুলিতেই দক্ষ দেখিলেন—এক অদ্ভুত দৃশ্য। দক্ষ দেখিলেন, দর্শকদিগের সেই বিষম জনতার মধ্যে অদূরে দাঁড়াইয়া কয়েকটা কাল কাল কি! কি-বা উহাদের চেহারা, এবং কি-বা উহাদের বিকট আনন্দোচ্ছ্বাস! হি হি করিয়া তাহারা হাসিতেছে, আর দর্শক-দিগকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া, আপনাদের জন্য যতটা পারে, সম্মুখে জায়গা করিয়া লইতেছে! দক্ষ আরও দেখিলেন, কয়েকটা আসিয়া পা ছড়াইয়া একবারে সম্মুখেই আরাম করিয়া বসিল। সমস্ত গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবতা ও অপ্সরা-দের মধ্যে তাহাদের বিকটমূর্ত্তিগুলি অতিশয় অদ্ভুতভাবে 'চিক্‌মিক্' করিতে লাগিল।

দক্ষ বুঝিতে পারিলেন, কোন্ রাজ্যের মহামান্য আগন্তুক ইহারা। যদিই-বা প্রথমে না বুঝিতে পারিয়া থাকেন, কিন্তু বাহিরের

দুই একটী কলরবে অবিলম্বেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। রাগে তাঁহার অঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তিনি একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব কোথা হইতে আসিল ?"

সে উত্তর করিল, "সতী আসিয়াছেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি।"

দক্ষ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না; রাগিয়া কহিলেন, "কি ? এত বড় স্পর্দ্ধা! নিমন্ত্রণ করিলাম না, তবু আসিল! আচ্ছা রসো, মজা দেখাইতেছি!" তারপর উচ্চৈঃস্বরে প্রহরীদিগকে হুকুম দিলেন, "সব আপদ্‌গুলোকে তাড়াইয়া দাও; ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দাও।"

ভূতেরা অতশত জানে না। মায়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ;—কত খাইবে, নাচিবে—মনে করিয়া আসিয়াছে। এখন খাদ্যের পরিবর্ত্তে কীল-ঘূষোর ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া গেল! কোন সভাতেই কেহ তাহাদের এমন "দূর দূর" করে না। আজ মায়ের সঙ্গে আসিয়া এই অপমান! তাহারা বিস্ময়বিমূঢ়-ভাবে সকলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া জায়গা ছাড়িয়া দিতে লাগিল, আর দুম-দাম করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে সতীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল।

জননী প্রসূতির নিকট বসিয়া সতী অভিমানাশ্রু পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তাহাদিগকে এভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভূতেরা কহিল, "তাড়াইয়া দিল যে!"

দুর্-দুর্ করিয়া সতীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কে তাড়াইয়া দিলে ? কেন তাড়াইয়া দিলে ?"

"যজ্ঞস্থল হইতে প্রহরীরা তাড়াইয়া দিয়াছে; আর শুধু তাড়াইয়াই দেয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে মার-ধরও করিয়াছে!" এই বলিয়া ভূতেরা যে-যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাইতে লাগিল। কেহ পীঠ দেখাইল, তাহার চামড়া উঠিয়া গিয়াছে; কেহ নাক দেখাইল, অনেকটা নাই; কেহ কান দেখাইল, টানের চোটে তাহা লম্বা হইয়া গিয়াছে!

সতীর অন্তরে দারুণ ব্যথা অনুভূত হইল। মাতার নিকটে ছেলেপিলে, যত কুৎসিত-কদাকারই হউক, যত অপদার্থই হউক, অতুল স্নেহের পাত্র! সতীও ইহাদিগকে তেমনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া ও দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

প্রসূতি উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "ওকি মা অমন করিলে কেন ? ভাবিও না; আমি মিটাইয়া দিতেছি! ও-সব কিছু নয়। জামা-তারা কোথা গেল ?"

অভিমানের বহ্নি সতীর অন্তরে পূর্ণমাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল। শিবকিঙ্করদের উপায় করিবেন ওই জামাতারা ? এতই তুচ্ছ শিব ? ছি! ছি! ছি!

প্রসূতি চলিয়া গেলেন। সতী আস্তে আস্তে যজ্ঞভূমির দিকে চলিলেন। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেই আরও একটী দৃশ্য তাঁহার নয়ন-সম্মুখে পতিত হইল।

সতীকে নামাইয়া দিয়া সিংহটা গাছতলায় পড়িয়া আরাম করিতেছিল; একটা অনুচর তাহাকে খোঁচা লইয়া তাড়িয়া আসিল। তাহা দেখিয়া সে-ও কেশর নাড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সতী দেখিলেন, একটীমাত্র

শূলের খোঁচা খাইতেই সে একেবারে লাফাইয়া, তাহার ঘাড়ের উপর পড়িবার উপক্রম করিয়া দিয়াছে আর কি! সতী তাড়াতাড়ি সিংহকে ডাকিয়া ফিরাইলেন।

সিংহের চক্ষু রক্তবর্ণ, লেজ প্রসারিত, কেশরগুচ্ছ অসম্ভবরূপ স্ফীত। গায় হাত বুলাইয়া সতী তাহাকে কহিলেন, "ছি! ছি! পশুরাজ, ও কি!—ছি!" তারপর অনুচরটীর সম্মুখে যাইয়া সপ্রশ্নদৃষ্টিতে দাঁড়াইলেন। অনুচর সতীকে সম্মুখে দেখিয়া, হঠাৎ, "মা, আমার দোষ নাই; প্রজাপতির হুকুম আমি পালন করিয়াছি মাত্র," এই বলিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। সতী কথা কহিতে না পারিয়া এইবার যজ্ঞবেদীর নিকটে আসিয়া দেখা দিলেন। দক্ষ মন্ত্রপাঠের উদ্যোগ করিতে-ছিলেন, সতীকে দেখিয়া কহিলেন, "ভাঙ্গড়ের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তোরও লজ্জা-সম্ভ্রম গেল, দেখিতেছি! ছি! ছি! ছি! সতি, কে তোকে এই সব জন্তু ও লোকদের লইয়া আসিতে বলিল?"

সতী পিতা ও অন্যান্য গুরু-ব্যক্তিকে অভিবাদন জানাইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "পিত্রালয়ে কন্যা আসিবে, তাহার আবার অনুমতি কি পিতঃ? আমি নিজের ইচ্ছাতেই এইখানে আসিয়াছি, এবং ইহাদিগকেও আমার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। ইহাতে কি অপরাধ হইয়াছে?"

লজ্জায় ও ঘৃণায় দক্ষ মুখ বিকৃত করিলেন; কহিলেন, "সে জ্ঞান তোর থাকলে হ'ত! তা'হলে কি তুই ভাঙ্গড়ের সেবা করিস্? না, শিবের কথাতেই এইসব ভূতপ্রেত সঙ্গে নিয়ে এইখানে আস্‌তে সাহস পাস্?"

দারুণ মনস্তাপে সতী কহিয়া উঠিলেন, "যিনি কোনও দোষে দোষী নন্, দোষ-গুণের যিনি অতীত, কল্পনা করিয়া কেন তাঁহাকে বৃথা কটুক্তি করেন, পিতা? শুনিলাম, শিবহীন যজ্ঞ করিতেছেন। ইহা কি আপনার উচিত? না, ইহা নিরাপদ? শিবহীন যজ্ঞ কে করিতে পারে? সে তো দেবতাদেরও অসাধ্য।"

দক্ষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কি? কন্যা হইয়া এত বড় বড় লম্বা লম্বা কথা কহিস্! আমার সাক্ষাতেই ভাঙ্গড় স্বামীর গর্ব্ব! আচ্ছা, রোস্; তোর শিবের অহঙ্কারটা ভাঙিতেছি। একবার তার কাহিনীটা বলি তবে—শোন্।"

এই বলিয়াই দক্ষ সদম্ভে মস্তক তুলিয়া সেই সম্মিলিত দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক শিব-নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন। গায়ের জ্বালায় শিবের কত কুৎসাই দক্ষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।—শিব ভাঙ্গড়—ভাঙ্ খায়; শিব অনাচারী—যেখানে-সেখানে পড়িয়া থাকে; শিবের মানসম্ভ্রম-জ্ঞান নাই, যত ছোট লোকের সঙ্গেই তার মেলা-মেশা;—নন্দী, ভৃঙ্গী ও ভূত-প্রেতগুলা তার নিত্যসাথী; শিব আস্ত জন্তু;—ব্যাঘ্রছাল পরে—সাপের হার কণ্ঠে দেয়।"—এইরূপ আরও কত কি বলিয়া দক্ষ যে শিবের কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন তাহা বলা সুকঠিন।

দক্ষ বলিয়া যাইতেছেন, আর সভাস্থিত সকলে মগ্ন হইয়া শুনিতেছে; এমন সময় অক-স্মাৎ সতীর দিকে চাহিয়া নিষ্ঠুর বক্তা হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। দক্ষের বাক্য-রোধের সঙ্গে সঙ্গে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের দৃষ্টিও সেই দিকে পড়িল;—তাঁহারাও তখন স্তব্ধ

হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। ভৃগু প্রভৃতি হোতৃগণ যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিতে দিতে হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে চাহিয়া একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন! তাঁহাদের হস্তস্থিত পাত্র আর নামিতে চাহিল না! একটা কি শক্তিতে চরাচর যেন এক মুহূর্ত্তে স্পন্দনহীন হইয়া গেল!

সকলে দেখিলেন, দেবী নিশ্চল পাষাণবৎ আকাশ-পথে দৃষ্টি স্থির করিয়া করযোড়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন,—তাঁহার সামান্য বস্ত্রাঞ্চলটীও যেন যোগমগ্ন হইয়া স্থির হইয়া আছে! শীর্ণ কাঞ্চনপ্রভ-কায়, অঙ্গস্থিত কুসুমরাশির স্নিগ্ধ জ্যোতিঃর সহিত মিলিয়া, পবিত্রতার আলোকে চারিদিক্ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেই পবিত্রতার মধ্যে, তাঁহারই প্রাণের মত, সকল মূর্ত্তিই ধ্যান-মগ্ন! বাহিরের কোন কিছুতেই যেন সে মূর্ত্তির কোন অনুভূতি নাই। চক্ষের দৃষ্টি বাহিরে নিবদ্ধ হইলেও অন্তরের মধ্যেই তাহার সাধনার বস্তু পাইয়া সে তন্ময়! দেহের ও অন্তরের মধ্যে একখানি যেন সুস্পষ্ট আবরণ টানিয়া দিয়া দেবী যজ্ঞাগ্নির পার্শ্বে ক্রোধে বর্ম দেখিতেছেন!

সতীর এই দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া, দূরে গবাক্ষ-সমীপে দাঁড়াইয়া প্রসূতি আকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সতি, সতি, মা আমার! চলে আয়; বুকের ধন আমার, বুকে আয় মা! আয়, ওখানে থাকিস্ নে; বুকে আয়!" একটা আশু বিপদের সম্ভাবনা জননীর স্নেহকাতর হৃদয়কে মথিত করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহার সেই কাতর আহ্বান যজ্ঞস্থলে অনেকেই শুনিতে পাইলেন, কিন্তু সতীর ধ্যান-মগ্ন অন্তরের কঠিন বর্ম্ম ভেদ করিয়া উহা তাঁহাকে কিছুতেই সচেতন করিয়া তুলিতে পারিল না। সতী ক্রমেই অসাড় —আরও অসাড় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে এক অতিবিচিত্র ব্যাপারই সংঘটিত হইল।

সতীর দেহ ক্রমে নমিত হইল ও চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল। একটী রেখাব মত জ্যোতিঃ হঠাৎ সেই দেহ হইতে নির্গত হইয়া আকাশে ধূপশিখার মত যজ্ঞাগ্নিতে মিলাইয়া গেল! এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহটিও কুণ্ডের মধ্যে লুটাইয়া পড়িয়া গেল।

চারিদিকে প্রবল আর্ত্তনাদ উঠিল। গবাক্ষপার্শ্বে প্রসূতি, "সতি, সতি" বলিয়া এইবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। দর্শকগণ, "এ কি হইল, এ কি সর্ব্বনাশ," বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। দ্বারে নন্দী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া ব্যাপার দেখিতেছিলেন; এক্ষণে এক গগনভেদী হুঙ্কার ছাড়িয়া তিনিও ত্রিশূল-হস্তে লাফাইয়া উঠিলেন। সিংহ ব্যাপার কি, এতক্ষণ ভাল বুঝিতে পারে নাই; সকলকে সমবেত-স্বরে চীৎকার করিতে এবং দেবীর দেহকে ঐরূপভাবে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া সে লম্ফপ্রদানে কুণ্ডের সম্মুখীন হইল। পিশাচেরা 'কিল্ বিল্' করিয়া যজ্ঞ-সভায় প্রবেশ করিয়া মহাগোলযোগ বাধাইয়া দিল। এমন কি, এমন যে দক্ষ, তাঁহারও মুখ হইতে অলক্ষ্যে একটা আর্ত্তস্বর নির্গত হইল।

কিন্তু এ সবই এক মুহূর্ত্তের ব্যাপার মাত্র! —তাহার পরেই এক মহামারী কাণ্ড! নন্দীর হুঙ্কারে ও ত্রিশূল-চালনায়, সিংহের দাপটে ও ভূতপ্রেতের তাণ্ডবনৃত্যে, তেমন যে যজ্ঞস্থল, তাহাও মুহূর্ত্তে পিশাচ-ভূমিতে

পরিণত হইল। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও দেবতা—প্রাণভয়ে সকলেই পলায়নপর হইলেন। সাহস করিয়া প্রতিবাদ বা সম্মুখীন হইবার মত কাহাকেও পাওয়া গেল না। দক্ষ নিরুপায় হইয়া সশঙ্কে ভৃগুর দিকে চাহিলেন।

যজ্ঞ পণ্ড হয় দেখিয়া, (ভৃগু তাড়াতাড়ি কি করিবেন!)—যজ্ঞরক্ষার কামনায় যজ্ঞাগ্নিতে একটা প্রকাণ্ড আহুতি দিয়া বসিলেন। সেই আহুতি হইতে হঠাৎ এক উজ্জ্বলাকৃতি বীরের উদ্ভব হইল। উহার নাম ঋভু! হস্তে প্রকাণ্ড এক খড়্গ! দক্ষের ইঙ্গিতে সে অত্যল্পকালের মধ্যেই প্রবল বিক্রমে সকলকে যজ্ঞভূমি হইতে তাড়াইতে লাগিল; এবং যজ্ঞভূমি ক্রমশঃ পরিষ্কার করিয়া দিল। তাহার পরাক্রমে পরাভূত হইয়া নন্দী ও ভূতের দলকেও অবশেষে প্রস্থান করিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

গানের স্বরলিপি।

(গান)

মিশ্র সাহানা—কাওয়ালি।

বরিষ আশিস্-কণা য়ুরোপের মাঝে!
প্রীতির মঙ্গল ভেরি প্রতিপ্রাণে বাজে!
য়ুরোপের ঘরে ঘরে
দীপ জ্বলে পুণ্য-করে,
প্রতি আঙ্গিনায় তব হেম-পীঠ রাজে,
সিঞ্চহ নির্ব্বাণ-বারি উহাদের মাঝে॥

মুছে যাক্ দ্বেষ-দ্বন্দ্ব,
যত মোহ যত সন্দ,
উঠুক্ সকল চিত্তে সাধনার মহানন্দ;
সাজাও য়ুরোপ-চিত্ত ধর্ম্মময় সাজে।
প্রেমের আলোকে সব,
পাক্ শান্তি অভিনব,

হে রাজাধিরাজ! বুঝি' তব বৈভব
বিরত হয় যেন ভ্রাতৃ-হিংসা কাজে॥*

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২´ ৩ ॥
II {ম্মা ম্মা ম্মা ম্মা। ম্রা ম্রা সা সা। ম্রা -া পা মপা। ম: মা জ্ঞা -া}I
ব রি ষ আ শি স্ ক ণা য়ু ০ রো পে র মা ঝে ০

০ ১ ২´ ৩
I মা -পা পা পা। গণা -ধণা পা -ধা। মা পা -র্সা র্সা। মজ্ঞা -া -জ্ঞমা -পা II
প্রী তি র ম ঙ্গ ল ০ ভে রি প্র তি প্রা ণে বা ০ জে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
II { না -া -া না। -া -া না -া। র্সা র্সনা র্সা র্রা। না -া র্সা র্সা I
য়ু ০ ০ রো ০ ০ পে ০ ০ র ০ ০ ঘ রে ০ ঘ রে

---

* মেট্রোপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের জনৈক ছাত্র-কর্ত্তৃক বিরচিত।

০ ১ ২´ ৩

I না -র্সা র্রা র্রজ্ঞা । র্রা -ার্স র্সা -ার্র । -া -র্সাণ র্সণা ণা । -ধা ণা ধা পা}I

দী • • প০ • ০ জ্ঞ ০ ০ লে ০ ০ পু ণ্য • ক রে

০ ১ ২´ ৩

I মা -পা পা পা । পা পা পা পা । মা -পা পা না । না র্সা র্সা র্সা I

প্র ০ তি আ ঙ্গি না য় ত ব ০ হে ম পী ঠ রা জে

০ ১ ২´ ৩

I নর্সা-র্রা র্সা ণা । ধা পা পা পধা । মা -পা পধা পধপা । মজ্ঞা -া -জ্ঞমা -পা II

সিন্ চ হ নি র্ব্বা ণ বা রি০ উ হা দে ০ র মা ০ ০ ঝে •

০ ১ ২´ ৩

II { মা পা -া ণা । -ধা ণা ধা পা । -া পা ধা মা । পা পা পা পা I

মু • • ছে • ০ যা ০ ০ কৃ ০ • দ্বে ষ দ্ব ন্দ্ব

০ ১ ২´ ৩

I মা পা -া র্সা । -া -া র্সা -া । ণা ধা পা -ধা । মপা -ধা পমা মজ্ঞা I

য ০ ০ ত ০ ০ মো ০ ০ হ ০ ০ য ০ ত স ০ ০ ন্দ

০ ১ ২´ ৩

I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞমা মা । রা রা রা সা । রা রা সা সা I

উ ঠু ক স ক ল চি ত্তে সা ধ না র ম হা ন ন্দ

০ ১ ২´ ৩

I রা মা মা পা । পা পা পা -া । ণা -ণা ধা মা । পা পা পা -া } I

সা জা ও য়ু রো প চি ০ ত্ত ধ র্ম্ম ম য় সা জে ০

০ ১ ২´ ৩

I {না -া -া না । -া -া না -া । র্সা -না র্সা র্রা । না না র্সা র্সা I

প্রে ০ ০ মে ০ ০ র • • আ ০ ০ লো কে স ব

০ ১ ২´ ৩

I না র্সা র্রা র্রা । -া র্জ্ঞা র্রা র্সা । -া না র্সা র্রা । র্সা ণা ণা ধা } I

পা • • ক্ ০ ০ শা ০ ০ স্তি ০ • অ ভি ন ব

০ ১ ২´ ৩

I ণা -ধা ণা ধা । পা -া পা পা । মা পা পা পা । র্সা -া র্সা র্সা I

হে • রা জা ধি ০ রা জ বু ঝি ত ব বৈ ০ ভ ব

০ ১ ২´ ৩

I র্রা র্সর্রর্সা ণা -ধা । ণা ধা পা পধা । মা পা ধা পধপা । মজ্ঞা -া -জ্ঞমা -পা II

বি র০ ত • হ য় যে ০ ন ভ্রা তৃ হিং ০ সা কা ০ • ঙ্ক্ষে ০

শীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২৫

শীলা শয়ন-কক্ষে গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। সে ভাবিল, সে কোন্ সৌভাগ্য-বলে এ কয় দিন এমন সুখী হইয়াছিল! কেন সে সুখ চিরদিন থাকিল না? সুপ্রকাশ আসা পর্য্যন্ত সে কি হোটেলে থাকিতে পারে না? —না। তাহা হইলে সে পাগল হইয়া যাইবে। সে তাহা কোনও মতে পারিবে না।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাক্স খুলিয়া সেই পুরাতন প্যাকেটটি,—যাহাতে 'লীলাবতী দাস' লেখা ছিল,— খুলিয়া দেখিল, একখানি পত্র। পত্রখানি ইংরাজীতে লেখা।—

"প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রেরিত অর্থ পাইলাম। ধন্যবাদ। আপনি কি আর এখানে আসিবেন না? আপনাকে একবার দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছি। আপনি দুঃখিনীর প্রতি যে দয়া করিতেছেন, তাহা কখনও ভুলিব না। আমার ছেলে-দুইটি ভাল আছে। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন। ইতি।

আপনার দাসী—
লীলাবতী।"

পত্রে এমন কোনও কথা নাই, যাহাতে মনের ভাব বিকৃত হয়। যদি কাগজে মকদ্দমার কথা না পড়িত, শীলা ইহাতে কিছুই মনে করিত না। এই নির্জ্জন স্থানে সে একাকী থাকিতে ইচ্ছা করিল না। সে বুঝিতে পারিল না যে, সে কি করিবে! সে তাড়াতাড়ি একখানি চিঠি লিখিল। তাহার স্বামীকে এই সে প্রথম পত্র লিখিতেছে। সে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোনও ভাবই মনে স্থির করিয়া আনিতে পারিল না; উঠিয়া চিঠি লিখিতে বসিল:—

"আমি লক্ষ্ণৌ যাইতেছি; কাকাবাবুর বাটীতে থাকিব। মিঃ সুব্রত বসু আসিয়া এই কাগজ ও চিঠি দিয়াছেন; দিলাম, দেখিও। আমি জানি না, কি করা উচিত বা কি বলা উচিত। তুমি যাহা বুঝাইতে পার, বুঝাইও। এখানে কোনও মতে থাকিতে পারিতেছি না—"

পত্র অসমাপ্ত রহিল,—আর লেখা হইল না। শীলার মাথার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, সে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। আয়া পার্শ্বের ঘরে ছিল; ছুটিয়া আসিয়াই শীলাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

দুখ্‌মন বেহারা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কেয়া হুয়া আয়াজী?"

আয়া। আরে মেম্‌সা'ব কা হো গিয়া! জল্‌দি ডাগ্‌দার বোলাও। সাহেব কিধর গিয়া?—কব আয়েগা? *

দুখ্‌মন। সা'ব কাল আয়েগা। হাম্ জানেসে হোগা নেই। হোটেলকো ডাগ্‌দারকে বোলানেসে হোগা। †

* আরে, মেমসাহেব কি-রকম হয়ে গেছেন! শীঘ্র ডাক্তার ডাক। সাহেব কোথায় গিয়াছেন? কবে আসিবেন?

† সাহেব কাল আসিবেন্। আমি যাইলে হইবে না। হোটেলের ডাক্তারকে ডাকিলে হইবে।

সুব্রত পূর্ব্বের সেই কক্ষেই বসিয়াছিলেন। তিনি পার্শ্বের ঘরে চীৎকার প্রভৃতি শুনিতে-ছিলেন, কিন্তু কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় ডাক্তারকে লইয়া দুখ্‌মন সেই স্থানে আসিল। ডাক্তার ইংরাজ। তিনি সুব্রতকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? তদুত্তরে সুব্রত বলিলেন, "আমি জানি না। আমি এইমাত্র আসিয়াছি; তবে, মিসেস্ রায় কোনও দুঃসংবাদ পাইয়াছেন।"

ডাক্তার আয়ার সহিত গিয়া শীলাকে শয্যার উপর তুলিয়া শয়ন করাইলেন। জ্ঞান কিছুতেই হইল না দেখিয়া, ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া, 'পুনরায় আসিয়া দেখিব' এই বলিয়া ডাক্তার যখন বাহিরে আসিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, শৈলেন আসিয়াছেন। শৈলেন সেই তৎক্ষণাৎ আসিয়াছেন। ডাক্তার আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "Where is Mr. Roy?" *

শৈলেন। He has gone to Kalka; will return tomorrow. †

ডাক্তার বলিলেন, "Mrs. Roy is very ill. The case looks serious. You ought to send a telegram to Mr. Roy to come positively by to-morrow's train. I hope that some-body will look after her. I will come by and by." ‡ এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

শৈলেন সুব্রতকে দেখিয়া বলিলেন, "ম'শায় কি এইখানেই আছেন?"

সুব্রত। হাঁ, আমি মিসেস্ রায়ের পরিচিত।

শৈলেন। হঠাৎ পীড়িত হইবার কারণ কি?

সুব্রত। কারণ—? হয় ত, আমিই কারণ! আমি তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে কোন একটা কথা বলেছিলাম।

শৈলেন। সুপ্রকাশ রায়ের বিরুদ্ধে কথা! আপনি, বুঝি, তাঁকে জানেন না?— সর্ব্বনাশ কোরেছেন!—

এমন সময় আয়া চীৎকার করিয়া "দুখ্‌মন! দুখ্‌মন!" বলিয়া ডাকিল। শৈলেন ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, শীলা একে-বারে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। সে শয্যায় স্থির থাকিতেছে না; খুব জ্বরও হইয়াছে। আবার ডাক্তারকে ডাকা হইল। ডাক্তার বলিলেন, একজন 'নার্স' না হইলে চলিবে না। নর্স একজন এখনই চাই। শৈলেন নর্স আনিতে চলিয়া গেলেন ও টেলিগ্রামে সুপ্রকাশকে শীঘ্র ফিরিতে বলিলেন।

সুব্রত সেই হোটেলেই একটী কক্ষ লইয়া রহিলেন। শীলার এই সাংঘাতিক পীড়া! আর তাঁহার জন্যই পীড়া! এই সকল ভাবিয়া তাঁহার অন্তর যেন চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল!

শৈলেন একজন 'নর্স' আনিয়া দিলেন ও

---

* মিঃ রায় কোথায়?

† তিনি কাল্‌কা গিয়াছেন; কাল আসিবেন।

‡ রায়-ঠাকুরাণী অত্যন্ত পীড়িতা; তাঁহার রোগ সাংঘাতিক দেখাইতেছে। মিঃ রায়কে কল্যকার ট্রেনে নিশ্চয় আসিবার জন্য আপনার টেলিগ্রাম করা উচিত। আশা করি, ইঁহাকে কেহ দেখিবেন। আমি এখনই আসিতেছি।

নিজে সারারাত্রি সেইখানে থাকিয়া সংবাদাদি লইলেন।

সকালে ট্রেন নাই; বেলা একটায় ট্রেন আসে। ততক্ষণ সকলেই ব্যস্ত হইয়া রহিলেন। শীলার জ্ঞান হইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার 'ব্রেন ফিভার' বলিয়া জানাইলেন যে, হটাৎ অত্যন্ত আঘাত পাইয়া এ পীড়া হইয়াছে। শৈলেন ১০ টার পর কলেজে চলিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন যে, আবশ্যকতা হইলেই যেন 'নর্স' সংবাদ দেয়। সুব্রত তখন বসিবার কক্ষে আসিয়া বসিয়াছিলেন; শৈলেন চলিয়া গেলেন, তিনি দেখিলেন।

১টার পরই সুপ্রকাশ আসিয়া উপস্থিত। টেলিগ্রাম পাইয়াই তাঁহার মন এমন অস্থির হইয়াছিল যে, তিনি কি ভাবে যে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়াই সুব্রতকে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "আপ্‌নি এখানে! শীলা কেমন আছে?"

সুব্রত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিষন্নকণ্ঠে বলিলেন, "আমার দোষেই শীলার প্রাণ যেতে বসেছে। আপ্‌নার কাছে কি সব বোল্‌বো?"

সুপ্রকাশ। (ব্যস্ত হইয়া) কি বোল্‌বেন? শীগ্‌গির বলুন, আপনি কি করেছেন?

সুব্রত। শীলাকে আপ্‌নার সেই 'ডাইভোর্স কেসের' বিষয় জানিয়েছি। আপনি যে তাকে সে কথা না বোলে বিয়ে কোরেছেন, তাই জানিয়েছি। এখনো যে লীলাবতী দাস এখানে আছেন, তাকে যে আপ্‌নি মাসহারা দেন, তাও সব জানিয়েছি। আর আপ্‌নার আশ্রয় ছাড়্‌তে পরামর্শও দিয়েছিলাম। শীলা অন্নদাবাবুর কাছে লক্ষ্ণৌ যাবে বোলে বস্ত্রাদি ঠিক্ কর্ত্তে গিয়েছিল; আমায় বোলেছিল, আপ্‌নি আস্‌লে এই পত্র ও কাগজ দিতে; সেইজন্যে আমি বাধ্য হ'য়ে এখানে আছি। শীলা আপ্‌নাকে যে পত্র লিখ্‌তেছিল, দেখুন। ডাক্তার-সাহেব আমায় এ দিয়ে গেছেন।

সুপ্রকাশ পত্রখানি হস্তে লইয়া সুব্রতর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপ্‌নি অতিমূর্খের মত কি অন্যায় কোরেছেন! যাক্, এ কথা পরে হবে: শীলাকে আগে দেখে আসি।"

সুব্রত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "আপ্‌নি কি বলেন, এ-সব কিছু নয়? এ-সব কথা কি উড়িয়ে দেওয়া উচিত? শীলা আমাদের ঘরের বৌ হ'লে, তার পক্ষে কত ভাল হ'ত!"

সুপ্রকাশ অবিচলিত নেত্রে সুব্রতর প্রতি চাহিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "মিঃ বসু, আমার দিকে চেয়ে দেখুন; আপ্‌নার কি মনে হয়, আমি এই অপরাধে অপরাধী? ঠিক্ কোরে বলুন ত!"

সুব্রত তাঁহার সেই নির্দ্দোষ মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "যদি মুখের ভাবে মানুষ চিন্‌তে হয়, তা হ'লে আপ্‌নি নির্দ্দোষী; কিন্তু এত যে প্রমাণ!"

সুপ্রকাশ। সে কথা পরে হবে। বলুন, আমার দিকে চেয়ে বলুন, আপ্‌নার কি মনে হয়?

সুব্রত। আমার মনে হয় বটে, আপ্‌নি নির্দ্দোষ। যদি নির্দ্দোষ হন্, আমি আপ্‌নার কাছে চিরকালের জন্যে বাধিত হব। আপ্‌নি আমায় প্রমাণ দেখান, তা হ'লে

আপনার ওপর আমার যে ভাব, সব চলে যাবে।

সুপ্রকাশ। দেখাব, এইখানে বসুন। আর দেরী করা নয়। আগে শীলার জীবন ফিরিয়ে পাই, তবেই নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ কোর্ব্বো; তা নয় ত নয়।

এই বলিয়া সুপ্রকাশ দ্রুতপদে শীলার কক্ষে চলিয়া গেলেন। তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন, তথায় একজন নর্স আছেন এবং আয়াও আছে। তিনি যাইবা-মাত্র নর্স বলিল, "মিঃ রায়, আপ্‌নি কথা বল্‌বেন না। রোগী যেন হঠাৎ জেগে না উঠে।" সুপ্রকাশ নর্সের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ধীরে ধীরে শীলার নিকট গিয়া তাহার তুষারশুভ্র ললাটদেশ স্পর্শ করিলেন; ললাট জ্বলন্ত-বহ্নিসম উত্তপ্ত। সুপ্রকাশ শয্যার পার্শ্বে ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া শীলার দুইটি হস্ত নিজ-হস্ত-মধ্যে ধারণ করিয়া শয্যোপরি মস্তক স্থাপন করিলেন। নর্স ও আয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সুপ্রকাশ সেইস্থানে একমনে জগদীশ্বরকে ডাকিয়া শীলার প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহার সেই কাতর প্রার্থনা জগদীশ্বরের নিকট বিফলে গেল না। শীলা সুপ্রকাশের স্পর্শে যেন চেতনা ফিরিয়া পাইতেছিল। সে একবার অন্যদিকে ফিরিল! সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে সেই সুন্দর ললাটদেশে পুনরায় করস্পর্শ করিলেন। তাহার পর তিনি উঠিয়া নর্সকে ডাকিয়া, ডাক্তারকে ডাকিতে বলিলেন।

নর্স ডাক্তার ডাকিয়া আনিলে, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "She is much better. I hope she will gain her strength soon. Be talk too much. Try to quiet." *

সুপ্রকাশ ডাক্তারের সহিত বাহিরে আসিলেন, এবং কি কি করিতে হইবে, সব জানিয়া লইলেন। তাহার পর সুব্রতকে বলিলেন, "আপ্‌নি কি এই হোটেলেই আছেন?"

সুব্রত। হাঁ।

সুপ্রকাশ। অনুগ্রহ কোরে আরও কয়েক দিন থাকুন। আপ্‌নার মনের ভাব দূর কোর্ত্তে চেষ্টা কোর্ব্বো।

এমন সময় শৈলেন আসিয়া পড়িলেন। শৈলেন ব্যস্তভাবে বলিলেন, "সুপ্রকাশ-দা বৌদি কেমন আছেন?"

সুপ্রকাশ। একটু ভাল ত, ডাক্তার বল্লেন। শৈলেন, তুমি এসেছ, বড়ই ভাল হয়েছে। এখন মিঃ বসুকে তোমায় আমার সব কথা বোল্‌তে হবে। আমি ভাই, তোমার স্ত্রীর জীবনের জন্যে অনেক দিন ত সয়িছি; অপমানের বোঝা মাথায় তুলে নিয়িছি।

শৈলেন। (ইতস্ততঃ করিয়া ভয়-চকিত-নেত্রে সুপ্রকাশের দিকে চাহিয়া) কিন্তু সুষমা ত, জান, সব সময়ই আমার ওপর সন্দিগ্ধ; আমার বিষয় কিছু শুনলেই তার রসাতল! সে যদি এ-সব শোনে, তবে সে ত আর বাচ্‌বে না। আমি কি শেষে স্ত্রী-হত্যাকারী হব!

সুপ্রকাশ। এ-দিকে, ভাই, আমার শীলা যে যায়! আমায় কি ভাই, এই বোঝা

---

* ইনি অনেকটা ভাল। আমি আশা করি যে, শীঘ্রই ইনি বল লাভ করিবেন। সাবধান, বেশী কথা বলিবেন না। ইঁহাকে শান্ত রাখিতে চেষ্টা করুন।

নিজে সারারাত্রি দেখতে বল ? তোমার একটু লইলেন। ... ত উচিত। (সুব্রতর প্রতি)

সু,মিঃ বসু, আপ্নি যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যা শুন্‌বেন তা কাউকেও বল্‌বেন না, শুধু শীলাকেই বল্‌বেন, তবেই সত্যি কথা শুন্‌তে পাবেন। তা নয় ত, থাক্ আমার ঘাড়ে কলঙ্কের বোঝা! কেন মিছে বেচারী শৈলেনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করা!

সুব্রত ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অপরিসীম আশ্চর্য্যে অভিভূত হইতেছিলেন। কৌতূহল- ও বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন, "ম'শায় আমি শপথ কোরে বল্‌ছি যে, আমি আর কাউকেও বোল্‌বো না, আপ্নি আমায় বলুন। আমিই শীলার এই দশা করিছি। আমার এ বিষয় জানা নিতান্ত দরকার।

সুপ্রকাশ শৈলেনের প্রতি চাহিলে, শৈলেন অস্পষ্ট হইতে ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর কণ্ঠে বলিলেন, "মিঃ বসু! সে মকদ্দমা সুপ্রকাশ-দার নামে হয় নি; আমার নামেই হয়েছিল। আমার নাম শৈলেন রায়,—এস, রায়। কাগজে ভুল কোরে 'এস রায়, জমীদার', লিখেছিল। মাসীমা যখন এখানে হাওয়া বদ্‌লাতে আসেন, সুপ্রকাশ-দা তখন এদেশে ছিলেন না; কোল্‌কাতায় জমীদারীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মাসীমার কাছে আমিই ছিলাম। তখন আমার বিবাহের এন্‌গেজমেণ্ট হয়ে গিয়েছিল। মাসীমার সেবার জন্যে আমি মিসেস্ দাসকে নিযুক্ত করি। তিনি মাসীমার কাছে প্রায়ই তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নানা কথা বোল্‌তেন যে, তাঁর স্বামী অত্যন্ত মাতাল ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করেন। কোন খানে কাজ নিলেও তাঁকে নানা কথা বলেন, কাজ না কর্‌লেও প্রহার করেন ইত্যাদি। একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে তিনি মিসেস্ দাসের কাছে টাকা চান। টাকা না পাওয়ায়, তিনি মিসেস্ দাসকে প্রহার করিতে আরম্ভ করায়, আমি মাসীমার আদেশ-মত চাকর দিয়ে তাঁকে আমাদের বাড়ী থেকে বাহির করিয়ে দিই। শেষে সেই অবস্থায় সেই লোক আমাকে মিঃ রায় জমিদার, মনে কোরে, আমার নামে ১০ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের দাবী দিয়ে, আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-ভঙ্গের জন্যে নালিস করেন। পরে আমি টেলিগ্রাম কোরে সুপ্রকাশ-দাকে আনাই। আমার স্ত্রীর দিদিমা তখন এলাহাবাদে ছিলেন। তিনি কেমন কোরে এই সব কথা শুনেছিলেন, তাই তিনি ব্যস্ত হ'য়ে এখানে আসেন। তিনি সব জানেন। সুপ্রকাশ-দা যখন দেখ্‌লেন যে মিঃ এস রায়-জমীদার, বোলে নালিশ করেছে, তখন হেসে উঠ্‌লেন। মাসীমা কিন্তু তাঁকে আদালতে দাঁড়াইতে হয়, তা চাইতেন না। সুপ্রকাশ-দা বল্লেন, 'শৈলেন বেচারির বিয়ের ঠিক্ হয়েছে, তার নামে কথাটা উঠ্‌লে, নানারকম গোল হবে; বিয়ে হয় ত হবে না! ওকে আমি বিলেতে পাঠিয়ে দেব। আমার নামে বল্লে কি হবে ? আমি গ্রাহ্য করি না।' তখন সুপ্রকাশ-দা বিয়ে কোর্ব্বেন না, স্থির করেছিলেন। মকদ্দমার দিন ঠিক্ হয়ে গিয়েছিল। হটাৎ তার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় মিঃ দাস আমাদের বাড়ীর গেটের পাশ থেকে আমাকে লক্ষ্য কোরে বন্দুক ছুঁড়্‌তে গিয়ে, কেমন ভাবে বন্দুক টানেন যে, তা

তাঁর মাথা ভেদ কোরে চলে যায়। সে কি কাণ্ড!—পুলিশ-এজাহার!—এখনো মনে হলে কি রকম মনে হয়! সুপ্রকাশ-দা আমার জন্যে সব সহ্য করেছেন। আজ, আমার জন্যে তাঁর নির্দ্দোষ নামে এত কলঙ্ক! আজ আমার জন্যে তাঁর স্ত্রী যায় যায়! এ সব শুনলে হয় ত আমার স্ত্রীও বাঁচ্‌বে না।" এইসব বলিতে বলিতে শৈলেন সেইস্থানে বসিয়া দুই হ'স্তে আপনার মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

সুব্রত সমস্ত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া, সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া, তাঁহার দুইটি হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "আপনি দেবতা; আপ্‌নার মত যে মানুষ হয়, তা আমি জান্‌তুম না। পরের জন্যে আপ্‌নার এত ত্যাগ-স্বীকার! আপ্‌নার পায়ের ধুলো দিন্, আমি মাথায় নিয়ে ধন্য হব। শীলাকে আমি এখন নিজের বোনের মতই দেখি, আর দেখ্‌বোও। আপ্‌নি আজ থেকে আমার নিজের বড় ভাইয়ের মত হ'লেন। আমায় যা যখন আদেশ কোর্ব্বেন, আমি পালন কোর্ব্বো।"

সুপ্রকাশ সুব্রতর প্রতি বিস্ময়-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আগে শীলাকে ফিরিয়ে পাই, নতুবা সব বৃথা হবে। যাই হোক্, এ কথা আর জানাজানি কর্ব্বার অবশ্যকতা নেই; শুধু আপ্‌নি নিজে শীলাকে বোল্‌বেন। আপ্‌নি এখন এখানেই থাকুন্। আপ্‌নি আজ থেকে আমার অতিথি।" তারপর শৈলেনের প্রতি চাহিয়া তিনি বলিলেন, "শৈলেন, ওঠ ভাই, তোমার কোনও দোষ নেই। একথা সুষমাকে কেউ বোল্‌বে না। বল্লেও কোন ক্ষতি নেই।"

শৈলেন। (সুব্রতকে) আসুন, আপ্‌নাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই।

তাঁহারা উঠিলেন। এমন সময় আয়া দ্বারের নিকট হইতে বলিল, "হুজর মেমসাহেব-কো হোঁস্ আনে পর গুয়া—।"

সুপ্রকাশ দ্রুতপদে আয়ার সহিত চলিয়া গেলেন। সুব্রতকে লইয়া শৈলেন হোটেলের বাহিরে গমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

অজ্ঞাতাভাস।

মুক্ত করি ত্রস্ত-করে দক্ষিণ-দুয়ার,
মলয় বহিছে আজি বসন্ত-সম্ভার
যেন কি সন্দেশ ল'য়ে! নিভৃত-প্রাণের
গোপন মরমতলে কা'র চরণের
মধুর নূপুর বাজে! পুলকে ব্যথায়
চকিতে শিহরি চিত্ত উন্মত্তের প্রায়
করে কা'র অন্বেষণ! উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল
ক্ষণে ক্ষণে সারা হৃদি, হারায়ে দু'কূল
অকূলে ভাসিতে চায়! স্বপনের কোলে
বেজে উঠে বাঁশী যেন মদির-হিল্লোলে
কেড়ে লয়ে প্রাণ-মন! অতৃপ্ত যৌবন
মাধবী পুষ্পের মত বিকশি কেমন,
চেয়ে রয় কা'র করে সঁপি আপনায়
শোভিবে কোমল বক্ষ চুম্বন-মালায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রীতি-উপহার।

তোমাতে আমাতে সখি,
রহিলেও ব্যবধান,
তোমারি মধুর স্মৃতি
রহে পূর্ণ সারা প্রাণ।
মরমের তালে তালে
নিরলে নিভৃতে নিতি,
তোমারি রাগিণী বাজে
অবিরত ঢেলে প্রীতি।

এ নব বরষে আজি
লইয়া নবীন আশা,
অরপিনু তব করে
"উপহার ভালবাসা।"
যদিও বা অতিতুচ্ছ
সৌরভ-বিহীন ফুল,
তবু আশা,—হৃদি-নভে
দিবে আলো তারা তুল।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

উনবিংশ অধ্যায়—আকস্মিক দুর্ঘটনা।

মনুষ্য-জীবনে অনেক সময় অনেক আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এই দুর্ঘটনাগুলির প্রতিবিধান জানা থাকিলে, তাহা সময়ানুসারে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। মহিলাগণের এ-সকল বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেইজন্য নিম্নে কতকগুলি দুর্ঘটনার প্রতিবিধান লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

আহত স্থানের চিকিৎসা।

কখনও কখনও বালক-বালিকাদিগের হস্তে ছুরিকা লাগিয়া বা কাচ ফুটিয়া রক্তস্রাব সঙ্ঘটিত হয়। এইরূপ সময়ে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে:—

(ক) ক্ষতস্থান শীতল জলের দ্বারা ধৌত করিয়া, তাহার ভিতরের ময়লা,—ভগ্ন কাচখণ্ড বা অন্য কোনও পদার্থ, যাহা কিছু থাকে—পরিষ্কার করিয়া দিবে। নতুবা, ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হইবে না।

(খ) কর্ত্তিত মুখ-দুইটী নিকটবর্ত্তী করিয়া তাহাতে মলম দিয়া ষ্টিকিং প্লাসটার লাগাইয়া দিবে। ষ্টিকিং প্লাস্টারের টুক্রা অতিক্ষুদ্র হওয়া চাই।

(গ) ক্ষত-স্থান এরূপ-ভাবে রাখিবে, যেন তাহাতে নড়্‌চড়্ না লাগে। নড়্‌চড়্ লাগিলেই ক্ষত-মুখটীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইরূপ ঘটিলে ক্ষত জুড়িতে বিলম্ব হয়।

(১) ধমনীর রক্তস্রাব :—ধমনীর রক্ত দেখিতে উজ্জ্বল, ইহার স্রাব পরিমাণে অধিক হয় এবং নিঃসৃত হইবার কালে বেগে বহির্গত হয়। এবম্বিধ রক্তস্রাব ভয়ানক বিপজ্জনক। মূল-ধমনী হইতে যদি রক্তস্রাব হয়, তবে অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা কর্ত্তব্য। ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে রক্তবমনকারী স্থানকে উচ্চে ধারণ করিয়া, তাহার উপর স্থূল বস্ত্রখণ্ড বা তদ্রূপ কোনও পদার্থ, যাহা সেই সময়ে প্রাপ্ত হইবে, রক্ষা করিয়া, রুমালদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে।

(২) শৈরিক রক্তস্রাব। -- কৃষ্ণবর্ণের রক্তস্রাব দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহা শিরা হইতে বহির্গত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রেও স্রাব ক্রমাগত হইয়া থাকে। ইহার প্রতিকার পূর্ব্বোক্তরূপ।

মূর্চ্ছা।

মস্তকে আঘাত লাগিলে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হইলে, অথবা শরীরের শোণিত উত্তমরূপ অক্সিজন না পাইলে মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালনীয়।

(১) রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া তাহার মস্তকটী উচ্চে স্থাপন করিবে।

(২) গলার চতুঃপার্শ্বের কাপড় খুলিয়া দিবে।

(৩) রোগীর চতুঃপার্শ্বে বিশুদ্ধ হাওয়া খেলিতে দিবে ; এবং

(৪) রোগীকে শীঘ্রই নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে বা ডাক্তারের নিকট লইয়া যাইবে।

মূর্চ্ছা হইলেই রোগীকে তৎক্ষণাৎ সোজা করিয়া শয়ন করাইয়া শরীরের সমান উচ্চতায় তাহার মস্তকটী রক্ষা করিবে ; যেন মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া শোণিত সহজে প্রবাহিত হইতে পারে। হৃৎপিণ্ড যখন মস্তিষ্কে রক্ত চালিত করিতে না পারে, তখনই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। মূর্চ্ছাকালে Eau-de-Cologne অথবা নিসাদল নাকের সম্মুখে রাখিতে পারা যায়। কিন্তু মস্তকটী যেন শরীরের সমান উচ্চতায় থাকে ;—এ বিষয়ে যেন ভুল না হয়। শীতল জলের ঝাপ্‌টা মুখে দিলেও রোগীর মূর্চ্ছারোগ ভাল হয়। ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য।

মূর্চ্ছাকালে রোগীকে কখনও কিছু খাইতে দিবে না। কারণ, তদ্দ্বারা তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

জলে ডুবা।*

জলনিমজ্জিত ব্যক্তির কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্থাপনা করিবার চেষ্টা করিবে।

---

* আজকাল জলে ডুবিলে, ডাক্তার সেফারের প্রণালীটিই (Dr. schafer's method) সহজ-সাধ্য ও অধিক ফলদায়ক বোধে অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে জলমগ্ন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে উপুড় করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হয়। রোগীর মুখটী সেবকের পরীক্ষার সুবিধার জন্য, ঈষৎ বাম বা দক্ষিণ দিকে (যে দিকে সেবক বসিবেন, সেই দিকে) ফিরাইয়া রাখা হয়। তাহার পর সেবক তাহার সুবিধামত রোগীর দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া রোগীর উভয় পাঁজরের উপর নিজের দুইটী হাত স্থাপন করিয়া, অল্প অল্প চাপ দিয়া তাহা উপরে বগলের কিছু নীচ অবধি উঠান। হাত-দুইটী উপরে উঠাইবার সময় চাপ অল্প অল্প বাড়াইতে হয় ; এবং হাত যখন বগলের কাছে আসে, তখন চাপ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। প্রতিমিনিটে ১২ হইতে ১৫ বার এইরূপ করিলেই যথেষ্ট। এইরূপ করিতে করিতে, কিছুক্ষণ পরে রোগীর নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে এবং তখন তাহার নাকের কাছে হাত দিলেই উহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিঃশ্বাস

(১) তাহার অঙ্গ হইতে বস্ত্রাদি উন্মুক্ত করিয়া তাহার মুখের আবিলতাকে পরিষ্কার করিয়া দিবে।

(২) মস্তকের নিম্নে বালিশ রাখিয়া মস্তকটীকে সামান্য উচ্চ করিয়া দিবে।

(৩) রোগীর বাহুদ্বয় (তাহার কনুই-য়ের নিকট) ধারণ করিয়া, তাহা সোজা উত্তোলিত করিয়া মস্তকের পশ্চাতে লইয়া যাইবে ও পরে মস্তকের পশ্চাৎ হইতে সেই-দুইটীকে সম্মুখে লইয়া আসিয়া বক্ষে সংলগ্ন করিবে। এইরূপ ক্রিয়া চারি সেকেণ্ড পরে পরে করিবে; শীঘ্র শীঘ্র করিবে না। এইরূপে কৃত্রিম নিঃশ্বাস স্থাপিত হইবে। স্বাভাবিক শ্বাস লইতে রোগীর ১৫।২০ মিনিট, এমন কি অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত সময়ও লাগে।

(৪) শরীরের উষ্ণতা যথাসম্ভব রক্ষা করিবার জন্য জলনিমজ্জিত ব্যক্তির গাত্রে কম্বলাদি আচ্ছাদিত করিয়া দিবে ও রক্তের গতি নিয়মিত করিবার জন্য শরীর ও পদ ঘর্ষণ করিতে থাকিবে।

গলায় জিনিস আট্‌কান।

দুর্ভাগ্য-বশতঃ বালকেরা যদি মটর বা মার্ব্বেল খাইয়া ফেলে ও তাহা গলায় আটকা-ইয়া যায়, তবে প্রথমতঃ, তাহার গলায় অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বমন করাইতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে ফললাভ না হইলে সন্নিকটবর্ত্তী কোনও ডাক্তারকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইবে।

যখন বেশ পড়িতে থাকে, তখন উক্ত ব্যাপার ধীরে ধীরে কমাইয়া, ক্রমে থামাইয়া দিতে হয়। এই প্রণালীতে উপকার না হইলে, অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য

হুল-ফুটা।

শরৎকালে বোল্‌তা ভীমরুল প্রভৃতি প্রায়ই দংশন করে। এরূপ স্থলে হুলটীকে নিষ্কাসিত করিয়া laudanum লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। হুল তুলিয়া লইয়া লবণ-দ্বারা ঘর্ষণ করিলেও যন্ত্রণা লোপ পায়।

দগ্ধ হওয়া।

দগ্ধ হইয়া যাইলে, স্থানটীর বস্ত্রাদি খুলিয়া দিয়া, রেড়ির তেল ও চূণ ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহার উপর তৎক্ষণাৎ লাগাইয়া দিবে। চর্ম্মের যে-সকল স্থানে বস্ত্রাদি লাগিয়া গিয়াছে তাহা ছাড়াইতে চেষ্টা করিও না।

(২) সোডা বাই-কার্ব্বের জলে ন্যাকড়া ডুবাইয়া দগ্ধ স্থানে বাঁধিয়া দিবে। ৮ হইতে ২৪ ঘণ্টা পরে ফোস্কাগুলি স্থচ-দ্বারা গালিয়া দিয়া, তাহা বসাইয়া দিবে; কিন্তু ফোস্কা উঠা-ইতে চেষ্টা করিও না। পরে দগ্ধ স্থানটীতে ভেসিলিন লাগাইয়া দিবে।

চক্ষু ও কর্ণে বাহ্য বস্তুর প্রবেশ।

চক্ষে ধূলিকণা পতিত হইলে চক্ষু বুজিয়া থাকিলে অশ্রুগ্রন্থি হইতে জল নিঃসৃত হইয়া ধূলিকণা বা উত্তেজক পদার্থকে দূর করিয়া দেয়। যদি পতিত পদার্থ চক্ষে না দেখা যায়, তবে সামান্য রেড়ির তৈল চক্ষুতে দিয়া কিয়ৎ-কাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলে, যন্ত্রণার উপ-শম হয়। চক্ষে চূণ পতিত হইলে ভয়ানক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। তখন সির্কায় উত্তমরূপে জল মিশ্রিত করিয়া, তদ্দারা চক্ষু ধৌত করিয়া ফেলিবে। চূণের কণাগুলি অপসারিত হইলে, সামান্য রেড়ির তৈল চক্ষে দিলে কষ্টের উপশম হইবে।

কর্ণে কোনও বস্তু প্রবেশ করিলে, যদি তাহা অঙ্গুলি-দ্বারা নাগাল না পাওয়া যায়, তবে সোন্না দ্বারা তাহা বাহির করিবে; কিন্তু সাবধান, যেন কর্ণঢক্কায় কোনরূপ আঘাত না লাগে। কারণ, আঘাতের ফল অতিভয়ানক।

কর্ণপ্রবিষ্ট বস্তু যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে ঈষদুষ্ণ জল কর্ণে প্রবেশ করাইয়া আহত কর্ণটী নীচের দিকে রাখিয়া উপরিস্থিত কর্ণকে চাপড়াইলেই কর্ণপ্রবিষ্ট বস্তু পড়িয়া যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

স্নেহের ব্যথা।

(গল্প)

(১)

করুণার মা মৃত্যুর সময় স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার করুণা যেন কখনও কষ্ট না পায়।" নরেন্দ্রবাবু পত্নীর শেষ অনুরোধটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিয়াছিলেন। করুণা কখনও মাতার অভাব অনুভব করিতে পারে নাই। উপযুক্ত পাত্রে কন্যা-সমর্পণ করিয়া অল্পদিন পরেই যখন নরেন্দ্রবাবু পরলোক গমন করিলেন, তখন লোকে বলিল যে, কর্ত্তব্যপালনের জন্যই যেন নরেন্দ্রবাবু এতদিন বাঁচিয়া ছিলেন; তাই মুক্তি পাইবামাত্র তাঁহার উন্মুখ প্রাণ প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

করুণার স্বামী নূতন ডেপুটি হইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিতে লাগিলেন। করুণা ছেলে-মানুষ, এখনও সংসার করিতে শিখে নাই; তাই সে বিধবা শাশুড়ীর কাছে রহিল। শাশুড়ীর মৃত্যু হওয়ায়, করুণার স্বামী তাহাকে নিজ কার্য্যস্থানে লইয়া গেলেন। ইহার পূর্ব্বে করুণা স্বামীকে ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পায় নাই। যখন তাহার কল্পনার দেবতাকে সম্মুখে পাইয়া সে সবে পূজার আয়োজন আরম্ভ করিয়াছে, তখন নিষ্ঠুর বিধাতা তাহাকে সেটুকু হইতে বঞ্চিত করিলেন। পনের বছর বয়সে স্বামী হারাইয়া করুণা সংসার অন্ধকার দেখিল। কোথাও আশ্রয় দিবার মত কাহাকেও দেখিতে পাইল না। প্রতি-বেশিনীদের মধ্যে অনেকে আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার অধিক কিছু দিবার সাধ্য তাঁহাদের ছিল না। একজন বলিলেন, "মা, তোমার আত্মীয়-স্বজনকে তোমার অবস্থা জানাও; এখানে বিদেশে একলা মেয়েমানুষ ত থাক্‌তে পার্‌বে না। ঠিকানা দিলে, আমাদের বাবু তোমার আপনার লোকের কাছে টেলিগ্রামও কর্‌তে পারেন।"

করুণা অনেক চিন্তা করিয়াও শ্বশুর কিংবা পিতৃকুলের কোনও নিকট আত্মীয়ের কথা স্মরণে আনিতে পারিল না! অবশেষে তাহার মনে হইল যে, তাহার এক মাতুল কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী করেন। তিনি একটু অধিক সাহেবী-ভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহার সহিত করুণাদের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল না। যাহা হউক, এমন বিপদের সময় করুণা তাঁহাকেই

পত্র লেখা স্থির করিল। তিন-চারি দিন পরে পত্রের উত্তরে এক টেলিগ্রাম আসিল যে, করুণার মামাতো ভাই যতীন্দ্র তার পরদিনই তাহাকে লইয়া আসিবে! আশ্রয়-লাভের আশা সত্ত্বেও করুণা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রক্তের সম্পর্ক থাকিলেও মাতুল অমরেন্দ্র তাহার নিকট একপ্রকার অপরিচিতই ছিলেন। নিতান্ত ছেলেবেলায় করুণা দুই-একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিল। তারপর তাহার বিবাহের সময় তিনি একখানি বহুমূল্য বারাণসী শাড়ী উপহার পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজে দেখা করিতে আসেন নাই; সহর ছাড়িয়া গেলে কাজের ক্ষতি হয়, এইকথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

যতীন্দ্র সেইবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়া ছুটিতে বাড়ী বসিয়াছিল। সে গিয়া করুণাকে কলিকাতায় লইয়া আসিল। অমরেন্দ্রবাবুর বিশাল ভবনের এককোণে একটুখানি আশ্রয় পাইয়া করুণা বাঁচিল।

ঘোরতর বিষয়ী লোক বলিলে যাহা বুঝায়, মিষ্টার ও মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি, অর্থাৎ অমরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার পত্নী, তাহাই ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা করুণাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুবিধবা—যে সাতেও নাই পাঁচেও নাই, একমুঠা অন্নের পরিবর্ত্তে যে অন্নদাতা আত্মীয়ের সংসারে দাসীপনা করিতে প্রস্তুত,—তাহাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত না হইবারই কথা। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি, অবশ্য, করুণাকে কাজ করাইবার জন্য গৃহে আনেন নাই। তাঁহার দাসদাসীর অভাব ছিল না। করুণার জন্য তাঁহার অতিরিক্ত ব্যয়ের সম্ভাবনা ছিল না; কাজেই, তিনি মনে করিলেন যে, তাঁহার অল্প একটু দয়াতে যদি অনাথা ভাগিনেয়ীটি একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার জায়গা পায়, তবে মন্দ কি? মাতুলগৃহে আসিয়া করুণা নিতান্ত সুখে না হউক, নিতান্ত দুঃখেও রহিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি একটু অধিক সাহেবীভাবাপন্ন ছিলেন। "সাহেব" না বলিয়া কেহ তাঁহাকে "বাবু" বলিলে তিনি বিলক্ষণ চটিতেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার পূরাদস্তুর সাহেবী রকম ছিল। কিন্তু গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পূজা-পার্ব্বণে উৎসব-আমোদগুলি বাদ যাইতে পারিত না। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির এ-সব অনুষ্ঠানে কোনও আপত্তি ছিল না; কারণ, হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিবার সংকল্প, তাঁহার কোন কালেও ছিল না; তবে, তিনি একটু সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার অধিক বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই, বোধ হয়, যথেষ্ট হইবে যে, তিনি Reformed Hindu দলের একজন নেতা ছিলেন।

এইসব সাহেবী ধরণ-ধারণের মধ্যে আসিয়া করুণা প্রথম প্রথম বড়ই অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। সময় ও অভ্যাসের গুণে সবই সহিয়া যায়; করুণাও ইহাদের আচার-ব্যবহারে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া গেল।

একটা কথা এতক্ষণ বলা হয় নাই। করুণা মুখে মামা, মামী ও দাদা বলিলেও এবাড়ীর লোকের প্রতি বিশেষ একটা প্রাণের টান সে অনুভব করে নাই। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির দশমবর্ষীয়া কন্যা মৃণালিনী বা মনু একমুহূর্ত্তেই তাহার হৃদয়খানি করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। মনুকে

ভালবাসিয়াই সে ক্রমে মামা, মামী, ও যতীন-দাদাকে আপনার জ্ঞান করিতে শিখিল। প্রথম দিন মনু একটু দূরে দূরে ছিল, কিন্তু দুইদিন যাইতে না যাইতেই সে এই নূতন দিদিটির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

(২)

করুণা ছেলেবেলা হইতেই একপ্রকার নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। পিতা তাহাকে চক্ষের আড়াল করিতেন না, তাই সে কখনও অন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু পায় নাই। চিররুগ্না শাশুড়ীর কাছে থাকিতে, তাঁহার সেবা করিয়াই তাহার সব সময় কাটিয়া যাইত, পাড়ার সমবয়স্কা বৌঝিদের সঙ্গে বিশেষ ভাব করিবার সুযোগ ঘটে নাই। তাহার পর স্বামীর নিকট যে সামান্য কয় দিন ছিল, তখনও বাহিরের লোকের সহিত বড় একটা মিশিতে পায় নাই।

বাল্যকাল হইতে করুণা বড়ই ভক্তিমতী। যখন সে সম্মুখে সৌম্যমূর্ত্তি স্বামীকে দেখিল, তখন তাহার ভক্তিপ্রবণ চিত্ত তাঁহার পদে লুটাইয়া দিয়া সে কেবল পূজা করিতেই ব্যস্ত রহিল। স্বামীর প্রেমস্পর্শে তাহার প্রণয়-কোরকটী যখন সবে দলগুলি মেলিতে আরম্ভ করিয়াছে, বিধাতা ঠিক্ সেই সময়ে সেটিকে বৃন্তচ্যুত করিলেন। সন্তানের জননী হইলে, হয় ত, করুণার ভক্তিপ্রেমপূর্ণ চিত্তটি বাৎসল্য রসে আপ্লুত হইয়া পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিত, কিন্তু বিধির বিধানে তাহা ছিল না।

যাহাই হউক্, মনুকে পাইয়া করুণার হৃদয়ের সুপ্ত স্নেহরাশি জাগিয়া উঠিল। সে পূর্ব্বে কখনও কাহাকেও এত ভালবাসে নাই। এই স্নেহোচ্ছ্বাসের কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া সে একদিন মনুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি আর জন্মে আমার বোন্ ছিলি, মনু?" মনু একটু কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, "কেন দিদি? এ জন্মেই ত আমি তোমার বোন্!" করুণা মনে মনে বলিল, "যদি মায়ের পেটের বোন্ হতিস্ রে, তবে তোকে কেউ দূরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করত না।"

করুণা কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিল যে, তাহার মামা-মামী তাহার প্রতি মনুর এতটা টান পছন্দ করিতেছেন না; কারণ, মনু দিদির আদর্শে সাহেবীভাবের বিরোধী হইয়া পিতার শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যাইতেছিল। তাই, তাঁহারা সুবিধা পাইলেই, কোনও ছুতায় মনুকে করুণার নিকট হইতে সরাইয়া লইতেন। এইজন্যই মনুর প্রতি আজ ঐ প্রশ্ন।

একদিন দুপুর-বেলা, করুণা নিজের ঘর-টিতে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল, এমন সময় তাহার মামী আসিয়া তাহার পাশে বসিলেন। মামীর আগমনে সে একটু বিস্মিত হইল। কারণ, প্রয়োজন হইলে তিনি করুণাকে ডাকিয়া পাঠান, কখনও নিজে তাহার ঘরে আসেন না। বইখানা সরাইয়া রাখিয়া করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু দরকার আছে, মামী-মা?" মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "এই একটু গল্প করতে এলুম।" তাহার পর দুই-চারি কথার পর বলিলেন, "দেখ, করুণা, তুমি আমাদের নিজের লোক, তোমাকে সব বলাই ভাল। ওঁর ইচ্ছে, মনুকে কোন বিলেত-ফেরতের হাতে দেন। ওর শিক্ষাদীক্ষাও সেইরকম ভাবেই দেওয়া হচ্ছে। এখন ও কিন্তু কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে! তোমাকে ও খুব

ভালবাসে, তা' ত জানই ; সেইজন্যেই, বোধ হয়, পড়াশুনা গান-বাজনায় একটু অমনোযোগী হয়ে পড়েছে।"

করুণা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি ত কখনও মনুকে পড়া, গান, এ-সব বন্ধ করতে বলি নি। তা-ছাড়া আমি নিজেই ত চাই যে, মনু ঐ সব বেশ করে শেখে। আমার জন্যে ওর এ-সব দিকে ক্ষতি হচ্ছে কেমন কোরে, বুঝতে পারলুম না ত মামী-মা ?"

তাহার মামী তখন বলিলেন, "না, না, আমি ত বলি নি যে, তুমি বারণ করেছ। তবে মনু থেকে থেকে সব কাজকর্ম্ম ফেলে এসে বলে, 'মা, দিদির কত কষ্ট! আমি ওর সঙ্গে গল্প করলে ও ভাল থাকবে ; আমি যাই, একটু গল্প করি গে।' এই জন্যেই বলছিলুম যে, অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে।"

মনুর গভীর প্রীতির কথা শুনিয়া করুণার চোখে জল আসিল, সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল,"আমাকে কি করতে বলেন, মামী-মা ?" মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "আমি বলছিলুম যে, তুমি ওর গল্পপ্রিয়তাকে প্রশ্রয় দিও না। ও তোমাকে এত ভালবাসে, তোমারও উচিত নিজের একটু স্বার্থ ত্যাগ কোরে ওর ভাল দেখা। তুমি বুঝিয়ে বল্লেই, মনু শুনবে, এই আমার বিশ্বাস। ওর সব খামখেয়ালী চলনে, উনি বড় বিরক্ত হন। এই দেখ না, আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই মেমেরা আসেন। সেইজন্যে উনি চান যে, মনু জুতা-মোজা পরে থাকে। পরন্তু কিনা সে একেবারে খালি-পায়ে মিসেস্ স্মিথের সামনে গিয়ে হাজির। উনি যখন বকলেন, তখন আবার বল্লে 'দিদি ত খালি পায়ে থাকে। এতে কি দোষ ?' " এই সময় মনু সেই গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার জননী উঠিলেন।

করুণা মামীর সহানুভূতির অভাবে একটু আঘাত পাইলেও, মনে মনে একটু আনন্দ লাভ করিল যে, তিনি তাহাকে নিতান্ত পর মনে করেন না। জোর করিয়া মনুকে তাহার নিকট হইতে না সরাইয়া, তিনি যে তাহার সহিত মন খুলিয়া সে-বিষয় কথা বলিলেন, ইহাতে সে অনেকটা আরাম অনুভব করিল। সে মনুকে কাছে বসাইয়া বলিল, "মনু, তুমি আমার সব কথা শুনবে ?" মনু উৎসাহপূর্ব্বক সম্মতি জানাইল। করুণা বলিল, "তুমি আজকাল দুষ্টু মেয়ে হয়ে যাচ্ছ, কেন বল দেখি ? মামীমা বলছিলেন, তুমি মন দিয়ে পড়া-শুনা কর না!" মনু করুণার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "তোমাকে ছেড়ে মন লাগে না যে দিদি! বাবাকে বোলে আমার পড়ার সময় তোমাকে সেই ঘরে বসিয়ে রাখব, তা হ'লে পড়া হবে।" করুণা হাসিয়া বলিল, "দূর পাগলী। আমাকে দেখে তোমার মেম শিক্ষয়িত্রী ভাববেন এ একটা জন্তু না কি! আমি কি তাঁর সামনে বেরোতে পারি ভাই!" মনু সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ইস্ মিসেস্ রো কখখনো কিছু মনে করবেন না।" করুণা সে কথা চাপা দিয়া বলিল, "মনু, লক্ষ্মী বোনটী আমার, তোমার বাবা-মা যা বলেন, তাই শুনে চলো। তাঁদের অসন্তুষ্ট করো না। তুমি ভাল মেয়ে হোলে আমার কত আনন্দ হবে, বল দেখি! মনু সংক্ষেপে "আচ্ছা" বলিয়া করুণার চুল ঘাঁটিতে লাগিল। মনুকে কাছে পাইলে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না ; কিন্তু পাছে মামী বিরক্ত হন,

তাই করুণা বলিল, "এবার তুমি যাও, আমার অন্য কাজ আছে।" মনু বলিল, "তোমার আবার কি কাজ? আমাকে তাড়াবার ফন্দি, না?" করুণা হার মানিয়া চুপ করিল।

(৩)

মনু আজকাল বাপ-মায়ের কথামত সব করে। করুণার দেখাদেখি সে মাছ-মাংস খাওয়া ছাড়িয়াছিল, কিন্তু তাহারই অনুরোধে সে আবার তাহা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রথম প্রথম করুণার সময় কিছুতেই কাটিতে চাহিত না। যে সময়টুকু মনু গান-বাজনা, পড়াশুনা বা চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি লইয়া থাকে, করুণা ততক্ষণ কি করিবে ভাবিয়া পায় না। একদিন সে মামীকে বলিল, "মামীমা, শুধু বসে বসে আমার ভাল লাগে না। ভাঁড়ার দেওয়া, খাবার জোগাড় করা, এ-সব চাকরদের হাতে না দিয়ে, আমাকে দিলে ভাল হয়। আপনাদের কি তাতে কোন আপত্তি আছে?" মিসেস্ চাটার্জ্জি বলিলেন, "না, আপত্তি আবার কি? তুমি করলে ত ভালই হয়।" সেই দিন হইতে করুণা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

একদিন মনু আসিয়া বলিল, "দিদি, আমি তোমার কাছে ঘরসংসারের কাজ শিখ্‌বো।" করুণা তাহার গাল ধরিয়া বলিল, "তোকে এ-সব করতে হবে না। তোর যে একজন মস্ত সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবে। তার বাড়ীতে কাজ কর্ব্বার ঢের লোক থাকবে।" মনু রাগ করিয়া বলিল, "আমার বিয়েই হবে না, তা আবার সাহেব!" করুণা হাসিয়া বলিল, "তোর যে তের বছর বয়স হয়েছে, কে বলবে? প্রথম দিন যেমন ছেলে-মানুষটি দেখেছিলুম, আজও তেমনিটিই আছিস্। তোর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল, জানিস্!" মনু বলিল, "তা হোক্। আমার হবে না। বাবা বলেছেন যে, আমার পছন্দমত আমার বিয়ে হবে। তা আমার কিছুতেই কাউকে পছন্দ হবে না।" করুণা বলিল, "আমাদের গুণবতী রাজকন্যার যোগ্যবর, বুঝি, এ ভূভারতে মিল্‌বে না?" মনু তাহার আরক্ত মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাও,—তাই বুঝি!" তাহার পর হঠাৎ একনিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আমি তোমায় ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী যেতে পার্ব্বো না। তুমি যদি সঙ্গে যাও ত বিয়ে কোর্ব্বো।" করুণা ছল্‌ছল্ চোখে মনুর পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল, "ছিঃ, তাকি হয়? মামা থাক্‌তে আমি অন্য জায়গায় যেতে পারি কি? উপায় থাক্‌তে কে আবার পরের গলগ্রহ হয়?" মনু অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমি তোমার পর, না?" করুণা সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিল, "ভগিনীপতিটি ত পর। তিনি ত আর তোমার খাতিরে আমায় ভালবাস্‌বেন না।" মনু বলিল, "তবে আমি বিয়েই কোর্ব্বো না।" করুণা বলিল, "মেয়ে মানুষের কি বিয়ে না করলে চলে, পাগ্‌লী?" মনু বলিল, "আচ্ছা সে কথা থাক্। একটা গল্প বল না, দিদি!"

এই বলিয়া করুণার কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। তারপর করুণার একগুচ্ছ চুল সাম্‌নে টানিয়া আনিয়া বলিল, "দিদি, তোমার কি সুন্দর চুল! এমন আমি কোথাও দেখি নি। এই চুল তুমি কাট্‌তে চাচ্ছিলে! কি দুষ্টু! কখ্‌খন কাট্‌তে পাবে না। এখন

একটী গল্প বল।" করুণা হাসিয়া বলিল, "যা হুকুম।" তারপর সে সাবিত্রীর উপাখ্যান বলিতে লাগিল।

করুণার গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহার মুখের ভাবে, কণ্ঠস্বরে, শ্রোতাকে সে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারিত। সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া যখন সে পৌরাণিক কাহিনীগুলি মনুকে শোনাইত, তখন মনুর মনে হইত, সে যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহারই বর্ণনা করিতেছে! মনু শুনিতে শুনিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "দিদি, তুমি ত ঠিক্ সাবিত্রীর মত সতী; তুমি কেন তোমার স্বামীকে যমের কাছ থেকে ফিরিয়ে আন্‌লে না?" করুণা মনুকে বুকে চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ছি মনু, ও কথা বলো না। তাঁদের দেবতার অংশে জন্ম ছিল। তাঁরা যা পার্‌তেন, আমরা পাপী মানুষ কি তাই পারি, বোন্!" মনুর চোখেও জল আসিয়াছিল; সে করুণাকে জড়াইয়া বলিল, "দিদি, তুমি পাপী ত, পুণ্যবতী কে?"

(৪)

করুণার হৃদয়ের প্রায় সবটুকু স্নেহ-ভালবাসা, মনু একাই দখল করিয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে হইত, মনুর মত সুন্দর, বুঝি, বিধাতা আর কিছুই গড়েন নাই। মনু বড় হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ হইবে, এ-কথা মনে করিয়া করুণা কষ্ট অনুভব করিত। তখনই আবার লজ্জিত হইয়া মনে করিত, "ছিঃ, আমি কি স্বার্থপর!" মনু তাহার বুকের প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত যেন মিশাইয়াছিল; তাই তাহাকে ছাড়িবার কথা মনে হইলে, করুণার বুক ফাটিয়া যাইত।

এই সময় একদিন মনুর দূর-সম্পর্কের মামাতো ভাই সতীশবাবু, সপরিবারে আসিয়া মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির বাড়ীতে অতিথি হইলেন। তাঁহারা দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; সমস্ত পশ্চিমটা একবার ঘুরিয়া আসিবেন। তাঁহারা মনুকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন। মনুর পিতা-মাতা সানন্দে অনুমতি দিলেন। করুণাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া মনু দুই একবার "না" বলিয়াছিল, কিন্তু নূতন দেশ দেখিবার আকাঙ্ক্ষাই শেষে জয়ী হইল। মনু তাঁহাদের সহিত চলিয়া গেল। বিদায়ের দিন করুণা কিছুতেই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সতীশবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "মা গো, এ আবার কি? মায়ের চেয়েও দেখি যে, এঁর টান বেশী! একমাস মনুকে ছেড়ে ওঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবে আর কি!" করুণা এই কথা শুনিয়া দুইহস্তে বক্ষ চাপিয়া নিজের ঘরে গিয়া লুটাইয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আঘাত লাগিল যে, মনু এত সহজেই চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, আহা, ছেলেমানুষ! তাহার কি কোন সাধ থাক্‌বে না! করুণার যেন সংসারে মনু ছাড়া কোন আনন্দ নাই, তাই বলিয়া মনুও কি সব সুখ ছাড়িয়া তাহারই কাছে পড়িয়া থাকিবে?

মনু প্রায় রোজই করুণাকে পত্র লিখিত। করুণা সেগুলি সযত্নে তুলিয়া রাখিত; দিনে শতবার করিয়া সেগুলি পড়িত। দেখিতে দেখিতে একমাস হইয়া গেল। সতীশবাবু লিখিলেন যে, তাঁহার ছোট ছেলেটিকে আর কিছুদিন পশ্চিমে রাখিতে পারিলে তাহার শরীরের পক্ষে বড়ই ভাল হয়,—তাই তাঁহারা

তিনমাসের জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন ; তিন মাস পরে কলিকাতায় ফিরিবেন। মনুও তাঁহাদের সঙ্গে থাকে, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি সম্মতি জানাইয়া পত্রের উত্তর দিলেন। করুণা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দিন গণিতে লাগিল। করুণা ভাবিল, তিনমাসেই এত কষ্ট! মনুর বিবাহ হইয়া গেলে সে কেমন করিয়া বাঁচিবে!

বাস্তবিকই দিন যেন আর কাটে না! তাহার উপর মনু আজকাল পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছে। করুণা ভাবিল, এইবার অভিমান করিয়া একখানা পত্র লিখিবে ; কিন্তু তাহার পর মনে হইল, সেখানে বেড়াইতেই সময় কাটিয়া যায়, তাই বোধ হয়, মনু পত্র লিখিতে বেশী সময় পায় না।

তিন মাস পরে যে-দিন মনুদের আগমন-বার্ত্তা বহন করিয়া একখানি পত্র আসিল, সে-দিন আনন্দে করুণার সব কাজেই ভুল হইতে লাগিল। তাহার পর যখন একখানা গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিল, এবং মনুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তখন করুণার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। স্বাস্থ্যের প্রভায় মনুর স্বভাবসুন্দর মুখখানি দীপ্ত দেখাইতেছিল। করুণার ইচ্ছা করিতেছিল, শতচুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অত লোকের সাম্‌নে তা কি করা যায়? তাই এই তিন মাসের সঞ্চিত আদরটুকু লইয়া করুণা মনুকে নিজের ঘরে পাইবার অপেক্ষায় রহিল।

কেবল তিন মাস,—তার মধ্যেই এত পরিবর্ত্তন! করুণা দেখিল, মনু আর তেমন ভাবে তা'র সঙ্গে মেশে না। মনু সব সময়ই প্রায় সতীশবাবুর স্ত্রীর কাছে থাকিত। করুণা বুঝিতে পারিল না, কি অপরাধে মনু এমন পর-পর ব্যবহার করে! করুণা জানিত না যে, সতীশবাবুর স্ত্রী এই অল্প সময়ের মধ্যেই মনুকে বুঝাইয়াছেন যে, করুণার ভালবাসা কেবল স্বার্থ-প্রণোদিত,—ভবিষ্যতে মনুর ঘাড়ে চাপিবার ভূমিকা-স্বরূপ। মনু একবার বলিয়াছিল, "না বৌদিদি, তা কি হয়?" তাহার এই ক্ষীণ প্রতিবাদটি সতীশবাবুর স্ত্রীর অবজ্ঞার হাসির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। অন্য কেহ হইলে, হয় ত, এত সহজে ভুলিত না, কিন্তু মনুর প্রকৃতি চিরকালই খামখেয়ালী, তাই তাহার মনে কোন ভাবই গভীরভাবে দাগ দিতে পারিত না। করুণার প্রতি তাহার ভালবাসার উচ্ছ্বাস জোয়ারের জলের মত আসিয়াছিল, কাজেই তাহাতে আবার শীঘ্রই ভাঁটা ধরিয়া গেল।

সতীশবাবুর একটি শ্যালক সেই বৎসর ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিল। সতীশবাবুর স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা, ধনী পিতার একমাত্র কন্যা মনুর সহিত তাহার বিবাহ হয়। কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার এই অভিপ্রায় মনুর মাতাপিতাকে জানাইলেন। মিষ্টার ও মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি আগ্রহের সহিত সম্মতি জানাইলেন; কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে, 'ভাল ছেলে' বলিয়া সতীশবাবুর শ্যালক সুবোধের বেশ সুনাম আছে। বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই তাহার বুদ্ধি, চরিত্র ও লেখাপড়ার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল; বিলাত হইতে সে খ্যাতি মলিন না হইয়া, উজ্জ্বলতরই হইয়াছে। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, সুবোধকে জামাতৃরূপে পাইবার জন্য, অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত বিলাত-ফেরত পিতাই উন্মুখ

হইয়া আছেন। বিধাতা এমন রত্নটি অযাচিত ভাবে তাঁহাদের দান করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহারা পুলকিত হইলেন।

মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "সুবোধকে বাড়ীতে এনে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া যাক্। সে এসে মেয়ে দেখুক; তারও ত একটা মতামত আছে।" সতীশবাবুর স্ত্রী মনুর মাকে বলিলেন, "মনুকে দেখে তার আর মত না হয়ে যায় না। অমন মেয়ে সে আর পাবে কোথায়?" কন্যার প্রশংসা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত-চিত্তে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "বৌমা, তুমি দিন কয়েক থেকে যাও। তুমি থাকৃতে থাকৃতেই সুবোধ এলে; শীগ্রিই তার লজ্জা ভেঙে যাবে।"

করুণা সকলই শুনিল। সুপাত্রের সহিত মনুর বিবাহের আয়োজনে তাহার খুব আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কি জানি কেন, তাহার মনের এককোণে একটু ব্যথা লুকাইয়া রহিল।

সুবোধের সম্পূর্ণ মত জানিয়া মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি সেই মাসের শেষেই মনুর বিবাহ দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বিবাহের পূর্ব্বে সুবোধ এক-এক-দিন দেখা করিতে আসিত। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি করুণার সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু করুণা রাজি হয় নাই। সে আড়াল হইতে সুবোধের স্মিত-সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মনে মনে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া বলিত, "মনু যেন সুখী হয়।" একদিন সে মনুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মনু, বর দেখেছিস্ ত ? কেমন ? পছন্দ হয় ?" মনু, "যাও" বলিয়া পলাইয়া গেল। মনুর সলজ্জ অথচ আনন্দপূর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া করুণা বুঝিল যে, মনু সুবোধের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরের চরণে উভয়ের কল্যাণকামনা করিয়া সে কার্য্যান্তরে গেল।

(৫)

বিবাহের আর দুই দিন বাকী। কাজের গোলমালে করুণা একরকম আছে। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা তাহার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আর দুই দিন পরে মনু চলিয়া যাইবে। সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও কি তাহাকে আঁকড়াইয়া রাখিবার অধিকার করুণা পায় না? করুণা ঘরের ভিতর গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর আপনার স্বার্থপর ভালবাসার জন্য নিজেকে শতবার ধিক্কার দিল, কিন্তু তবুও যে মন মানে না! করুণা স্বামীর ছবিখানি বাহির করিল। অশ্রুজলে ভাল করিয়া স্বামীর মুখ দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল, মনুকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া সে বুঝি, স্বামীকেও ভুলিতে বসিয়াছে। সে তাঁহাকে গভীর ভক্তি দিয়াছিল বটে, তবে এমন করিয়া বুঝি, তাঁহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই! চোখের জল মুছিয়া ছবিখানা মাথায় ঠেকাইয়া করুণা আপন মনে বলিল, "ওগো, দাসীকে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে যাও। আমি যে এখানে থাকৃতে পারি না। কেমন কোরে আমি সব ছেড়ে বেঁচে থাকৃব?" আবার তাহার দু'চোখ হ'তে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এই সময়ে সতীশবাবুর স্ত্রী তথায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি করুণার ঘরে ঢুকিয়া, তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া বাহির হইয়া গেলেন; মনুর কাছে গিয়া বলিলেন, "তোমার দিদি না, তোমায় বড় ভালবাসে! এই শুভকর্ম্মের

সময় কি-না, ঘরের কোণে বসে চোখের জল ফেলা হচ্ছে! আসলে, তোমার এত ভাল বিয়ে হচ্ছে, তাই সহ্য হচ্ছে না।" মনু মাথা নীচু করিয়া রহিল, কোনও উত্তর করিল না।

যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেলে মনু শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল। কিছুদিন পরেই মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি কন্যাজামাতাকে আবার লইয়া আসিলেন। যে কয়দিন মনু ছিল না, করুণা সে কয়দিন অত্যন্ত কষ্টে কাটাইয়াছিল। প্রথম প্রথম ত একেবারে ঘুমাইতে পারিত না; বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ডাকিত, "মনু, মনু আমার! আমাকে তোর কাছে নিয়ে যা। আমার অত মান-অপমান দিয়ে কি হবে? আমি তোকে ছেড়ে থাকৃতে পারি না যে!" নিজের এই ভালবাসার আবেগ দেখিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইয়া যাইত। প্রণয়ীদের মধ্যেই ত এমন ভালবাসার কথা উপন্যাসে পড়া যায়! মনুকে সে কেন এমন ভালবাসে? প্রতিদিন ঠাকুরের কাছে করুণা প্রার্থনা করিত, "হরি, আমায় শান্তি দাও।"

এবার সুবোধের সহিত করুণার আলাপ হইল। তবে করুণা তাহার সহিত বড় একটা কথা বলিত না। একদিন সুবোধ মনুকে বলিল, "মৃণাল, তোমার দিদিকে ডাক না, একটু গল্প করা যাক্। তোমার দিদিকে আমার বড় ভাল লাগে। দেখ্‌লেই মনে হয় যেন একখানি দেবীপ্রতিমা।" মনু, বোধ হয়, কথাটা শুনিয়া একটু বিরক্ত হইল; বলিল, "এখন আর ডাকৃতে পারি না। সে হয় ত, কাজ কর্‌ছে।" এই সময় করুণা তাহাদের ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিল দেখিয়া, সুবোধ দরজার কাছে আসিয়া ডাকিল, "দিদি, একটু আসুন না; মৃণাল আপনাকে ডাক্‌ছে।"

করুণার মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছিল; তাহার অযত্নবর্দ্ধিত জটাবদ্ধ উন্মুক্ত কেশরাশি পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; সত্য-সত্যই তাহাকে একখানি দেবীপ্রতিমার ন্যায়ই দেখাইতেছিল। সে সুবোধকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিল।

সুবোধ এত বড় হইয়াও স্বভাবের সরলতা হারায় নাই; সে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "দিদি, আপনার কি সুন্দর চুল; ঠিক্ জগদ্ধাত্রীর মতন।" করুণা লজ্জিত হইয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। সুবোধের আহ্বানে ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডেকেছ মনু?" মনু মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি ডাকি নি। উনি মিথ্যা কথা বলেছেন।" সুবোধ হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহাতেও মনুর মুখের অপ্রসন্নতা দূর হইল না দেখিয়া, "আমার একটু কাজ আছে, সেরে আসি," বলিয়া করুণা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। বাহির হইতে সে শুনিতে পাইল, মনু সুবোধকে বলিতেছে, "তুমি বিধবাদের চুল রাখা পছন্দ কর? আমি ত দু'চক্ষে ও-সব দেখ্‌তে পারি না;—তা আবার লোক-দেখানর জন্যে খুলে বেড়ান!"

করুণার বক্ষের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইল; সে কোনমতে আপনাকে সাম্‌লাইয়া চলিয়া গেল। সুবোধ যে বলিল, "ছিঃ, মৃণাল, তোমার দিদি দেবী, তাঁর বিষয় অমনি করে বলা উচিত নয়।" এবং তাহার উত্তরে মনু যে বলিল, "আমি এতদিনে যা না চিন্‌তে পেরেছি, তুমি দেখ্‌ছি দু'দিনে তা

চিনে ফেলেছ।" এসব কথা আর করুণার কানে পৌঁছিল না। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে নিজের ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার চোখে জলও আসিল না। সতীশবাবুর স্ত্রীর শত গঞ্জনা সে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু মনু! যে মনু তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না বলিয়া বিবাহ করিতেও অসম্মত ছিল, সে কেমন করিয়া এমন হইল! অতীতের স্মৃতিগুলি একে একে করুণার মনে পড়িতে লাগিল। মনুই তাহাকে চুল কাটিতে দিবে না বলিয়াছিল! মনু ভালবাসিত বলিয়াই না চুলের প্রতি তাহার মায়া! সেই মনু অমন করিয়া বলিল! করুণা বুঝিতে পারিল না, মানুষের এতখানি পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া হয়। বাক্স হইতে কাঁচিখানি বাহির করিয়া সে তাহার আগুল্ফলম্বিত তরঙ্গায়িত কেশরাশি কাটিয়া ফেলিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "মনু, মনু!" বলিতে বলিতে দুই বিন্দু অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, স্বামীর উদ্দেশে ভক্তি-অবনত-চিত্তে মাথাটি নত করিল।

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি করুণাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি করুণা, তুমি চুল কাট্‌লে কেন?" করুণা মৃদু হাসিয়া বলিল, "অনেক দিন থেকেই কাট্‌ব কাট্‌ব ভাবছি মামীমা! যে গরম পড়েছে, আর সহ্য হয় না। কি বা হবে চুল দিয়ে!" মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি আর কিছু বলিলেন না।

সে-দিন রাত্রে যখন করুণা মনুকে খাইতে ডাকিতে গেল, তখন তাহার মুখে বিষাদের শেষ রেখাটি পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে। সে মনুর আশ্চর্য্যভাব কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া অত্যন্ত সহজ শান্ত স্বরে ডাকিল, "মনু, খাবে এস।"

এতদিন পরে ঠাকুর করুণার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তাহার স্নেহোচ্ছ্বাসপূর্ণ ব্যথিত হৃদয়খানি দেবতার করুণায় আজ শান্তিলাভ করিয়াছে!

শ্রীরথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়!

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১২)

নমিতা বিস্ময়ে স্তব্ধ থাকিলেও কৌতুহলী সুশীলের আগ্রহ অসংবরণীয়। সুতরাং, তাহার রসনা দ্রুততালে সশব্দে সঞ্চালিত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। "পত্র কে লিখিয়াছেন? কেন লিখিয়াছেন? কি প্রয়োজন?" সুশীলের ইত্যাকার প্রশ্নের উপর্য্যুপরি বর্ষণে বিব্রত হইয়া, নমিতা ক্ষিপ্র-হস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া পড়িল। মাত্র চারি ছত্রে সমাপ্ত ক্ষুদ্র অনুরোধ-লিপি:—

"মাননীয়াসু,

বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া আপনার

কাছে উপদ্রব করিতে অগ্রসর হইয়াছি। সহৃদয়তা-গুণে ক্ষমা করিবেন। আপনার সুবিধা-মত যে-কোনও সময়ে একবার এ বাটীতে আসিয়া পায়ের ধূলা দিলে, বড়ই উপকৃতা হইব। ইতি—

নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়া—
শ্রীসরমা মিত্র।"

চমৎকৃতা নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া গেল!—সরমা মিত্র!—নিশ্চয়ই ইনি ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রী!

ব্যগ্র ঔৎসুক্যে অধীর সুশীল, নমিতার এ-পাশ হইতে ও-পাশ হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া, পত্রখানার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া, অবশেষে ডাকিল, "দিদি!"

পত্রের প্রতি স্থির-নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া চিন্তামগ্না নমিতা অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল! পরক্ষণেই হাতের চিঠিখানা টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া, অস্বাভাবিক অপ্রসন্নতার সহিত রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঢের বেলা হয়েছে; আর বাজে এক মিনিটও সময় নষ্ট করা নয়। শীগ্গী তেল নিয়ে আয়, মাখিয়ে দেব।" সুশীলের মুখ ম্লান হইয়া গেল। গতিক ভাল নয় বুঝিয়া, বিনা বাক্যে সে দিদির আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। দিদির প্রতীক্ষায় এখনও সে স্নান করে নাই।

চঞ্চল চরণে কক্ষমধ্যে এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিতে ঘুরিতে উন্মনা নমিতা চিন্তাকুল বদনে, ঘর্ম্মাক্ত পরিচ্ছদ খুলিতে লাগিল। তাহার পর টেবিলের কাছে সরিয়া আসিয়া, পরিত্যক্ত পত্রখানার প্রতি অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

পত্রখানা, ক্ষুদ্র পত্র। কিন্তু নমিতার মনের উপর এটা যে আশ্চর্য্য প্রহেলিকার তীব্র ঝাপ্টা হানিয়াছে! উপর-ওয়ালার স্ত্রীর আহ্বান! "বিশেষ প্রয়োজন"- ইহার অর্থ কি? নমিতার পক্ষে ইহা যে বড় বিষম অদ্ভুত ঠেকিতেছে! এ ভাষা যতই মর্জ্জিত ও কোমল হউক্, কিন্তু কে জানে, ইহার অভ্যন্তরে কোন্ জটিলতা অবস্থান করিতেছে! এ 'প্রয়োজনের' উদ্দেশ্য কি? ইহা অনুগ্রহের লাঞ্ছনা, না, দম্ভের পরিহাস?

নমিতার মস্তকের রক্তস্রোত ঝিম্ ঝিম্-শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল;—একসঙ্গে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা-স্মৃতি চিত্তপটে উদিত হইল; ডাক্তার মিত্রের আচার-ব্যবহারের সুতিক্ত প্রত্যক্ষ বিবরণের চৌহদ্দীগুলা, স্মৃতির দ্বারে উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল!—চিত্ত সবেগে বক্র হইয়া উঠিল; অস্থির-ভাবে নমিতা কক্ষের বাহিরে চলিয়া আসিল।

অন্য দিনের অপেক্ষা বেশী শীঘ্র ও সংক্ষেপে পীড়িত বালকের তত্ত্ব সুধাইয়া, স্নানাহার শেষ করিয়া নমিতা শয়ন কক্ষে আসিল। পত্রখানা তখনও করুণ অনুনয়ের অক্ষরমালা বুকে করিয়া নিস্পন্দভাবে টেবিলের উপর পড়িয়াছিল; নমিতা বিরক্তভাবে তৎ-প্রতি চাহিয়া মুখ ফিরাইল। খোলা জানালার রৌদ্রের সন্নিধানে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া সে সেই চিকিৎসা-পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। আর্দ্র কেশরাশি আধ-ঘণ্টার মধ্যে রৌদ্রে শুখাইয়া লইতে হইবে; তাহার পর ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া, রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া 'ডিউটী' খাটার দায়ে নিশ্চিন্ত হইবে।

নমিতা বই পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু পাঠ্য-বিষয়ে তাহার চিত্ত আদৌ নিবদ্ধ হইল

না।. মনের কোণটায় কি যেন একটা অস্পষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্যের বেদনা ক্রমাগতই খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। পৃথিবীর সকলের সহিতই চিরদিন সে সরল বিশ্বাসে সখ্য-সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া চলিয়াছে। এখন দিনে দিনে তাহার সুস্থ সরলতার সুদৃঢ় বুকে, উদ্দাম বেদনার ক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে, দুঃখের ভঙ্গ ধরিয়াছে,—এখন পরিচিত অপরিচিত, সকলের পানেই হঠাৎ বিশ্বাসের দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতে তাহার শঙ্কা হয়, সন্দেহ হয়;—মনের মধ্যে রুদ্ধ ব্যাকুলতা অজ্ঞাত উদ্বেগে হাঁপাইয়া উঠে! ...এ বড় অস্বস্তিকর ক্লেশ!

চুলটা আধ্-শুক্না হইবার পূর্ব্বেই নমিতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, শয্যায় পড়িয়া চক্ষু বুজিল; কিন্তু চক্ষু বোজানই সার হইল মাত্র; ঘুম হইল না। মনের প্রচণ্ড বিক্ষোভ চতুর্গুণ ফেনাইয়া, তাহার বাহ্য-প্রকৃতিকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করিয়া তুলিল। ঘুমের চেষ্টা ব্যর্থ বুঝিয়া, নমিতা গা-ঝাড়া দিল। কক্ষমধ্যে বার-কয়েক পায়চারি করিয়া, অন্যমনস্কভাবে টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ও পত্রখানা তুলিয়া লইয়া উদাস দৃষ্টিতে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

সরমা মিত্র,—অর্থাৎ ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী! তা হউক্; তবু ত তিনি নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়া! আশ্চর্য্য রহস্য! সেই শিশুর মত সরল-স্নেহ-শ্রীমণ্ডিত সুন্দর যুবকের ইনি সম্মানস্থানীয়া সম্পর্কীয়া রমণী!

অজ্ঞাত কৌতূহলে ধীরে ধীরে নমিতার মন আগ্রহোন্মুখ হইয়া উঠিল!......ইনি ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী! কিন্তু শুধু সেই সম্পর্কটিকে 'বড়' করিয়া, ইহাঁর অজ্ঞাত 'প্রয়োজন'টাকে সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে যথেচ্ছভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। কে বলিতে পারে, ইহাঁর মধ্যে স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্ব নাই? কে জানে, ইনি সংসারের নিকট 'কায়ার ছায়া'-রূপে প্রতিপন্ন হইলেও, ভিন্ন-ধাতু-গঠিতা জীবন্ত-প্রাণ-বিশিষ্টা রমণী নহেন? কে জানে, ইনি কি শুধু সদা-বিক্ষিপ্ত-চেতা ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী—কি সরলস্বভাব প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়া ও বটেন!

দূর হউক্, অবস্থা-চক্রের উৎপীড়নে নিজের দুঃখ-দ্বন্দ্বের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, নমিতা মূর্খ দৌর্ব্বল্যে এমন শিষ্ট সংযত প্রীতির আহ্বানকে কঠিন ভ্রূভঙ্গীতে উপেক্ষা করিয়া, শুষ্ক রূঢ়তার আশ্রয়ে আত্ম-মর্য্যাদার নামে আত্ম শ্লাঘার আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া ছলনা করিবে না! হউক্ অসম্মান; ইনি যাহা ভাবিয়া যে উদ্দেশ্যেই ডাকিয়া থাকুন, নমিতা কেন কর্ত্তব্য অবহেলা করিবে? বাহ্যিক অস্বাচ্ছন্দ্যের ভয়ে সে কেন অনর্থক অভ্যন্তরটা তীব্র অস্বস্তির বিষ-বাষ্পে ভরাট করিয়া তুলিতেছে? এ কি মতিচ্ছন্ন!

অসময়ে সদ্যঃ-স্কুল-প্রত্যাগতা সমিতা আনন্দোৎফুল্ল-বদনে কক্ষে ঢুকিয়া উৎসাহ-মুখর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"দিদি, ভাই, আজ আমাদের এগ্‌জামিনের খবর বেরুলো; আমি এবার ফার্ষ্ট হয়ে ক্লাশে উঠেছি!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 646. June, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৬ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। জুন, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

মিলনে।

সে-দিন প্রভাত-বেলা
তেয়াগি' শয়ন,
তোরণ-দুয়ার খুলি',
দেখিনু নয়ন মেলি',
সে শান্ত মূরতি তব,
প্রিয়-দরশন!

মোহন-তুলিকা তব
নয়নে আমার
সাদরে বুলায়ে দিলে,
সব দুঃখ লু'টে নিলে!—
দেখিনু হৃদয় মাঝে
স্বরূপ তোমার!

তোমারে পূজিতে নাথ,
কত আকিঞ্চন!
নিমেষে সকল ভুলি',
লইনু হৃদয়ে তুলি',
করিনু আদর কত
ওগো প্রাণধন!

সে-দিন সে মধুপ্রাতে
আঁচল ভরিয়া
কুড়া'য়ে বকুল জাতি,
সাধের মালাটী গাঁথি'
আনিনু পরাতে গলে
যতন করিয়া!

হাসিয়ে অমনি গলে
চুমিলে আমারে;
আমারে আপন জানি
বুকে নাথ, নিলে টানি',
চির-বাঞ্ছিতের মত
কি সোহাগ ভরে!

বিফল হৃদয় মাঝে
হে জীবন-স্বামী!
আশার আলোক-রেখা
ধীরে ধীরে দিল দেখা;
আঁধার কোথায় গেল
নীরবেতে নামি'!

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(২৬)

সুপ্রকাশ শীলার কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, শীলার মুখের ভাব অন্যপ্রকার হইয়াছে। সে শয্যায় শুইয়া এ-ধার ও-ধার করিতেছে। সুপ্রকাশ নিকটে গিয়া শীলার সেই শুভ্র ললাটে কর স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, ললাট অপেক্ষাকৃত অনেক শীতল। তিনি তাহার করস্পর্শ করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন, "শীলা! শীলা আমার!" শীলা সেই করস্পর্শে চমকিত হইয়া চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি কখন এলে? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।" সুপ্রকাশ তাহাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "এখন কেমন আছ, শীলা?"

শীলা। কেন, আমার কি হয়েছে? মাথা-টার মধ্যে বড় বেদনা। আমি কি অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছি?—রাত্রে বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম।

সুপ্রকাশ সে কথায় উত্তর না দিয়া 'নর্শ'কে ডাকিলেন ও শীলাকে একটু দুগ্ধ দিতে বলিলেন। শীলা বিস্মিতভাবে নর্শের দিকে চাহিয়া বলিল, "এঁ কে? এ আমায় কেন দুধ দিচ্ছে?"

সুপ্রকাশ। আজ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, তোমায় ফিরিয়ে পেয়িছি। তোমার ভয়ানক অসুখ করেছিল! এখনো তোমায় অতিসাবধানে থাকতে হবে। বেশী কথা বোলো না; ডাক্তার-সাহেব নিষেধ কোরেছেন।

শীলা বিস্মিতভাবে সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া রহিল! সুপ্রকাশ দুই-একটী কথার পর উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

* * *

এদিকে শৈলেন সুব্রতকে লইয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সুব্রত বলিলেন, "এখন কোথায় যাচ্ছেন্?"

শৈলেন। আসুন, আপ্নাকে একটা জিনিস দেখাব।

তাঁহারা দ্রুত-পদে পথ-সকল অতিক্রম করিয়া সহরের ভিতরে একটি ক্ষুদ্র বাটীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শৈলেন সুব্রতকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিতে, সুব্রতও তাঁহার সহিত প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—একটি সুন্দর মৃত্তিকালিপ্ত অঙ্গন; তাহার মধ্যস্থলে একখানি দড়ির খাটিয়াতে একজন বৃদ্ধা শয়ন করিয়া আছেন; তিনি চলচ্ছক্তি-রহিত। শৈলেন সেই স্থানে ডাকিলেন,—"মিসেস্ দাস!" দুই-চারিবার আহ্বানের পরেই ভ্রমরকৃষ্ণবিনিন্দিত-কান্তি আরব্ধবার্দ্ধক্যা একটী নারী বাহিরে আসিলেন; তাঁহার ললাটদেশে একটি গভীর কাটার চিহ্ন; বেশভূষা এতদ্দেশীয় খৃষ্টান স্ত্রীলোকদের ন্যায়। তিনি আসিয়াই শৈলেন রায়কে সম্ভ্রমের সহিত নমস্কার করিলেন। শৈলেন হাসিয়া সুব্রতর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মিঃ বসু! মিসেস্ লীবাবতী দাস।" সুব্রত দুই-এক পদ পিছাইয়া গেলেন।

মিসেস্ দাস বলিলেন, "আমায় কি বল্ছেন ?"

শৈলেন। মিঃ রায় সম্প্রতি বিবাহ করেছেন, তা আপ্নি বোধ হয়, জানেন। ইনি সম্প্রতি এসে সেই মকদ্দমার কথা-সব মিঃ রায়ের স্ত্রীকে বলেছেন। তিনি এ সকল কিছুই জান্তেন না; হঠাৎ এই কথা শুনেই অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা এঁকে সকল কথা বলিছি, আর আপ্নার কাছে এনেছি। এঁরা কাগজের কথাই বিশ্বাস কোরেছেন।

মিসেস্ দাসের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "মিঃ রায় আমাদের জীবন-দাতা। তাঁর দয়াতেই আমরা আজ জীবন ধারণ কোরে আছি। আমার এই বৃদ্ধা মাতার ও দুটি সন্তানের ভরণ-পোষণের ভার আমার উপর। আমার চাক্রী যাবার পর থেকেই মিঃ রায় আমায় ২০টি টাকা মাসহারা দেন; তাতেই আমার কোন প্রকারে চল্ছে। যা সামান্য একটু কাজ কোর্ত্তে পার্তাম, আমার মায়ের এই অবস্থার জন্যে, তাও কিছুই কর্তে পার্ছি না।

শৈলেন। মিসেস্ দাস, আপনার ললাটের ঐ চিহ্নের বিষয় মিঃ বসুকে একটু বলুন।

মিসেস্ দাস। এটি আমার সুকৃতির ফল। সে-দিন যদি আপ্নি আমার স্বামীর হাত থেকে আমায় রক্ষা না কর্তেন, তা হ'লে আমার ইহলীলা সাঙ্গ হ'ত। আমার মোলেই ভাল ছিল। তবে, দুটি শিশু! তাদের জন্যেই ভগবান্, বুঝি, আমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন, এখন দেখ্ছি। যখন সকল কথা স্মরণ হয়, সদাশয় মিঃ রায়ের উপর কলঙ্কের কথা যখন মনে করি, তখন জীবনে ঘৃণা আসে। আমি তাঁর জ্যেষ্ঠা সহোদরার বয়সী, তাঁর মায়ের সমান। আর কি বল্ব? আপ্নি ত সবই জানেন।"

সুব্রত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে সুপ্রকাশ রায়ের প্রতি তাহার যে ঘোরতর বিদ্বেষ ছিল, ক্রমে তাহা যেন চলিয়া যাইতে-ছিল! বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা-ভালবাসা যেন মিঃ রায়ের প্রতি ধাবিত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলেন সুব্রতকে লইয়া চলিয়া আসিলেন। পথে আসিতে আসিতে সুব্রত বলিলেন, "আপ্নি আপ্নার স্ত্রীকে সব কথা বলেন না কেন?"

শৈলেন। আমার স্ত্রীর স্বভাব অন্য-রকম। বিলেতে যখন ছিলাম, তখন আমার নামে উপহাস কোরে আমার এক বন্ধু কি লিখেছিল; তা শুনেই ত তিনি শয্যাগত হয়ে যান-যান হয়েছিলেন, আর আমাকে বিবাহ কোর্ব্বেন্ না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বিবাহের পরেও দেখ্ছি, বড়ই সন্দিগ্ধ-মন; একটু উত্তেজিত হ'লেই সর্ব্বনাশ হবে। আমার দিদি-শাশুড়ী সব জানেন; তিনি বারবার কোরে আমায় তা'র কাছে কোন কথা বল্তে মানা কোরেছেন। ছেলেটির মৃত্যুর পর থেকে তার 'হার্ট' অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়েছে; ডাক্তারেরা বোলেছেন, একটু উত্তেজনায় সাংঘাতিক ফল হ'তে পারে।

শৈলেন রায়ের কথায় ও মিসেস্ দাসকে দেখিয়া সুব্রতর মনের ভাব অন্যপ্রকার হইয়া গেল। সুপ্রকাশের চরিত্র তাঁহার চক্ষে আদর্শ-চরিত্র মনে হইল। পরের জন্যে এত ত্যাগ-স্বীকার করে! নিজের নিষ্কলঙ্ক

চরিত্রে কে কলঙ্ক অর্পণ করে! তিনি স্থির করিলেন, সুপ্রকাশ রায়ের নিকট গিয়া বিশেষ-ভাবে ক্ষমা চাহিবেন।

যখন সুব্রত ও শৈলেন হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সুপ্রকাশ বসিবার কক্ষেই ছিলেন। সুব্রত গিয়াই তাঁহার নিকট, দুঃখিত অন্তরে, অশ্রুগদ্‌গদ-কণ্ঠে, বিনীত বচনে বলি-লেন, "আপ্‌নি আমায় ক্ষমা করুন। আপ্‌-নার উপর আমি বিশেষ অবিচার কোরেছি।"

সুপ্রকাশ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "না, আপ্‌নি কোনও অবিচার করেন নি। আপনারই ত সঙ্গে শীলার বিবাহ হ'বার কথা হচ্ছিল; আমি মাঝ্‌ থেকে এসে আপ্‌নার মনঃকষ্টের কারণ হয়েছি। আমার সঙ্গে শীলার বিয়ে হ'লে, আমি যে আপ্‌নার মনঃকষ্টের কারণ হ'ব, তা আমি জান্‌তুম; সেইজন্যে আমি শীলার কাছ থেকে দূরে-দূরেই থাক্‌তুম। শীলা যদি আমায় ভাল না বাস্‌ত, তা হ'লে আমি কখনও কোনও দিন আপ্‌নার পথের সম্মুখে আস্‌তুম না।"

সুব্রত। সে যাই হোক্‌, আমি যদি এই সব সংবাদ না জানাতাম, তা হ'লে মিসেস্‌ রায় এ-রকম সাংঘাতিক-ভাবে পীড়িত হ'তেন না। আমি এজন্যে বড়ই অনুতপ্ত।

সুপ্রকাশ। বড়ই সৌভাগ্য যে, শীলার জ্ঞান হ'য়েছে। সে এ-সব কথা ভুলে গিয়েছে। তবে, ক্রমেই সব তার মনে পড়্‌বে। আমার একান্ত অনুরোধ, সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত, আপ্‌নি এখানে থাকুন্‌। তা হ'লে শীলা আপ্‌নার কাছ থেকেই সব শুন্‌বে।

সুব্রত। আপ্‌নি আমাকে যা বোল্‌বেন, আমি তাই কোর্ব্বো।

সুপ্রকাশ। আমার বড় সৌভাগ্য, এই পরীক্ষার মধ্যেও জগদীশ্বরের কৃপায় আপ্‌নাকে সুহৃদ্‌ পেলাম।

সুব্রত করমর্দ্দনার্থ স্বকীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "আমাকে আপনার নিজের ভাই বোলেই জান্‌বেন, এই আমার অনুরোধ!"

সুপ্রকাশ দৃঢ়-মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "তাই হোক্‌। তুমি আমার ছোট-ভাই হ'লে। আশা করি, আমাদের এ-প্রকার মনের ভাব চিরস্থায়ী হ'বে।"

শৈলেন বিদায় লইয়া বিষণ্ণ-মনে বাট্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, "আহা! যদি সুষমা সব বুঝিত, যদি সুষমাকে সব বলা যাইত, তাহা হইলে আজিকার দিন কত সুখের হইত!—আমাদিগের অবস্থা কি সুখময়ী হইত! একত্রে জীবন যাপন করিয়াও, আজ সে আমার হৃদয় অজ্ঞাত বলিয়া, আমাদিগের পরস্পরের অবোধ-জনিত কি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তাহার ও আমার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে! আমি আজ তাহার নিকটে থাকিয়াও কত দূরে! শারীরিক সান্নিধ্য কি করিতে পারে? মনের সহিত মনের সংযোগই, দূরত্বের ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়া, দুইটী হৃদয়কে একস্থানে আকর্ষণ করিয়া নৈকট্য সম্পাদন করে। পরস্পরের জীবন পরস্পরের হৃদয়ে স্বচ্ছ-দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত থাকিলে, সে জীবন-দ্বয়ের মধ্যে সরিৎ-সাগর-ভূধরের ব্যবধান থাকিলেও, তাহারা পরস্পরের অতিনিকটেই বাস করে! মৃত্যুর পরপারেও তাহাদিগের এই প্রীতির সংযোগ কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না!"

সুপ্রকাশ শীলার কক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, শীলা তাঁহারই জন্য পথ চাহিয়া আছে। তিনি যাইবামাত্রই সে তাহার ক্ষীণ দেহযষ্টি ঈষৎ উন্নমিত করিয়া বলিল, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?"

সুপ্রকাশ। এখানেই ছিলাম। ডাক্তার যে বেশী কথা বোল্‌তে তোমায় বারণ কোরেছেন।

শীলা। তুমি আমার কাছেই থাক। দূরে গেলে আমার বড় ভয় করে; কেবলই মনে হয়, আর বুঝি, দেখা হ'বে না!

সুপ্রকাশ। তোমায় ছেড়ে কি আমি স্থির থাক্‌তে পারি ? শীলা! তুমি শিগ্‌গির সেরে ওঠ, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

শীলা। আমি তো বেশ ভাল আছি। আর কোথাও যাব না। এবার কটকেই চল।

সুপ্রকাশ। সেই ভাল। সেখানে বেশ দু'জনে নির্জনে থাক্‌ব। আমি তোমার কাকাকে লিখে দেব।

শীলা। অমির খুব আহ্লাদ হবে। আবার তেমনি কোরে বোটে কোরে বেড়াতে যাবে; কেমন ? সেই নদীর ধার আমার বড় ভাল লাগে। সেই সেখানে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম! তোমায় দেখে পর্য্যন্ত কেবল তোমার মুখই চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তাম; ঘুমোলে তোমায় স্বপ্ন দেখ্‌তাম; তুমি আমায় যাদু করেছিলে!

সুপ্রকাশ শীলার ললাটের কেশরাশি সস্নেহে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আর তুমি! যে-আমি কখনও কারো দিকে ফিরে চাই নি, সেই আমি তোমায় প্রথম দেখেই যে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলাম! কিন্তু সত্যি, তখন মনে করি নি যে, তুমি আমার হবে! সুব্রত—।"

শীলা। (ব্যস্তভাবে) আবার ও-সব নাম কেন? আমার তাঁর নামে ভয়ানক ভয় করে; আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, তিনি এসে জোর কোরে আমায় তোমার কাছ থেকে টেনে নিয়ে, দূরে ফেলে দিচ্ছেন।

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) আহা, বেচারা সুব্রত! সে নিশ্চয়ই তোমাকে খুব ভালবেসেছিল। তা'র নামে ভয় পেও না। কারো সাধ্য নেই, আমাদের ভিন্ন করে। ঈশ্বরের এ বন্ধন কেউ ছিন্ন কর্‌তে পারে না।

শীলা। আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, সুব্রত এখানে এসেছেন। আমার সে কথা মনে হলে, ভয় করে।

সুপ্রকাশ। ও সব কথা ভুলে যাও; না হ'লে, আমি চলে যাই। ডাক্তার তোমাকে বেশী কথা বল্‌তে মানা করেছেন। তোমার 'ব্রেন-ফিবার' হয়েছিল। শান্ত হ'য়ে থাক। আর একটু ভাল হও, তখন স্বপ্নের কথা বোলো। আমি তো স্বপ্ন নই; আমি কাছে আছি। দেখ, আমি স্বপ্ন কি-না?

এই বলিয়া সুপ্রকাশ শীলার হস্ত স্পর্শ করিলেন।

শীলা। আচ্ছা, আমি কথা কইব না; কিন্তু তুমি আমার কাছে থাক। না, তুমি একটা গান কর। ওই পাশের ঘরে বাজ্‌না আছে। এই দরজা খুলে দাও, আর গান কর; আমি শুন্‌ব। অনেক দিন তোমার গান শুনি নি। গান শুন্‌তে শুন্‌তে আমিও তা হ'লে ঘুমিয়ে পড়্‌ব।

সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে গমন

করিলেন ও পিয়ানোতে হাত দিলেন! তাহার পর ধীরে ধীরে গাহিলেন—

"যখন তুমি ছিলে দূরে,
দাও নি মোরে দেখা ;
সে সব দিনের কথা-ব্যথা
সব সয়েছি একা।
পলে পলে দিনে দিনে,
গেঁথে তুলে স্মৃতির সনে,
মনের দুঃখে চোকের জলে
হার করেছি তার ;
প্রতিদিনের কথা যেন
হার সে মুকুতার!
কবে কোথায় হেসেছিলে,
যেতে যেতে চেয়েছিলে,
কবে কখন তোমার চোকে
ছিল প্রণয়-লেখা ;
তাই সে সকল কুড়িয়ে নিয়ে
ভাবছি বসে একা!
কভু হৃদয় আশায় হাসে,
কভু নয়ন জলে ভাসে,
সেই ব্যথার দুঃখের মাঝে
কেবল বার-বার
চোকের জলে গেঁথেছি এ
মুকুতার হার!"

সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে এই গানটী গাহিলেন। শীলার হৃদয় যেন অপূর্ব্ব আনন্দরসে ভরিয়া উঠিল! তাহার রোগশ্রান্ত নয়ন-দুইটি আপনিই মুদ্রিত হইয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

গান শেষ করিয়া যখন সুপ্রকাশ শীলার শয্যাপ্রান্তে আসিলেন, দেখিলেন, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সেই রোগশীর্ণ মুখ দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, শীলা ত তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেই বসিয়াছিল। জগদীশ্বরের অসীম করুণায় তিনি যে আবার তাহাকে পাইয়াছেন, এই কথা মনে করিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল ও দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

হতাশের গান।

তোমারি তরেতে জ্বলিছে দেহ,
তোমারি তরেতে পুড়িছে প্রাণ ;
তোমারি জ্বালায় আঁখি বরষায়,
বাহির হয়েও হয় না, 'জ্ঞান'।
যদিও এ দেহ অক্ষম দুর্ব্বল,—
তোমারি তরেতে খাটিছে ;
যদিও এ হস্ত রোগেতে মলিন,—
তোমারি গহনা আনিছে!
যদিও মাহিনা এত কম, তা'তে
কিছুই তোমার হয় না ;—
তবুও প্রেয়সি, দিই তা আনিয়া,
কানাকড়িখানি নিজে না রাখিয়া!
যদি হাসি ফুটে, ও অধর-পুটে
এই আশে করি সকলি দান,
(তবু, এমনি কপাল, অভাগার হায়,
ভেঙেও ভাঙে না ও পোড়া মান!)

শ্রীলতিকা দেবী।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যার অব্যবহিত-পূর্ব্বে ৺বিশ্বেশ্বর দর্শন-মানসে একটী এক্কা ভাড়া করিয়া রওনা হইলাম। এ অদ্ভুত যান বঙ্গদেশে অতিশয় বিরল। পূর্ব্বে ইহার নাম শুনিয়াছিলাম মাত্র; আজ আরোহণে কৃতার্থ হইলাম। শীর্ণাবয়ব অশ্ববর, ধূলি-ধূসরিত জীর্ণ-বস্ত্র-পরিহিত চালক, মলিন-কন্থা-সমাচ্ছাদিত উপবেশনের স্থান, ইত্যাদি দেখিয়া প্রথমে মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। অনন্যোপায় হইয়া নিতান্ত বিরক্তির সহিত সেই শকট আরোহণ করিবা-মাত্র অশ্ববর শ্লথ-গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। তীর্থক্ষেত্রে নিরন্তর বাস করিয়া তাহার যেন অন্তরাবেশ-হেতু বাহ্য বিষয়ে একটা বৈরাগ্য জন্মিয়াছে! চালকের সঘন কশাঘাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। জিতেন্দ্রিয় অশ্ববর ক্রোধ-রিপুকে যেন সম্পূর্ণ দমন করিয়াছে। মনে হইল, যোগসিদ্ধ হইয়া বসিবার তাহার আর বেশী দেরী নাই; তাহার পরই তাহার সশরীরে স্বর্গলাভ!

হায়, অশ্ববর! তুমি জন্মান্তরে কি ছিলে, জানি না। তুমিও নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত! তুমি অবিরাম একভাবে চলিতেছ! তোমার অদ্ভুত গতিতে যে আরোহিগণের অসহনীয় কায়িক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তোমার কর্ম্ম-ফলে যে কত ভক্ত প্রাণ সুদূর সমাগত যাত্রিকুল তীর্থভ্রমণান্তে দীর্ঘকাল পরেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তীব্র বেদনা অনুভব করে, তাহা কি একবার ভবিতেও তোমার মন সরে না! তুমি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছ, তাই জীবের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদে না। এই বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তুমি কঠোর-কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত, ফলাফলের দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও কর না! ধন্য তোমার সাধনা!

একবার ভাবিলাম, কঠোর সাধনা ব্যতি-রেকে দেবদর্শন ভাগ্যে ঘটে না, তাই যাত্রীদের জন্য এ অত্যদ্ভুত যানের বিদ্যমানতা! বসিবার স্থানের উপরে বা পার্শ্বে কোনওরূপ আচ্ছাদন নাই; রৌদ্র, বৃষ্টি, ধূলা, ইত্যাদি যাবতীয় উপদ্রব সহ্য করিতে পারিলে, তবে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারা যায়। অশ্ববরের গতির সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর শিথিল অবয়বের পরস্পর-সংঘর্ষে এক কর্কশ নির্ঘোষ উত্থিত হইতেছে। নিরিবিলি বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। পার্শ্বস্থিত বংশখণ্ড সজোরে ধরিয়া না রাখিলে, প্রতিমুহূর্ত্তেই পতন-ভীতি! তাহার পর সেই ঝন্‌ঝনায়মান শকটের ইতস্ততঃ চালনে শরীরের সমস্ত অবয়ব থাকিয়া থাকিয়া আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে! নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া পতন-নিবারণ-জন্য ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিলাম। এবম্প্রকার নানাবিধ তীব্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া কোনমতে দশাশ্বমেধ-ঘাটের সমীপে এক্কা হইতে অবতরণ করিলাম।

তাহার পর সঙ্কীর্ণ গলিমুখে জনতা দেখিয়া সেইদিকেই অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম,

পবিত্র-মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে জনস্রোত মন্দির-পথে অগ্রসর হইতেছে। আমিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পথি-পার্শ্বে পুষ্প-বিল্বপত্রের দোকান সাজাইয়া কেহ কেহ বসিয়া রহিয়াছে। কত অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ পথে গড়াগড়ি যাইতেছে; যাহাদের দয়া আছে, যাহাদের মর্ম্মে সকরুণ আর্ত্তনাদ আঘাত করিতেছে, তাহারা যৎকিঞ্চিৎ বিতরণ করিতেছে। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে, মানুষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না;—চতুর্দ্দিকেই মানুষ! কি সুন্দর মিলন! ধনি-নির্ধন, সুন্দর-কুৎসিৎ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সুখী, দুঃখী, যুবক-বৃদ্ধ, সবল-দুর্ব্বল, সকলেই বিশ্বেশ্বর-দর্শন-মানসে একভাবে অনুপ্রাণিত! ক্ষণেকের তরে হিংসা, দ্বেষ, মান, অভিমান, আত্মপরতা ভুলিয়া সকলেই একলক্ষ্যের দিকে ধাবিত! সকলেরই সমান উৎসাহ, সকলেরই সমান অধিকার! এ-ক্ষেত্রে রাজা-প্রজা, ইতর-ভদ্র পৃথক্ করিবার সুযোগ নাই, এ-স্থানে বেশভূষার পারিপাট্য নাই!—সকলের প্রাণেই এক ভাব, সকলের মুখেই এক তান!

যাইতে যাইতে বিপুল জনস্রোত মন্দির-দ্বারে উপনীত হইল। অবাধ-গতি প্রতিহত হওয়ায় একটা কোলাহল উত্থিত হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে মন্দির-প্রাঙ্গণে সকলে সমবেত হইল। তখন সন্ধ্যার ঘনান্ধকার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ক্ষীণালোকে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ-কোণে স্তূপীকৃত বিল্বপত্র এবং পারিম্লান পুষ্পরাশি ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। দেখিতে দেখিতে জনস্রোত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল; প্রস্তর-নির্ম্মিত পবিত্র-মন্দির-দ্বারে তিল-ধারণের আর স্থান

বিশ্বেশ্বরের মন্দির।

নাই। সমবেত দর্শকমণ্ডলী সকলেই স্তব্ধ! বহু-চেষ্টায় মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া দেখিলাম, কতশত ভক্ত পুষ্পমাল্য- ও গঙ্গোদক-হস্তে দেবাদিদেবকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন! কেহ দেবের শিরোদেশে করস্পর্শ করিয়া ধন্য হইতেছেন, কেহ গঙ্গোদক ঢালিতেছেন, কেহ-বা দেবকে মাল্য-বিভূষিত করিতেছেন, আর কেহবা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন! যুক্তকরে বহুসংখ্যক নরনারী চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান! তন্মধ্যে কেহ-বা উৎকণ্ঠায় আকুল, কেহ-বা আশায় উৎফুল্ল,—সকলের মুখেই উদ্দীপনা!

অকস্মাৎ এই দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; উজ্জ্বল দীপালোকে চতুর্দ্দিক্ ঝলসিয়া উঠিল! দেখিলাম, মন্দিরাভ্যন্তর জনশূন্য! অদূরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল! বিশ্বনাথের সেবকবৃন্দ

সদ্যঃস্নাত হইয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। কেহ তারস্বরে সুমধুর বেদগান করিতে লাগিলেন, কেহ দেবের নগ্ন দেহে চন্দনানুলেপনে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিয়া দিলেন। মন্ত্র-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া ঘণ্টা-ধ্বনি হইতেছিল। ধূপধূমে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত! ক্ষণকাল-মধ্যেই দেবাদিদেব নববেশে সজ্জিত হইয়া এক অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করিলেন। কি নয়নাভিরাম সে দৃশ্য! কি সুমধুর সেই বেদগান! তৎকালীন নহবতের মধুর ঝঙ্কার আজিও আমার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে ধ্বনিত হইতেছে! সেই দৃশ্য অবর্ণনীয়! ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত হইতে সমাগত ভক্ত-প্রাণ অসংখ্য নরনারী ভক্তি-গদ্গদ-চিত্তে সুদূর বারাণসী-ধামের এক পবিত্র ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে সমবেত! সকলের লক্ষ্য বিশ্বনাথের দিকে স্থির-নিবদ্ধ! পবিত্র স্থানের পুণ্য-প্রভাব সকলকে আরতিকালে প্রীতিপ্রফুল্ল করিয়া তুলিল; কাহারও মুখে বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হইল না! এই পবিত্র ধামে ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়া যায়, অলক্ষিত ভাবে প্রাণে কেমন একটা বিমল আনন্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠে! প্রাণ ভরিয়া এ দৃশ্য সন্দর্শন করিলাম,—জীবন ধন্য হইল!

আরতি-সমাপনান্তে জনতা ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্ববৎ জনস্রোত মা অন্নপূর্ণার মন্দিরের অভিমুখী হইতেছে! অদূরেই মায়ের সেই পবিত্র মন্দির! তাহার কোলাহলও শ্রুত হইতেছিল। অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, প্রবেশ-দ্বারে ভীতিব্যঞ্জক ব্যস্ততা। বহু আয়াসে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। সুদৃঢ়-প্রস্তরপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণের মধ্য-স্থলে মায়ের পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। যুগ-যুগান্তর-প্রবাহিত ভক্তির উৎসে সর্ব্বত্র যেন পুণ্যপ্রভাব চির-বিরাজমান! প্রাঙ্গণ-কোণে কোথাও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বেদ-পাঠে অভিনিবিষ্ট, কোথাও কোনও যোগিবর নিমীলিত-নেত্রে সমাসীন, কোথাও বা কোনও ভক্ত দূর হইতে মায়ের উদ্দেশ্যে ভক্তিগদ্গদ-চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন! মন্দিরের পুরোভাগে নাট-মন্দির দীপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! অসংখ্য নর-নারী তথায় সমবেত হইতেছে, আবার মুহূর্ত্ত-মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে! এই গতিবিধির বিরাম নাই!

নাট-মন্দিরের একটী কোণে কয়েকটী মৃগ নিঃসঙ্কোচে বিশ্রাম করিতেছিল। তাহাদের সেই অরণ্য-সুলভ চাপল্য নাই। স্থান-মাহাত্ম্যে শান্ত থাকিয়া তাহারা অপরিচিত যাত্রিগণ সহ পরিচয়-প্রসঙ্গ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল।

মন্দির-মধ্যে মা অন্নপূর্ণা অলঙ্কার-ভূষিতা হইয়া হাস্যমুখে বিরাজ করিতেছেন! ভক্তজন-প্রদত্ত স্তূপীকৃত পুষ্পরাশি মায়ের পবিত্র চরণ-যুগল আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মায়ের গলদেশে চন্দনলিপ্ত শোভন পুষ্পমালা।

নাটমন্দিরের এক নিভৃত প্রদেশে উপবেশন করিয়া মৃদুহাস্যময়ী মায়ের এই সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। মায়ের সেই অনধিগম্য গাম্ভীর্য্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে! তাঁহার বদন-সরোজ হইতে করুণার- ধারা প্রবাহিত হইতেছে! যেন আজ সন্তানগণকে দেখিয়া দেখিয়া মাতার প্রাণে স্নেহের সঞ্চার

হইয়াছে। কতশত নরনারী প্রাণ ভরিয়া মাকে দেখিতেছেন, তবু তৃপ্ত হইতেছেন না! বুঝি, মায়ের এতাদৃশ সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শন আর ভাগ্যে ঘটিবে না! দেখিলাম, অগণিত নরনারী মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর কতশত লোক তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছেন! মায়ের অনিন্দ্য-সুন্দর রূপরাশিতে স্নিগ্ধ মধুর লাবণ্য ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

একদিন আলুলায়িতকুন্তলা মায়ের সেই দানব-দলনী রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল ;—ভাবিয়াছিলাম, এমন মায়ের প্রাণে বুঝি, কোমলতা স্থান পাইবে না। কিন্তু আজ কি অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি দেখিলাম! সন্তানপালিনী মা মলিন সন্তানগণকে স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান দিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন!—কি অপূর্ব্ব মধুময় সে দৃশ্য! মনে হইল, মাতৃস্নেহ কি এক অপার্থিব পদার্থ!

জন্মাবধি যাঁহার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম, সেই স্নেহময়ী জননী আজ অনেক দিন ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তে সেই স্নেহের অপূর্ব্ব প্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়ি—প্রাণে একটা দারুণ অভাব অনুভূত হয়! হায়, পুণ্যময়ি জননি! তোমার এই নিঃস্বার্থ স্নেহের দৃষ্টান্ত আর যে খুঁজিয়া পাই না। এ সংসারে তুমি ভিন্ন অপর কেহ যে তোমার স্থান অধিকার করিতে পারে না! তোমার অগাধ স্নেহ, অনুপম ত্যাগ-স্বীকার, সবই যে আজ কল্পনাতীত প্রতীত হইতেছে! তোমার পুণ্যময়-স্মৃতিতে আজ যে অশ্রুধারা সংবরণ করিতে পারিতেছি না! তোমার অভাবে আজ যে তোমার গুণরাশির বিশালত্ব উপলব্ধি করিতেছি! মা! কে জানিত, তুমি অকালে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবে! মনে আছে, তোমার অন্তিমকালে সেই জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা নিশীথে আমাদের ক্ষুদ্র অন্তঃপুরে যে এক গভীর হাহাকার উঠিয়াছিল, তাহা আজও নির্ব্বাপিত হয় নাই! কি হৃদয়-বিদারক সে দৃশ্য! তখন মাতৃহীন ভ্রাতাভগ্নীগণ সমবেত হইয়া অনেক কাঁদিয়াছিল,—কিন্তু আমার চিন্তাশক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল ; চেষ্টা করিয়াও একবিন্দু অশ্রুপাত করিতে পারি নাই। কেমন একটা অজ্ঞাত কঠোরতা আসিয়া হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা হরণ করিয়া লইয়াছিল। তদবধি কাঁদিতে শিখি নাই, লোকের দুঃখে প্রাণ দ্রব হয় নাই। সে কেমন একটা ভাব কেমন করিয়া বুঝাইব। এইরূপ নানা চিন্তা চিত্তকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

তারপর আজ এই মহাদৃশ্য দেখিলাম! এই মা বিশ্বজননীকে ইতর-নির্ব্বিশেষে সকলেই মাতৃ-সম্বোধনে পরিতৃপ্ত হইতেছে! মায়ের সর্ব্বজনীন স্নেহ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে! এই মাতৃস্নেহের গভীরতা ও বিস্তৃতি অপরিসীম! অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলাম! তাহার পর যখন জনতা খুব কমিয়া গেল, তখন শূন্য-মনে ধরমশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সোনার দেশ।

(গান)

সে যে আমার সোনার দেশ,
সে যে চির-পুরাতন নিত্য নূতন—
(তাহে) নাহিক দৈন্য লেশ!
সে যে মরতের মাঝে নন্দনভূমি
আমার সোনার দেশ !
সে যে আমার সোনার দেশ !
প্রকৃতি-ভূষণে ভূষিত সে যে
অতিমনোহর বেশ ;
সে যে পরাণ-জুড়ান হৃদয়-মাতান
আমার সোনার দেশ !

কত বীর-প্রসবিনী ভারত-জননী
নাহিক তাহার শেষ ;
ধন্য করিয়া গিয়াছেন যাঁ'রা
আমার সোনার দেশ ।
সে যে আমার সোনার দেশ,
সেথা সবাই আপন ভায়ের মতন,
সেথা নাহি কোন বিদ্বেষ ;
সে যে গৌরবময়ী তীর্থের ভূমি,
আমার আমারি দেশ !

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায় ।

পূজার কথা।

সতী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সতীকে বিদায় দিয়া মহাদেব কত চিন্তাই করিতেছিলেন ! চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অবশেষে তিনি যোগাসন অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থির করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু তবুও দারুণ আশঙ্কায় ও উদ্বেগে চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিলোড়িত হইয়া উঠিতেছিল ! এমন সময় নন্দী ও ভূত প্রেতেরা হাহাকার করিয়া আসিয়া, সকল অবস্থা নিবেদন করিল । তাহা শুনিয়া শিব চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।

প্রলয়-মেঘের স্বরে শিব কহিলেন, "নন্দী, কি কহিলি?—সতী নাই ?" নন্দী সহসা উত্তর করিতে পারিল না । শতসহস্র শিবানুচরের দীর্ঘনিঃশ্বাসে ব্যক্ত হইল, সতী নাই !

তখন কষ্টে নন্দীও উত্তর করিলেন— "সতী নাই ।" চারিদিকেই অসংখ্য প্রতিধ্বনি উঠিল,- "সতী নাই ! সতী নাই !"

মহাদেব অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। হঠাৎ তুমুল আন্দোলনে তাঁহার নৃত্যানুরাগ আসিয়া পড়িল ! মস্তকের জটা ছিঁড়িয়া মাটিতে নিক্ষেপ করিতে করিতে, নৃত্য করিয়া করিয়া, তিনি কহিতে লাগিলেন, "সতী নাই ! ও হো হো ! সতী নাই !"

মহাকালের কালান্তক মূর্ত্তি ক্রমে প্রকাশিত হইতে লাগিল। যে প্রলয়-ঘোর-গর্জ্জনে চরাচর ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে, যে নৃত্যের তরঙ্গে আকাশ পাতাল, পাহাড়-পর্ব্বত বিচ্যুত হইবার উপক্রম হয়, মহাদেব সেই গর্জ্জন ও

সেই নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিক্ষিপ্ত জটাগুচ্ছের মধ্য হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর মত পিল্‌পিল্ করিয়া কাল কাল প্রকাণ্ডদেহ বীরের উদ্ভব হইয়া চারিদিকে ঘনতমসার সূচনা করিল।

একটী প্রকাণ্ড জটা হইতে হঠাৎ আকাশপ্রমাণ এক বিরাট ভীষণ মূর্ত্তি উদ্ভুত হইতেই, শিব তাহাকে কহিলেন, "বীরভদ্র, দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দিয়া আইস; সতীর দেহত্যাগের প্রতিশোধ নাও। এই সব অনুচরদের সঙ্গে লইয়া যাও।—এই ধর আমার ত্রিশূল—।"

একখণ্ড প্রলয়বাহী মেঘের মত বীরভদ্র অগ্রসর হইয়া ত্রিশূল গ্রহণ করিল, এবং বিনা বাক্যব্যয়েই শিবকে প্রণাম করিয়া, অনুচরদিগকে ইঙ্গিতমাত্রে আহ্বান করিয়া দক্ষপুরীর দিকে চলিয়া গেল। তখন ভূত-প্রেত ও প্রমথাদি কৈলাসবাসিগণও তাহাদের অনুসরণ করিল।

নন্দী ও ভৃতের দলকে তাড়াইয়া দিয়া ভৃগু প্রসন্নভাবে হাস্য করিতেছিলেন এবং পুনঃ যজ্ঞের উদ্যোগে মনোনিবেশ করিতেছিলেন; সতীর অকস্মাৎ দেহত্যাগে অত্যন্তই দমিত হইলেও, পাছে কেহ কিছু মনে ভাবে, এই ভয়ে দক্ষও যথাসাধ্য অন্তরের ভাবটী লুক্কায়িত রাখিয়া, সকলকে উৎসাহদানপূর্ব্বক শিবের ও শিবানুচরদের অকিঞ্চিৎকর শক্তির এই জ্বলন্ত নিদর্শনটীর দিকে পুনঃ পুনঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নানা কৌতুকবাক্য উচ্চারণ করিতেছিলেন; জামাতারাও সদ্যোমূর্চ্ছিতা প্রসূতির শোকাপনোদনের জন্য নিকটে বসিয়া নানাছলে নানারূপে শিবনিন্দা কীর্ত্তন করিতেছিলেন; এমন সময় অকস্মাৎ শত-সহস্র মেঘগর্জ্জনের ভীষণ রোলে সকলেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে না দেখিতে চরাচর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল; এবং শিবকিঙ্করদের প্রমত্ত উল্লাসধ্বনি ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

ভৃগু শঙ্কিতভাবে কহিলেন, "আবার কি?"

দক্ষের হৃদয়ে, কেন বলা যায় না, এক টুক্‌রা আশঙ্কা লাগিয়াই ছিল। এখন এই কোলাহল শুনিয়া সেই হৃদয় আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "এইবার বুঝি ভাঙ্গড় স্বয়ং আসিতেছে, প্রস্তুত হও!"

সকলেই সশঙ্ক-বিস্ফারিত-নেত্র! তেমন যে শিববিদ্বেষী ভৃগু ও দক্ষ, তাঁহারাও বিস্ফা-রিত-নেত্রে, স্থিরনির্ব্বাক্ বদনে আপনাদের সকল দেবশক্তি দৃষ্টির মধ্যে পূরিয়া নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রহিলেন। দক্ষপুরীর বৃক্ষপত্র-গুলিও এই সময়ে নিষ্কম্প ভাব ধারণ করিল। দেখিতে না দেখিতে, জোয়ারের জলের মত শিবকিঙ্করের দল একটা কাল ঢেউ খেলাইয়া আসিয়া যজ্ঞস্থল প্লাবিত করিয়া দিল। দেব-তারা প্রাণপণ শক্তিতেই দাঁড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে দাঁড়াইতেও ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। দক্ষ মুদ্গর-হস্তে আঘাত করিতে উঠিতেছিলেন, কিন্তু এমন সময় পর্ব্বতপ্রমাণ বীরভদ্রের বিশাল হস্তখানি উপরে আসিয়া পড়ায়,—তাঁহার সঙ্কল্প ঘুরিয়া গেল! উপর হইতে বীরভদ্র তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে অনেকখানি শূন্যে তুলিয়া ফেলিল। বীরভদ্রের অপর হস্ত ভৃগুর গুম্ফ রাজি "পট্ পট্" করিয়া উৎপাটিত করিতে লাগিল। অন্যান্য শিবকিঙ্করেরা দেখিতে

দেখিতে, লাথি, চাপড় ও কীল-ঘুষোর চোটে যজ্ঞভূমিকে শ্মশান অপেক্ষাও ভয়াবহ করিয়া তুলিল।

কেবল এক স্থানেই ইহাদের উৎপাত আত্মপ্রকাশ করিল না! সেখানে কাহারও একটীমাত্র নিঃশ্বাসের আঘাত পড়িতে পাইল না। যেখানে ছিন্ন-লতার মত সতীর বিগত-প্রাণ দেহ একস্তূপ নির্ম্মাল্যের গৌরবে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই স্থানটী পরম যত্নেই তাহারা ঘিরিয়া রক্ষা করিয়া রাখিল। নিকটবর্ত্তী যূপকাষ্ঠের উপরে বীরভদ্র দক্ষকে আনিয়া আবদ্ধ করিলেন এবং দক্ষ কোনও কথা কহিতে না কহিতে, কোনও দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে না ফিরাইতে, অকস্মাৎ একটী খড়্গাঘাতেই পশুর মত তাঁহাকে ছিন্নশির করিয়া ফেলিনেন। ছিন্নগুম্ফ ভৃগু ও অন্যান্য শিবদ্বেষীরা এই দৃশ্য দেখিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেবগণ ত্রাসে যে যে-দিকে পারেন পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অন্তঃপুরে প্রবল ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল।

অত্যল্পকালের মধ্যে ধ্বংসক্রীড়া শেষ হইয়া গেল। তখন শিবকিঙ্করেরা ভৃগু-প্রভৃতি শিবদ্বেষীদিগকে পাশবদ্ধ করিয়া সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনতি-বিলম্বেই জগতের একমাত্র বিরাটপুরুষের মত এক দীর্ঘ সৌম্যপুরুষ সেইখানে আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। প্রলয়ের পর পয়োধিবক্ষ যেমন এক প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, মহাদেবের বিশাল ধ্যানস্তিমিত আকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয়েও সেই প্রলয়ঝটিকার পরে এখন একটা অপূর্ব্ব স্থির ধীর ভাব লক্ষিত হইতেছিল! তাঁহার বিশাল উজ্জ্বল নয়নপদ্ম-দুইটী যোগভরে একটু নিমীলিত হইয়া পড়িয়াছিল। শিব-কিঙ্করেরা প্রভুকে স্বয়ং উপস্থিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল। ধীর-প্রশান্ত-গমনে শিব সতীর লুণ্ঠিত দেহের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রসূতি তখন সেইখানে বসিয়া করুণ আর্ত্তনাদে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন; শিবকে দেখিয়া, "এ কি কল্লে বাবা!" বলিয়া আবার তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

মহাদেব একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অদূরে দক্ষের দেহ রক্তাক্ত ও দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তেমন যে গর্ব্বিত মস্তক তাহাও এখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া অতিশোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে! ভৃগুর গুম্ফশূন্য পাংশু মুখমণ্ডল ভয়- ও লাঞ্ছনা-মণ্ডিত হইয়া অতিশয় অদ্ভুত দেখাইতেছে! দেখিয়া দেখিয়া ভোলানাথের ভ্রমপ্রবণ হৃদয় আবার সকলই ভুলিয়া যাইতে চাহিল। ভোলানাথ বীরভদ্র ও অন্যান্য অনুচরদিগকে তখনই বিদায় করিয়া, ইঙ্গিতে নন্দীকে নিকটে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন,—"নন্দী, ঐ ছাগমুণ্ডটা তুলিয়া লইয়া এই দাম্ভিক প্রজা-পতিকে পুনর্জ্জীবিত কর; আর এইগুলোকে ছাড়িয়া দাও।"

এই বলিয়া বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে এইবার সতীর দেহ স্পর্শ করিলেন এবং বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া পরম আদরে উঁহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। প্রিয়তমার দেহ-স্পর্শে অকস্মাৎ বিশ্বনাথের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। উন্মত্তের মত আবার মহাদেব অকস্মাৎ নৃত্য করিয়া উঠিলেন এবং সেই দেহলতিকা স্কন্ধ-দেশে স্থাপিত করিয়া স্পর্শসুখে উন্মত্তপ্রায়

হইয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে কেবলই চলিতে লাগিলেন। মুক্ত দেবতা ও ঋষিগণ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়া একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া শুধু মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন।

কিছু ক্ষণ পরে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু সেইখানে উপস্থিত হইয়া প্রসূতিকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "মা, যাহা হইবার ত হইল; এইবার আসুন, যজ্ঞ পূর্ণ করি। প্রজাপতিকে লইয়া আপনি এই দিকে আসিয়া বসুন।"

দক্ষের দিকে চাহিয়া প্রসূতি কাঁদিয়া কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর, একি বিড়ম্বনা! বিধাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়াত্মজের এই নিদারুণ বিধিলিপি! এই মূর্ত্তি লইয়া অভিমানী প্রজাপতি কি করিয়া জীবন বহন করিবেন?"

বিষ্ণু কহিলেন, "সতি, মহেশ্বর ভগবানেরই বিনাশমূর্ত্তি; তিনি দেবদিগেরও দেব—মহাদেব! তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া দক্ষপ্রজাপতি মূঢ়ের ন্যায়ই কার্য্য করিয়াছেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় নয়।"

"নিশ্চয়ই নয়" বলিয়া দক্ষ অগ্রসর হইয়া, নিজেই এখন সেই কথার সমর্থন করিলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া গেলেন! দক্ষ কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর, আপনি ঠিক্ কহিয়াছেন। জগতে আমার ন্যায় মূঢ় আর কে? যিনি দেবতারও দেবতা—সকলেরই নমস্য, যিনি ভগবানেরই প্রলয়মূর্ত্তি, নিমেষে যাঁহার ইচ্ছায় যুগপ্রলয় সংঘটিত হয়, তাঁহাকেই আমি জামাতা পাইয়া চিনিতে পারি নাই;—ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে! দেহের এ বিকৃত অবস্থা এ দুর্ভাগ্যের সমতুল নয়। আজ আমি শিবকে যথার্থ চিনিতে পারিয়াছি। দেহ বিকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আজই আমার অন্তর সম্যক্ পরিষ্কৃত হইয়াছে। যজ্ঞনাথ, আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করুন; আমি সকলকে দান করিয়া, যাহা কিছু যজ্ঞভাগ অবশিষ্ট থাকিবে, সকলই আজ ভোলানাথকে প্রদান করিব, আজ আমি জামাতার যোগ্য আদর করিব।"

ভৃগু প্রভৃতি হোতৃগণ অগ্রসর হইয়া সেই কথার সমর্থন করিয়া কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর, তাই করুন; আমরাও আজ স্বয়ম্ভূকে চিনিতে পারিয়াছি। আমরাও আজ তাঁহার যোগ্য সমাদর করিব।"

দেবগণ এবং দক্ষপুরীর অন্যান্য সকলেও অগ্রসর হইয়া সেই কথাই কহিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "যজ্ঞনাথ, আমাদেরও সেই কথা। আমরাও তাঁর সম্মান করিব,—আপনি যজ্ঞ পূর্ণ করুন।"

তখন যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু নিতান্ত প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া প্রজাপতি দক্ষের সেই যজ্ঞ মহোৎসাহে পূর্ণ করিয়া দিলেন। দক্ষও তখন হোতৃগণ-সহ বিষ্ণুকে বন্দনা করিয়া, সকল দেবতাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট যাহা কিছু রহিল, সকলই সর্ব্বসমক্ষে ভোলানাথের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

দক্ষপুরী অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব প্রভায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

উল্টা স্বষ্টি

(গল্প)

অভিনয় চলিতেছিল। রোহিণীর রূপমুগ্ধ গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পদাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল। ভ্রমর মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। রঙ্গালয়ের বিখ্যাত অভিনেত্রীর সেই হৃদয়-মন-ঢালা সেই করুণ ক্রন্দন, সাত দিনের ছেলেটীর জন্য সেই মর্ম্মস্পর্শী হাহাকার, সকল দর্শকেরই মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতেছিল। পর্দ্দা-ঘেরা স্ত্রীলোকদের আসনের ভিতর হইতেও একটা অস্ফুট ক্রন্দন ও গুঞ্জনের ধ্বনি নিম্নের দর্শকদিগের শ্রবণপথে আসিতেছিল। এমন সময় 'ড্রপসিন' পড়িয়া গেল।

তুই টাকার 'সিটে' তুইটী রমণী পাশাপাশি বসিয়াছিল। 'ড্রপসিন' পড়িতে, তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "সত্যিই, এখানে যেমন সব রকমে স্বাভাবিক করতে পারে, এমন আমি অন্য কোথাও দেখিনি। এখানে যেন সবই জীবন্ত, সবই সত্য।" অপরা উমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার জীবনে এ সবই প্রকৃত সত্য।" তাহার হাসির সহিত যে একটা মৃদু-নিঃশ্বাসও পড়িল, সঙ্গিনী উষার চোখে সেটুকু এড়াইল না। সে একটু বিষণ্ণভাবে, পার্শ্ববর্ত্তিনীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখে, সেই বড় বড় কাল চোখের দিকে চাহিয়া, একটু আগ্রহান্বিত ভাবেই আরও একটু ঘেঁসিয়া বসিল। আপনার শুভ্র ফুলের মত হাত-তু'খানি দিয়া সঙ্গিনীর কোল হইতে ফুলের মতই সুন্দর মেয়েটিকে তুলিয়া চুম্বন করিল। তারপর একট কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "এমন রতন যা'র কোলে, তা'র আবার তুঃখু কি, ভাই?" সঙ্গিনীর কথায় উমা মুখ তুলিয়া চাহিল। কিশোরীর অম্লান ললাটে সজ্জিত কেশ-গুচ্ছের দিকে চাহিয়া বলিল, "গৌরীর জন্যেই আরো বেশী কষ্ট হয়, ভাই। তু'দণ্ডের পরিচয় তোমার সঙ্গে; কিন্তু উষা, সত্যিই বলচি, আমার মেয়ে বলে গুমর করে বলচি না, এ রতন তোমার কোলেই মানায়। আমার মত কাল কুৎসিতের কোলে কি এ সোনার চাঁপা ভাল দেখায়? আমার জন্যেই ভগবান্ একেও শুদ্ধ অসুখী করলেন, ভাই! এইটুকু মেয়ে, কি কপাল বল দেখি, ওর? এতটুকু আদর কারো কাছে পেলে না!" গৌরীর মা'র চোখে জলধারা গড়াইয়া পড়িল।

পরতুঃখ-কাতরা উষা তাড়াতাড়ি আপনার চোখ মুছিয়া, উমার হাত ধরিয়া বলিল, "ছিঃ! ভাই উমা, এমন করে কি কাঁদতে আছে? নাই বা করলে আর কেউ আদর, তুমি তো কর? গৌরীর বাবা তো করেন?" উমা আবার হাসিয়া বলিল, "যা বলেচ ভাই! সেই কপালই যদি ওর হবে, তা হোলে আর আমিই বা তুঃখু কোর্ব্বো কেন, উষা! এমন কি ভাগ্য করেচে, যে গৌরী তাঁ'র কোলে স্থান পাবে!"

বিস্মিতা চিন্তা-পীড়িতা উষা উমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! উমা আবার হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যবতী, রাজরাণী, পতি-সোহাগিনী হ'য়ে বেঁচে থাক, বোন্! অভাগিনীর

দুঃখকাহিনী আর শুনতে চেয়ো না। ওই দেখ 'ড্রপ' উঠেছে, থিয়েটার দেখ্‌বে না?"

কম্পিত স্বরে উষা বলিল, "যদি বাধা দাও তো শুনতে চাই না; কিন্তু এও কি দুঃখ-কাহিনী দেখ্‌তেই আসি নি ভাই? নিজের মুখে বোন্‌ বলে ডেকেচ, সেইজন্যেই সাহস করে বল্‌চি, দিদি, ছোটবোন্‌কে কি কোন কথা বল্‌তে দোষ আছে?"

উষার চোখেও বড় বড় দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। ব্যথিতা উমা তাড়াতাড়ি উষার চোখের জল মুছাইয়া বলিল, "ছিঃ তুমি কাঁদ্‌লে ভাই! এই সামান্য কথায় কাঁদ্‌বে, তা আমি মনে করি নি। স্বামী-সোহাগিনী তুমি বোন্‌, এ পতি-পরিত্যক্তার কাহিনী শুন্‌তে কি তোমার ভাল লাগ্‌বে? কেন ভাই তোমার সরল প্রাণে কষ্ট দোব? মিছে কেন, পরের ব্যথায় ব্যথা পাবে, উষা! এ ব্যথা তো মোছাবার নয়! সেইজন্যেই বল্‌তে চাই নি আমি। শুন্‌বে তো শোন ভাই!—অভাগিনীর সবই অভাগ্য! যখন মা'র পেটে, তখনই বাবা চলে গেছেন। কোন্‌ বিদেশে চাক্‌রী কর্‌তে গেছ্‌লেন, প্লেগের ডাক্তারী; সেই প্লেগেই গেলেন; ফির্‌তে আর হোলো না। দু'বছর বয়সে মাও ফেলে রেখে বাবার কাছে গেলেন। সম্বলের মধ্যে মামা-মামী। তাঁরা যে ভালবাসেন না, তা নয়; তবে মামারও পাঁচটি ছেলে-মেয়ে আছে; আর গরীব তিনি। আমার বাবাও কিছু রেখে যান নি। মামারও একমাত্র সম্বল বাড়ীখানি। মামার আশ্রয়ই এখনও আমার আশ্রয়। আজো তিনি যাই, দু'বেলা দু'মুটো দিচ্চেন, তাই কারো দ্বারস্থ হ'তে হয়নি।"

কাতরা উষা বলিয়া উঠিল, "মাপ কোরো ভাই! কিন্তু এমনই যদি কর্‌লেন, তবে তোমরা কেন আদালত থেকে খোরাকী আদায় করে নাও না?"

উষা। দরকার কি ভাই! যে সকল বিষয়েই বঞ্চিত কর্‌লে, তা'র কাছে যেচে এ অপমান আর কেন? মামা বলেন, 'যে-কটা দিন আমি আছি, দু'মুঠো ভাত দোবোই, তারপর সতীশ আছে।' সতীশই মামার একমাত্র আশার স্থল; সে মামার বড় ছেলে; এইবারে বি এ দেবে। তারপর শোন, মা-বাপ-মরা মেয়েরও বিয়ের বয়স হোল। বরং একটু বেশীই হোল। সে সময়ে প্রকৃতই আমি মামা-মামীর গলগ্রহ হয়ে উঠেছিলুম। শেষকালে, আমার যখন তের উত্তীর্ণ হয়, তখন একটি পাত্র স্থির হোল। তিনি আফিসের নূতন কেরাণী; মাহিনা সাড়ে বার টাকা; —তাঁরি মূল্য নগদ পাঁচ শত, আর হাজার টাকার গয়না। মা'র যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী করে তের শ' টাকার যোগাড় হোল; বাকী দু' শ'র জন্যে মামা অস্থির হ'য়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন। টাকা কোথাও পেলেন না, কেউ ধার দিলে না; সকলেই কিছু বন্ধক চায়। টাকার যোগাড় হোল না; কিন্তু বিয়ের দিন উপস্থিত হোল। বরকর্ত্তা টাকা কম দেখে চটে আগুন; বর ফিরিয়ে নিয়ে প্রকৃতই চলে গেলেন। আমার সরলবুদ্ধি মামা একেবারে জড়বৎ হয়ে গেলেন। মাথায় যেন তাঁর বজ্রাঘাত হোল। মামাকে এই অবস্থায় ফেলে সকলেই চলে

গেলেন ;—গেলেন না কেবল বরকর্ত্তার একটি বন্ধু,—বহরমপুরের একটি উকীল। তিনি সপুত্রক বরানুগমনে এসেছিলেন; বন্ধুর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে, এসে মামার হাত ধরে তুলে বল্‌লেন, 'আপ্‌নি কি অনুগ্রহ কোরে মেয়েটি আমার ছেলের হাতে দেবেন ?' মামা তো অকূল পাথারে কূল পেলেন। পুত্রের আপত্তি সত্ত্বেও আমার শ্বশুর জোর করে তা'কে এনে ছান্‌লা-তলায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। সেই দিন,—লগ্ন তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—সেই অশুভ ক্ষণেই আমাদের বিয়ে হ'য়ে গেল।

উমা একবার চুপ করিল। সম্মুখে সজ্জিত রঙ্গালয়ে দৃশ্যপটের পর দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইতেছে! উজ্জ্বল তাড়িতালোকে, দামী চুরুট ও নানাবিধ এসেন্সের সম্মিলিত গন্ধে প্রপূরিত উৎসব-রজনীর ন্যায় সেই ভারাক্রান্ত বায়ুতে, উমার সেই বিবাহ-রজনী যেন একখানি সজ্জিত দৃশ্যপটের মতই আবার মনে পড়িয়া গেল। ছবির মত একদৃষ্টিতে সে 'ষ্টেজের' দিকে চাহিয়া রহিল। তখন একটা অঙ্কের শেষ দৃশ্য। গোবিন্দলাল কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতেছে, "আমার ভ্রমর, সুখে অতৃপ্তি; দুঃখে শান্তি!—আমার ভ্রমর—।" উমা স্তম্ভিত হৃদয়ে শুনিতে লাগিল! গৌরী তাহার কোলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শেষে যেমন রোহিণীকে হত্যা করিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেল, তখন যেন সেই বন্দুকের শব্দে উমার চমক্ ভাঙ্গিল।

"বৌ-দিদিমণি!" হঠাৎ একটা পরিচিত গলার স্বরে চমকিত হইয়া উমা মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। তাহার শ্বশুর-বাড়ীর ঝির গলা না? সে কেন তাহাকে এখানে ডাকিবে? বাস্তবিক ঝি উমাকে ডাকে নাই। সে উষার কাছে আসিয়া আবার বলিল, "বৌ-দিদিমণি, দাদাবাবু এই পানগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন! আর শুধোলেন তিনি, শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌বে? না, গাড়ি তৈরি কর্‌তে বল্‌বেন? আহা, রাত জেগে যে সোনার পিতিমে মলিন হয়ে উঠেছে গা? চোখ-দুটো ফুলে উঠেছে, লাল হয়েছে! দাদাবাবু এখনি সকাল না হ'তেই ডাক্তার আন্‌তে পাঠাবে। কাজ নেই বাবু, গাড়ী জুত্‌তে বলি গে।" ঝির স্নেহবাক্যে উষা লজ্জাবোধ করিল। পতি-পরিত্যক্তার কাছে পতিসোহাগিনী স্বামীর আদরের কথা লেশমাত্র প্রকাশ হইতেও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। তাড়াতাড়ি বলিল, "না রে, না, এখন তৈরি কর্‌তে হবে না। খবরদার, আমার কথা কিছু বলিস্ নে। এ-রকম কান্নাকাটি দেখে কি মানুষ না কেঁদে থাক্‌তে পারে? দিখ্‌চিস্ তো তুইও?"

"দেখ্‌চি নে আর গা? ঐ যে ভোম্‌রার জন্যে আমিই কি কম কেঁদিচি বৌ-দিদি! তা যাক্—আমি না হয় নাই বল্লুম, তানার তো চোখ্ আছে। গাড়ীতে উঠে আমাকেই কত বক্‌বে এখন।" এই বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।

ঝি চলিয়া গেলে, উষা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উমার দিকে চাহিল; দেখিল উমা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চিত্রার্পিতার ন্যায় বসিয়া আছে। তবু ভাল, সে ঝির কথা শোনে নাই। উষা উমার হাতে পান দিয়া বলিল, "তার পর দিদি—?"

যেন কোন্ স্বপ্ন-রাজ্য হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিয়া উমা বলিল, "তার পর!

তারপর দিন-কতকের জন্যে আমার এ অনন্ত অন্ধকারে চাঁদের আলো দেখা দিল। বুঝ্‌তে পারতুম্ বেশ, স্বামীর মনের মতো হই নি। এম-এ বি-এল্‌-পাশ স্বামীর উচ্চ আদর্শের অনুরূপা স্ত্রী আমি কি করে হব ভাই? আর প্রধান অন্তরায়, আমার এই রূপ। তাঁর দোষ কি? তবু বল্‌চি, সেই সময়ই আমার এ অন্ধকার জীবনের অমাবস্যা কেটে, প্রথম চন্দ্রোদয় হয়েছিল। শ্বশুরের আদরে, শাশুড়ীর স্নেহে, আবার আমি যেন আমাকে জগতের একজন বলে মনে কর্‌তে পেরেছিলুম। অতীত জীবনটা যেন আমি দুঃস্বপ্নের মতই ভুলে চলেছিলুম। শুধু একটা আশঙ্কা ছিল—স্বামী! সে আশঙ্কা সর্ব্বনাশের আশঙ্কা! মনে আন্‌তেও যেন ভয় হ'ত। জোর করে চোখের জল চোখে চেপে, তাঁর মনের মত হ'তে চেষ্টা কর্‌তুম। ভালবাসতেন্ না বটে, কিন্তু অনাদরও কর্‌তেন না। প্রেমে না হোক্, পত্নীর গৌরবে আমার আসন স্থিরই ছিল। নবজীবনের জ্যোৎস্নার মত দিনগুলিতে অসহনীয় কাল তূলি বুলাতে, আমি কোন রকমেই পারতুম না। চলেও যাচ্ছিল এক রকম। কিন্তু অভাগিনীর অদৃষ্ট! সইবে কেন? সামান্য একটা ওষ্ঠব্রণ হয়ে, অমন শ্বশুর হঠাৎ চলে গেলেন। ইন্দ্রপুরী অন্ধকার হয়ে গেল। শাশুড়ী দিনরাত পড়ে থাক্‌তেন, আমিও ছায়ার মত তাঁরই কাছে-কাছে ঘুরে বেড়াতুম। তিনিই আমার সংসারে একমাত্র ভরসা ছিলেন। কিন্তু বিধি বাম! তিনমাস পরে কলেরা হয়ে, তিনিও চলে গেলেন। আমার সবই ফুরিয়ে গেল! তখন কিন্তু স্বামী কিছুমাত্র মন্দ ব্যবহার করেন নি। একটা বছর তিনি আমাকে সঙ্গে করে, এ-দেশ ও-দেশ করে বেড়িয়েছেন; সারাদিন অবশ্য বাইরেই থাক্‌তেন, তবু রাত্রিবেলাও তো তাঁকে দেখতে পেতুম। মনে মনে আশাও একটু যেন গভীর হয়ে দেখা দিয়েছিল।

"এমন সময় একদিন তিনি সঙ্গে করে আমাকে মামার বাড়ী নিয়ে এলেন। মামার আনন্দ ধরে না! উকীল জামাইয়ের সমাদরের ত্রুটি যেন কিছুতে না হয়, সেই চেষ্টায় একটা মানুষ যেন দশটা হয়ে ঘুরতে লাগ্‌লেন। জামাতার মনের ভাব তখন সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। ভোরের বেলায় উঠে আস্‌চি, বল্লেন, 'উমা, দাঁড়াও।' আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ালুম। তিনি মুখটি অল্প নীচু করে বল্‌লেন, 'আমাকে ক্ষমা কোরো উমা, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী।' ভূমিকা শুনেই আমার শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে আস্‌ছিল, তবু আমি অবশিষ্ট কথা শোন্‌বার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি বাক্যসমাপ্তি কর্‌লেন,—'আমি বিয়ে কর্‌তে যাচ্চি।' শুনে হা-হুতাশও করলুম না, মূর্চ্ছাও গেলুম না; তেমনি ভাবেই জানালা ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম। যে সর্ব্বনাশের ছায়ার আভাসও মনে আন্‌তে সাহস হ'ত না, তাই চোখের উপর ঘটে গেল। তিনি চলে গেলেন!

"গৌরী তখন মাত্র তিনমাস তা'র মাতৃগর্ভে স্থান নিয়েছিল। যখন মামীমা জান্‌লেন, মামাকে দিয়ে চিঠি লেখালেন; কোনও উত্তরই এলো না। গৌরীর জন্মের পরেও একখানা চিঠি মামা লিখেছিলেন;

উত্তরে, হাজার টাকার একখানা নোট, প্রেরকের নামশূন্য অবস্থায় এসেছিল। মামা গরিব হলেও তৎক্ষণাৎ সে নোট ফেরত দিয়েছিলেন। তারপর আর কোন সংবাদই নেই।"

উষা বলিল, "তুমি কোন চিঠি লিখেছিলে দিদি?"

উত্তরে উমা বলিল, "আর কেন ভাই? সে স্বপ্ন-কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।—তিনি সুখে আছেন, এই আমার সুখ। আমি তো আর তাঁকে সুখী কর্‌তে পারি নি, ভাই!"

উষা সে কথা চাপা দিয়া উমার ঠিকানা জানিয়া লইয়া মিনতির স্বরে বলিল, "আবার কবে দেখা হবে, দিদি? তুমি কি আমাদের বাড়ীতে একদিন আস্‌বে, ভাই? তা হোলে একদিন দুপুর বেলা গাড়ী পাঠিয়ে দোব। যাবে বল দিদি?"

উমা একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "মামা যে কোথাও পাঠান না! যেতে দেবেন কি?"

উষা হাসিয়া বলিল, "না ভাই, সে কথা নয়; তোমার বিশ্বাস হচ্চে না। মনে কর্‌চ, অজানা জায়গা, উষা ভাল-লোক কি না? এই সব, না ভাই? আমাকে দেখে কি ভাই অপবিত্র বলে মনে হয়? দেখ দেখি আমার মুখের দিকে চেয়ে? তা হোলে কি আমি সাহস করে বল্‌তে পারতুম, ভাই? পাঁচজনের মুখে, পাঁচ রকম গল্প শুনে, তুমি আমাকেও অবিশ্বাস কর্‌চ দিদি?"

উমা তাড়াতাড়ি বলিল, "না উষা, তা নয়, ভাই। জানতো, আমার স্বামীর চরণে আমি অপরাধিনী! আমার নামে, ভাই, মন্দকথা রট্‌তে বেশী ক্ষণ নয়। যাব ভাই আমি; সতীশ না যায়, কালোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

উষা। তা হোলে রবিবার গাড়ী পাঠাবো। ঐ যে তোমার মাসীমাও উঠেছেন।

অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে। উমার পশ্চাতে পশ্চাতে উষাও নামিতে লাগিল। দরজার কাছে একটী সুন্দরকান্তি যুবক দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন, "আঃ, ঝিটা গেল কোথা? বাছা, বলে দাও, বৌবাজারের সুরেশ মিত্তিরের বাড়ী।" সহসা উমার দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টির মিলন হইয়া গেল। যুবক চকিত হইয়া সরিয়া গেলেন। উমা যেন আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। উষা পিছনে দাঁড়াইয়া ইহা দেখিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি হোল দিদি?" উমা অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "ঐ যে তিনিও এসেছেন। বোধ হয়, সস্ত্রীক এসেছেন। আহা, আর একটু আগে জান্‌লে যে, চেষ্টা কোরে সে ভাগ্যবতীকে দেখ্‌তুম। হিংসা করি না ভাই! একবার দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে করে।"

উষা বিবর্ণমুখে বলিল, "যাও, আর ও-রকম অদ্ভুত সাধ করে কাজ নেই। ওই বুঝি, তোমাদের ডাক্‌চে দিদি! যেও ভাই, আমি গাড়ী পাঠাব। আচ্ছা দিদি, তোমার স্বামী এখন বৌবাজারে আছেন, বল্‌লেন না? তুমি সে বাড়ী চেনো?"

তদুত্তরে উমা বলিল, "না ভাই, আমি বহরমপুরেই ছিলুম।"

গাড়ী আসিয়া পড়িল। উমা উঠিলে পর উষা গৌরীকে চুম্বন করিয়া বলিল, "দিদি, এটীকে আমায় দেবে? এ তোমার স্বামীর মতো দেখ্‌তে হয়েছে, না?"

এইবার উমার মাসী-মা বলিলেন, "হ্যাঁ মা, গৌরী ঠিক্ ওর বাপের মতন হয়েছে; জামাই যে সুন্দর।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া উষা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

(২)

যথাসময়ে উষা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল। উমার মামার বাড়ীর সাম্নে বড়মানুষের বাড়ীর বৃহৎ গাড়ীখানাকে লইয়া মস্ত দু'টা ওয়েলার ঘোড়া যখন দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন বিস্মিত-নেত্রে পাড়ার যত অকর্ম্মা ছেলে-গুলাও ঘুড়ি-লাটাই ফেলিয়া স্থিরভাবে গাড়ী দেখিতে লাগিল। তক্‌মা-ওয়ালা সহিস ও কোচ্‌ম্যানের ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজিতে ঘন ঘন অঙ্গুলি-চালনা, একটী দিগম্বর বালককে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল! ততক্ষণে তাহার ঘুড়ির সুতায় মাঞ্জা দিবার বেলের আঠাটী আর একটী ক্ষুদ্র তস্কর সরাইয়া ফেলিল।

উমা গৌরীকে টিপ্ কাজল পরাইয়া, একটী ফর্‌সা জামা পরাইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল; সঙ্গে আট বছরের মামাতো ভাই কালো। সতীশ বাড়ী ছিল না।

মামী বলিতেছিলেন, "এলো-চুলটাতেই যাবি মা?" অবজ্ঞার সহিত চুলের রাশি বামহাতে করিয়া জড়াইয়া উমা বলিল, "তাদের কাছে তো আর বড়-মানুষি দেখাতে যাচ্চি না মামীমা? আর আমার কি সেজে-গুজে কোথাও যেতে আছে?" মামীমা জামাতার কথা স্মরণ করিয়া একবিন্দু অশ্রুজল আঁচলে মুছিলেন; উমা গাড়ীতে উঠিল।

বড়মানুষের গাড়ীতে চড়িয়া গাড়ীর চাক্‌চিক্য দেখিতেই কালোর সময় কাটিয়া গেল। একবার এটা টানিয়া, একবার ওটা টানিয়া, আলোর সুইচ্ টিপিয়া, সে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। উমা সস্নেহে, ছোটভাইটীর এই খেলা দেখিতেছিল। সে ভাবিল, ভাগ্যে উষা ঝি পাঠায় নাই, তাহা হইলে কালোর লজ্জা রক্ষা দায় হইয়া উঠিত।

'কম্পাউণ্ডে'র ভিতর গাড়ী থামিতেই দ্বারবান নামিয়া গেল। হাস্যমুখী উষা আসিয়া, উমার হাত ধরিয়া নামাইল ও গৌরীকে বুকে টানিয়া লইল। উপরে উঠিতে উঠিতে উমা বলিল, "আগে বল্‌তে মনে ছিল না ভাই! আজকে রবিবার, গাড়ী পাঠালে? তোমার স্বামী তো বাড়ীতেই আছেন! যদি রাগ কর বলে, না এসে থাকৃতে পারলুম না।" উষা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিছু ভয় নেই দিদি! সে একপাশে পড়ে আছে, —নিরীহ জীব।"

উষার বসিবার ঘরে গালিচা পাতা ছিল। উমা বসিয়া বলিল, "তোমার ঘরে বুঝি, তুমিই গিন্নী? আর তো কাউকে দেখ্‌চি না?" উষা হাসিয়া বলিল, "গিন্নী আপাততঃ আমিই বটে; তবে ঘর আমার নয়, আর এক জনের। আমার এ অনধিকার প্রবেশ।"

উমা বুঝিতে পারিল না; বিস্মিত-ভাবে চাহিয়া রহিল। উষা পুনরায় বলিল, "দাও তো দিদি, গৌরীকে একবার দেখিয়ে আনি। দেখ্‌তে চেয়েছেন।"

উমা বলিল, "তুমি এরি মধ্যে গৌরীর কথা গল্প করেছ! বেশ তো! শীগ্‌গিরই নিজের কোলে হবে, দুঃখ কি?"

উষা মৃদু হাসিয়া গৌরীকে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে স্বামীর ঘরের দিকে চলিয়া

গেল। উমা ভাবিতে লাগিল, কি পুণ্য করিলে, এ রকম স্বচ্ছন্দ গতিতে নিজের স্বামীর ঘরে যাওয়া যায়।

নির্জ্জন শয়ন-কক্ষে উষার স্বামী 'সোফা'য় বসিয়াছিল; উষা প্রবেশ করিতেই বলিয়া উঠিল, "তবু ভাল যে, হুজুরের দয়া হয়েছে! কে আস্‌বে বলে এতক্ষণ ধরে বারাণ্ডায় বসে থাকা হয়েছিল? এত রকম বার থাকৃতে রবিবারটাই পছন্দ হোল? এ কেবল ইচ্ছে করে আমাকে জব্দ করা, না উষা? ক্ষমতা যখন হাতে আছে, তখন তার ব্যবহারই বা না করবে কেন বল?" উষা বলিল, "সবাই যদি সেটা বুঝে চল্‌ত, তা হোলে সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্ট অশান্তি কমে যেত।"

উষার হাস্যাননে একবার যেন মেঘের ছায়া পড়িল; কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসিয়া বলিল, "সে-দিন যার কথা বলেছিলুম,—সেই গৌরী। দেখ না, কোলে নিতে ইচ্ছে করে না?" উষার স্বামী হাত পাতিল। গৌরী উচ্চ স্বরে হাসিয়া কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। উষা স্বামীর পাশে বসিয়া বলিল, "কি রকম নিষ্ঠুর এর বাপ, বল দেখি? কি করে এমন গোলাপ-ফুলটি ছেড়ে আছে? চোখে দেখে নি তাই! দেখ্‌লে বোধ হয়, ছাড়্‌তে পারৃত না।"

উষা নিঃশ্বাস ফেলিল, উষার স্বামীও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। হাস্যময়ী উষা আবার হাসিয়া বলিল, "গৌরীকে কিন্তু আর আমি দিচ্চি না। ওর মার কাছে আমি চেয়ে নিয়েচি; ও আমারই মেয়ে।" উষার স্বামী ঠাট্টা করিয়া বলিল, "বটে! পিতৃসম্পর্কে, না, মাতৃসম্পর্কে?" উষা ঠাট্টাটা গায়ে মাখিল; উল্টিয়া জবাব দিল, "যা বল।" উষার স্বামী বলিল, "পাগলের মতো, কি যে বল! ঠাট্টাটাও বুঝ্‌লে না, উষা?"

এইবার উষা বিষণ্নমুখে বলিল, "ঠাট্টার হ'লে ঠাট্টা বল্‌তুম। আর যদি সত্যি হয়?" উষার স্বামী চমকিত ভাবে উষার দিকে চাহিল;—উষা কি বলিতে চায়? উষা আবার বলিল, "কেন? দেখ দেখি, এর কোন্‌খানটা অমিল আছে, বল দেখি? মুখ, চুল, রং, গড়ন, সব দেখ। নিজের মেয়েকে কি নিজে চিন্‌তে পার না? চম্‌কে উঠো না। আমি যখন তোমার মুখে সব শুনেছিলুম, তখন তোমার কথায় তাকেই দোষী ভেবে-ছিলুম। তখন তো জানি না, তুমি সত্যিকার দেবী ভাসিয়ে দিয়েছ। প্রতিমার প্রাণ আছে কি না, দেখ নি; রঙের চকৃচকানি ছিল না বলে, তোমার মনে ধরে নি। তুমি স্বামী, আমার দেবতা। তোমাকে ছোট করে দেখ্‌তে আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি দোষ কর্‌তে চাইলেও আমি তোমাকে কর্‌তে দোব না।" স্বামীকে উত্তরের অবকাশ না দিয়া উষা বাহির হইয়া গেল। বিস্মিত স্তম্ভিত সুরেশ কন্যাকে কোলে লইয়া তেমনই বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই আলো ও ছায়া, উষা ও উমা দুইজনে আসিয়া সুরেশকে প্রণাম করিল। দুইজনেরই চোখে জল।

সুরেশ তখনও নির্ব্বাক্ হইয়াছে দেখিয়া, তাহার লজ্জা ভাঙিবার জন্য উষা বলিল, "বেশ লোক তো তুমি! আমরা প্রণাম কর্‌লুম, একটা আশীর্ব্বাদও কর্‌লে না? (উমার প্রতি) দিদি, তখনই তো বলেছিলুম, এ-সব আমার

নয়। তোমারই সব দিদি! তুমি আপনার ঘরকন্না বুঝে নাও, আমায় তোমাদের পায়ের পাশে ফেলে রেখে দিও। আমি শুধু আমার গৌরী-মাকে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াব।"

অপরাধী সুরেশ তখনও কথা কহিতে পারিল না; শুধু সজলনেত্রে কন্যাকে চুম্বন করিল।

কম্পিতহৃদয়া, বিস্মিতা উমা বলিয়া উঠিল, "উষা, তুই কি ভাই, বিধাতার উল্টা সৃষ্টি! পথের কাঁটা সতীনকে আবার কে কোথায় কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে আসে, ভাই?" উমা কাঁদিয়া ফেলিল।

উষা জলভরা চোখে একমুখ হাসিয়া বলিল, "ও দিদি, তা বলে যেন এ পথের কাঁটাটাকে দূর করে দিয়ো না। উল্টাসৃষ্টি কি আমি একাই ভাই! স্বামী অন্য স্ত্রী নিয়ে ঘর কর্‌চেন, জেনেও যে স্ত্রী তাঁর দোষ দেখ্‌তে পায় না, সতীনের সুখেই সুখ মনে করে, সে কি উল্টাসৃষ্টি নয়? আর আমাদের স্বামী? রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্! তাঁর এ চন্দ্রে কলঙ্ক কেন দিদি? গুণের আদর তিনিও কি বুঝ্‌লেন না? এও কি বিধাতার সোজা সৃষ্টি বল্‌ব?"

এতক্ষণে সুরেশ কথা কহিল, "মাপ কর আমায়; দু'জনেই মাপ কর। সত্যি এবার গৌরীকে ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। আমি তা পার্‌ব না। আজ বুঝ্‌চি সত্যই, তোমরা দেবী; এ মহাপাপীই বিধাতার উল্টো সৃষ্টি! গৌরী আমায় বুঝিয়েছে।"

সজলনেত্রে পতি ও সপত্নীর চোখের জল মুছাইয়া উষা বলিল, "আর গৌরী আমাদের সোনার সৃষ্টি, তিন জনেরই সোনার বাঁধন!"

শ্রীলতিকা দেবী।

আয় ফিরে আয়। *

১

কোথা গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!
দুঃখিনী জননী তোর
কেঁদে নিশি করে ভোর,
ঘুমালে দুঃস্বপ্ন দেখি যামিনী কাটায়।
তুই যে বুকের ধন,
তোর মত কোন্ জন?
ভয়ে মরি, তোরে বাছা, রাখিব কোথায়!
সহস্র শ্বাপদে হায়,
লোলুপ কটাক্ষে চায়,
পিয়িতে বুকের রক্ত ছুটিয়া বেড়ায়।
আমি যাদু চাহি তোকে
লুকায়ে রাখিতে বুকে,
রাক্ষসে পিশাচে যেন দেখিতে না পায়।
কোথা গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!

২

থাকি চেয়ে তোর মুখ কত যে আশায়!
তুই মাতৃভক্ত ছেলে,
কি করে রে মাকে ফেলে
গেলি চলে কোন্ দেশে? কি কাজ তথায়?
আছে তোর ভাই যত,
ঈর্ষা-দ্বেষে সবে রত
চরণে দলিছে সদা অভাগিনী মায়!

* কোনও নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুর উদ্দেশে লিখিত।

বুঝে না মায়ের ব্যথা,
বুঝে না নিজের কথা,
আপনি কুঠার হানে আপনার পায়!
নিজ প্রাণ তুচ্ছ ক'রে
তুমি যে তা'দের তরে
নিয়ত খেটেছ কত, বলা নাহি যায়।
আজ কেন গেলি ফেলে? আয় চলে আয়!

৩

কোথা গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!
কোন গিরি-গুহা-মূলে,
কাননে নদীর কুলে
নগরে প্রান্তরে কিবা আছিস কোথায়?
এখনো হয় নি সারা,
কি কাজ এমন ধারা?
কার ধ্যানে মগ্ন চিত কোন্ তপস্যায়?
সাধনা কি সিদ্ধ হবে?
অনন্ত মহিমা রবে
অটুট অক্ষয় হয়ে এ মর ধরায়?

৪

ডাকিছে জননী, "ঘরে আয় ফিরে আয়!
তুই যে কোলের ছেলে,
পারি নে থাকিতে ফেলে;
তোর তরে আঁখি-নীরে বুক ভেসে যায়!
উজ্জল মধুর বেশে,
সহাস নিকটে এসে
'মা' বলে আবার কবে ডাকিবি—আমায়?
শুনি সে অমিয় তান,
পুলকে পূরিবে প্রাণ
বহিবে অমৃত-স্রোত শিরায় শিরায়!
কেন গেলি? কোথা গেলি? আয় ফিরে আয়!"

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

মৃত-সংকার।

মৃত-সংকারের প্রয়োজনীয়তা আদি-মানবগণ অনুভব করুন, আর নাই করুন—পরবর্ত্তিযুগে যে ইহার আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া যাইবে। যে দিন হইতে মানুষকে ভূতপ্রেতের ভয় বিড়ম্বিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই মানুষও মৃতের স্থূল দেহটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রয়োজনীয়, মনে করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক, আদৌ ভূতপ্রেতের ভয় মানুষের মনটাকে কিরূপে অধিকার করিল, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

একজন পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তাহার অবোধ আত্মীয়স্বজন তাহাকে নির্জনে রাখিয়া দিল; আশা, শীঘ্রই হউক্, বিলম্বেই হউক্, সে পুনর্জীবন পাইতে পারে। কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। সুতরাং মৃতদেহ হয় 'মামিফায়েড' (mummified) অর্থাৎ মৃতদেহকে নানারূপ মসালা দিয়া শুষ্ক করিয়া রক্ষিত করা (যেমন Africa ও Peru দেশে) হইয়া গেল; নচেৎ তাহা গলিত হইয়া নষ্ট হইয়া গেল। দেহ নষ্ট হইল বটে, তাহার আত্মীয়-স্বজন কিন্তু কত দিনই নানা স্বপ্নে, নানা মূর্ত্তিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল;—কখনও বা শান্তমূর্ত্তিতে, কখনও বা রুদ্রমূর্ত্তিতে, কখনও বা বীভৎস মূর্ত্তিতে! দেহ নষ্ট হইল,—তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, তথাপি তাহাকে দেখা যায় কিরূপে?

এই স্বপ্নদৃষ্ট এবং মনঃকল্পিত মূর্ত্তি তদানীন্তন সরলবুদ্ধি পূর্ব্বপুরুষগণকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। তখন মস্তিষ্ক- এবং স্নায়ুতন্ত্রের কার্য্যবিধি-সম্বন্ধে (actions of the Nervous System) কোন জ্ঞানই মানুষের অধিগত হয় নাই। স্বপ্নকল্পিত মৃত আত্মীয় দর্শনে মানব ক্রমে ক্রমে একটা পরলোকের বা মৃতরাজ্যের বা স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করিতে বাধ্য হইল। মৃতের গলিত দেহ এবং বীভৎস দৃশ্য মানবের পূর্ব্বপুরুষগণের সরল স্বপ্নকে ক্রমে কণ্টকিত করিয়া তুলিতে লাগিল—এবং ফল এই হইল যে, মানব ক্রমে ভূত বা বেতালের (Vampire) নামে ভীত হইতে লাগিল।

এই ভীতি হইতেই প্রেতাত্মার উপাসনার সূত্রপাত। কিন্তু তাহা যখন বিফল হইল, তখন মৃতদেহকে বদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল; যাহাতে পুনরায় সে আর লোকালয়ে আসিয়া জীবিত-গণের উপর উপদ্রব না করে। মহামতি Herbert Spencer নানা অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ভূত বা Vampire বদ্ধ রাখিবার বহু অপূর্ব্ব এবং অদ্ভুত প্রকারের নিয়ম বর্ণনা করিয়াছেন। পার্ব্বত্য গুহায় বা মাটীর মধ্যে গর্ত্ত কাটিয়া মৃতদেহকে বদ্ধ রাখিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই "গোর" দিবার ব্যবস্থা বহুদেশেই প্রচলিত হইয়া গেল। জার্ম্মেনি বা শর্ম্মণ্য-দেশে এখনও পর্য্যন্ত দুষ্ট ভূতের গোরের উপর পথিক-মাত্রকেই পাথর চাপাইতে হয়; বিশ্বাস,—গুরুভার "গোর" ভেদ করিয়া উঠিতে ভূতের সামর্থ্যে কুলাইবে না। স্বর্গগত মহাত্মা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে ভারতবর্ষের আর্য্যদিগের মধ্যেও প্রায় চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে গোর দিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এত প্রকারের দুরূহ কঠিন ব্যবস্থা সত্ত্বেও জীবিতগণের উপর ভূতের উৎপাত শেষ হইল না—জীবিতগণের কর্ম্মে, স্বপ্নে, বিপদে-সঙ্কটে মৃত এবং মৃত্যু-ভীতির অবধি নাই! ভূত (Revenant) যখন কিছুতেই "বাগ" মানিল না, তখন মানুষ একবার শেষ চেষ্টা করিল;—মৃতদেহকে দগ্ধ করিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে বিশেষভাবে শান্তি দিবার চেষ্টা করিল। মানুষের বস্তি-প্রদেশের অস্থিটুকু (sacral region) কষ্টদাহ্য; এইজন্য এই অংশটুকুর sacred বা পুণ্যময় বা পবিত্র নামকরণ করিয়া নদী বা সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আশা,—লোকালয়ের বাহিরে চলিয়া যাউক্।

মৃতদেহ দগ্ধ করিবার আধুনিক ব্যাখ্যা যাহাই হউক,—ইহা আদৌ যে ভূত অন্ধ করিবার ব্যবস্থা, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু হায় হায়, মানুষের এত চেষ্টা সকলই বিফল হইয়াছে,—এত দুঃখ দেওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞ সাধারণের নিকট ভূত যেমনকার অবাধ্য তেমনি অবাধ্যই আছে;—কেবল মাত্র এখনকার দগ্ধ-ভূত একটু অতিরিক্ত মাত্রায় অশরীরী হইয়া পড়িয়াছে! আমাদের জন্মভূমি কিন্তু সর্ব্ব-বিষয়েই সকলের অগ্রগামী। আমাদের সোনার ভারত সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা অর্থাৎ সারগর্ভা, সুতরাং পৌরাণিক যুগে ঐ অতিরিক্ত মাত্রায় অশরীরী দগ্ধভূতের উপদ্রব নিবারণের ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছে। সে ব্যবস্থা গয়ায় পিণ্ড-দান। বিশেষজ্ঞগণ কহেন,— ভূত-ভয়-নিবারণের

ইহা একেবারে চরম নিষ্পত্তি। গয়ার বিষ্ণু-পাদে বৃহৎ অসুরের সুবৃহৎ করোটীর উপর ক্ষুদ্র অসুরদিগের মুণ্ডপাত! ইহাতেও আর ভূতভীতি তিরোহিত হয় না? ইহা যে অষ্ট-বজ্রসম্মিলন-বিশেষ!

আমরা এতক্ষণ যাবৎ পরলোকবাসীদিগের physical অর্থাৎ দৈহিক দৃশ্যটার আলোচ-নাতেই ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু ইহার একটা spiritual বা আত্মিক দৃশ্যও আছে। আমাদের অতিপ্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ Cerebrum এর কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন কি না জানি না—কিন্তু তাঁহারা দেহাতিরিক্ত একটা কিছুর সত্ত্বা যে অনুভব না করিয়া-ছিলেন, তাহা নহে। সেই দেহাতিরিক্ত "কিছুর" যথার্থ অর্থ সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে। Psycho-physiology এবং Psycho-Pathology অত্যন্ত আধুনিক এবং ইহা এখনও বাল্যাবস্থায় বলিলেও চলে। যাহা হউক্, প্রাচীনগণ তাঁহাদের অনুভূত অপরিস্ফুট দেহাতিরিক্ত "কিছুকে"---spirit, আত্মা প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিশ্চিত অর্থে ব্যাখ্যাত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ঠিক্ করিয়া লইলেন যে, আমা-দের এই দেহটা spirit বা আত্মার বাসস্থান মাত্র;—দেহটা স্থূল বহিরাবরণ—সূক্ষ্ম আত্মাই সার পদার্থ। পূর্ব্বপুরুষগণ যখন মৃত দেহটাকে শান্তি দিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে-ছিলেন, তখন ধীরে ধীরে এই "আত্মবাদ" তাঁহাদিগকে একটা নূতন আলোক প্রদান করিল। এই "আত্মবাদ" বিশেষভাবে গ্রহণ করিলেন গ্রীস, আর আমাদের ভারতবর্ষ। উক্ত "আত্মবাদের" স্ফুটতর অবস্থায় ঐ দুই-দেশ হইতেই মৃতদেহের "গোর" দিবার ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়া তৎস্থানে দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা স্থান লাভ করিল। কারণ, দেহটাকে দগ্ধ না করিলে মৃতের সূক্ষ্ম আত্মা বহুকালের আবাসভূমি স্থূল দেহটার অণুপরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে কিরূপে?

শ্রীঅমরেন্দ্র সাহা।

শোকাশ্রু।

(একান্ত স্নেহভাজন সাহিত্য-সেবক মহীন্দ্রমোহন চন্দের অকাল-বিয়োগ)

হে স্নেহভাজন!

এ কি নিদারুণ বাণী
আনিল এ পত্রখানি!
এ কি হায়, বজ্রধ্বনি, এ কি অভিশাপ!—
আমাদের নাহি ব'লে,
তুমি নাকি গেছ চ'লে,
নিঠুর পরের মত?—এ যে গো প্রলাপ!

সেই মুখ সেই হাসি
নেত্রে যে আসিছে ভাসি,
সে যুগ নয়ন ভরা কত অভিমান;
সেই মধুমাখা কথা,
ভুলায় ব্যথীর ব্যথা,
সেই উদারতা-ভরা সরল পরাণ!

আ-মরি! মধ্যাহ্ন-রবি,
অমন উজ্জ্বল ছবি,
নরমল কাল রাহু গ্রাসিয়াছে তা'য়!
এ কি রে ভীষণ দৃশ্য,
আঁধার নিখিল বিশ্ব,
নবিয়াছে সব আলো;—এ কি সহা যায়!

সেই জায়া আদরিণী,
তারে করি অভাগিনী,
হিমু, গুলু, শকুন্তলা, কাঁদায়ে সবায়,
সত্যই কি গেলে তুমি
ত্যজি এ মরত-ভূমি!—
সে পূজ্য শ্বশুরে দিলে পুত্র-শোক, হায়!

তুমি ত পরের ছেলে,
"মা" বলিয়া কেন এলে,
কেন বা মমতা মায়া দিয়াছিলে ঢালি?—
জানেন অন্তরযামী
কিছুই চাহি নি' আমি,
তবু দিলে, সেধে দিলে হিয়া করি খালি!

যে ক'দিন বেঁচে থাকি,
সেই মুখ মনে আঁকি
র'ব সদা—মহীন্দ্র যে নহে ভুলিবার!
আহা! সে দুরন্ত-পণা,
আবদার, ভঙ্গি নানা!—
সে যে কভু বুঝিত না পর আপনার!

তাই আজি বাঁধ টুটে,
শোকের লহরী ছুটে,
জানি না নিঠুর ছেলে বসি কোন্‌খানে,
দুরন্ত বালক-প্রায়,
দেখিছ হাসিছ হায়!—
নিলে এই প্রতিশোধ সেই অভিমানে!

সরস লেখনী তার,
গাঁথিত কবিতা-হার,
সে যে রে স্বভাব-কবি, সুপুত্র বাণীর!
বিজনে কুসুম ফুল্ল,
কে বোঝে তাহার মূল্য,
নিভৃতের নদ সে যে সুধা-মাখা নীর!

কত দিন "দুই ছত্র"
লিখিতে পারি না পত্র,
তাই কি করেছ রাগ হে প্রিয়দর্শন?—
তাই কিছু নাহি ব'লে,
একেবারে গেছ চ'লে,
আঘাতিয়া শক্তিশেল ভেঙে চূরে মন?

যাও বৎস! থেক সুখে,
চির শান্তি পাও বুকে,
অজর অমর দেশে;—তবু মনে লয়,
আমরা ত সেথা নাই—
ভাল কি লাগিবে তাই?
সেথা কি পরের ছেলে আপনার হয়? *

শ্রী'বীরকুমারবধ'-রচয়িত্রী।

---

* বামাবোধিনীর পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট ৺মহীন্দ্রমোহন চন্দ মহাশয় সুপরিচিত। ইনি এবং ইঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ বহুদিবসাবধি কবিতা ও প্রবন্ধাদি দ্বারা বামাবোধিনীর উৎকর্ষ-সাধনে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল-বিয়োগে আমরা যার পর নাই দুঃখানুভব করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে সান্ত্বনা প্রদান করুন, ইহাই আমাদিরের একমাত্র প্রার্থনা। সঃ।

গানের স্বরলিপি ।

মিশ্র বেহাগ—খাম্বাজ । একতালা ।

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো ।
আবার কেন ঘরের ভিতর, আবার কেন প্রদীপ জ্বালো !
রাখিস্ না আর মায়ায় ঘেরে, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দে রে—
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই, এমন রাত আর পাবো না লো !
পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে ;
থামা এখন বীণার ধ্বনি, চুপ করে' শোন্ বাইরে এসে ;
বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মত ভালোবেসে—
এখন যদি মর্ত্তে না পাই, তবে আমার মরণ ভালো !
সাঙ্গ আমার ধূলা-খেলা—সাঙ্গ আমার বেচা-কেনা ;
এয়েছি করে' হিসেব নিকেশ যাহার যত পাওনা দেনা ।
আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—ওমা কোলে তুলে নে না ;
যেখানে ঐ অসীম সাদায়—মিশেছে ঐ অসীম কালো ।

কথা ও সুর-- ৺মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।　　স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ।

০　　　১　　　২´　　　৩　　　০　　　১
পা ধা না । না না না ।I না না র্সা । না ধা ধা । ধা না ধা । পক্ষা -া গরা I
নী ল আ　কা শে র　অ সী ম　ছে ০ য়ে　ছ ড়ি য়ে　০ গে ০ ছে ০

২´　　　৩　　　০　　　১
I রগা রগা মপা । পক্ষা গা -া । রগা রগা পা । ক্ষা -া পা I
চাঁ০ দে০ ০র　আ০ লো ০　০আ বা০ র　কে ০ ন

২´　　　৩　　　০　　　১
I পা পা পা । পা পা পা । ক্ষা ক্ষা ক্ষপা । গা রা -া I
ঘ রে র　ভি ত র　আ বা ০ র　কে ন ০

২´　　　৩　　　০　　　১
I রগা রগা ক্ষপা । ক্ষা -া গা । র্ঋা র্ঋা র্ঋা । র্ঋা র্ঋা র্ঋা I
প্র০ দী০ ০প　জ্বা ০ লো　রা খি স্　না আ র

২´　　　৩　　　০　　　১
I র্রা র্রা র্রা । র্রা র্রা -া । রা র্গা র্রর্সা । না ধা না I
মা য়া য়　ঘে রে ০　স্নে হে ০র　বাঁ ধ ন

২´　　　৩　　　০　　　১
I পধা পধা র্সা । র্সা র্সা র্সর্রনা । না না র্সা । ধা ধা না I
ছিঁ০ ড়ে০ ০　দে রে ০০০　উ ধা ও　হ য়ে ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা ধপা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা। ক্ষা পা পা। ধা ঋর্া ঋর্া I
মি শি ০য়ে ০ যা ই এ ম ন রা ত আ

২´ ৩
I ঋর্া র্রা র্রা। -া র্রর্গর্রা র্সনধা II
র পা বো ০ না০০ লো০০

০ ১ ২´ ৩ ০
ব্রা রগা রগা। পা পা পা II পা পা পা। ধা ক্ষা ক্ষক্ষা। ক্ষপা পক্ষা -া I
পা পিয়া ০র ঐ আ কু ল তা নে ০ আ কা০ ০শ ভু০ ০
সা ০০ ০ঙ্গ আ মা র ধু লা ০ খে লা ০০ সা০ ০ঙ্গ ০

১ ২´ ৩ ০ ১
গা রা রগা I রগা পা -া। পক্ষা গা -া। ধা না -া। না না না I
ব ন গে০ ল০ ০ ০ ভে০ সে ০ থা মা ০ এ খ ন
আ মা ০র বে০ চা ০ কে০ না ০ এ য়ে ছি ক ০ রে

২´ ৩ ০ ১
I না নর্সা র্সা। না ধনা সনধা। ধা না ধা। ধা পা রা I
বী ণা০ র ধ্ব নি০ ০০০ চু প্ ক রে ০ শো
হি সে০ ব নি কে০ ০০শ যা হা র য ত পা

২´ ৩ ০ ১
I রা গা ধা। ধা ধা ধা। ধপা ধা ঋর্া। ঋর্া ঋর্া -া I
ন বা ই রে এ সে ০বু ক এ গি য়ে ০
ও না ০ দে না ০ ০আ জি ব ড় ০ ই

২´ ৩ ০ ১
I র্রা র্রা -া। র্রা র্রা র্রা। র্রর্গা র্রা র্সা। না না ধা I
আ সে ০ ম র ণ মা০ য়ে র ম ত ০
শ্রা ০ স্ত আ মি ০ ও০ মা ০ কো লে ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা র্সা। র্সা র্রা ননা। না না র্সা। ধা ধা না I
ভা লো ০ বে সে ০০ এ খ ন য দি ০
তু লে ০ নে না ০০ যে খা ০ নে ঐ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা ধা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা। ক্ষা পা -া। ঋর্া ঋর্া -া I
ম০ র্ তে না পা ই ত বে ০ আ মা র
অ সী ম সা দা য় মি শে ০ ছে ঐ ০

২´ ৩
I র্রা র্রা র্রা। ঋর্রর্গা ঋর্রর্সা র্সনধপা II II
ম র ণ ভা০০ লো০০ ০০০০
অ সী ম কা০০ লো০০ ০০০০

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অকস্মাৎ আনন্দ-বেদনার উচ্ছ্বসিত প্লাবনে নমিতার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বহুদিনের পর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অসঙ্কোচ আবেগে ক্ষুদ্র শিশুর মত সমিতাকে সে বুকে টানিয়া লইয়া, কম্পিত ওষ্ঠে তাহার ললাট চুম্বন করিল। অবাধ্য চক্ষের জল অজ্ঞাতে ঝর্ঝর্ করিয়া সমিতার কেশরাশির উপর ঝরিয়া পড়িল। নমিতার কণ্ঠস্বর ভাল ফুটিল না, তথাপি সমিতা তাহার অস্ফুট উক্তি শুনিতে পাইল,—"আজ যদি বাবা থাকৃতেন, সেলুন!"

সমিতা ছাত্রী-জীবনে এইবার সবে মাত্র পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, আনন্দ-উত্তেজনায় আজ তাহার মন দৃপ্ত প্রফুল্ল, আজিকার আহ্লাদের মধ্যে হয় ত স্নেহময় পিতার অভাব-বেদনা তাহার কিশোর চিত্তের নির্ম্মল অঙ্কে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই, কিন্তু এতক্ষণে, বোধ হয়, নমিতার উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ-সংঘাতে সেই সুপ্ত বিয়োগ-বেদনা তাহার মনকে বিচলিত করিয়া তুলিল। সরিয়া দাঁড়াইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া, চট্ করিয়া জামার আস্তিনে চোখের জলটুক্ শুষিয়া মুছিয়া, রুদ্ধ কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিবার জন্য কাশিয়া, ভাঙ্গা গলায় সে বলিল, "দিদি, বইয়ের লিষ্ট এনেছি; খান-তিনেক নতুন বই চাই; বাকী ছোড়্দার কাছে পাব।"

নমিতা আঁচলের খুঁটে চোখের কোণ মার্জ্জনা করিতে করিতে হাসি-মুখে বলিল, "আজই আনিয়ে দেব;—আর, এবার তোকে কি 'প্রাইজ' দোব, বল্ ত?—"

ব্যস্ত হইয়া সমিতা বলিল, "না দিদি, না;—তুমি যে হাতের রুলি দু'গাছা,—নাঃ, ও কিছুতেই খুল্তে পাবে না; গয়না ফয়না চাই নে;—যদি একান্ত কিছু দাও, তা' হ'লে—।"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল,"তা' হ'লে কি—?"

ইতস্ততঃ করিয়া সমিতা কণ্ঠস্বর নামাইয়া সলজ্জভাবে বলিল, "যদি কোথাও বাড়্তি টাকা পাও ত আমায় ছোড়্দার মত একটা 'ফাউন্‌টেন্ পেন্' কিনে দিও,—।"

ন। তথাস্তু, আচ্ছা। মাকে পাশের খবরটা দিয়ে এসেছিস্?

স। আমি আগেই তোমার কাছে এসিছি। সুশীল সদর দুয়ার থেকে মার কাছে ছুটেছে; মা এতক্ষণ—।

সমিতার স্কন্ধে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া, সস্নেহ ভর্ৎসনার স্বরে নমিতা বলিল, "দিনে দিনে ভারী বোকা হয়ে উঠ্ছিস্! আগে মাকে খবর দিয়ে তবে আমাদের কাছে আস্তে হয়।—যা এখুনি—।"

লজ্জিতা সমিতা তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। দ্বারের বাহিরেই বিমলের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। বিমল কি এক-খানা বইয়ের জন্য স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়াছিল। সমিতাকে অত ব্যস্তভাবে ছুটিতে দেখিয়া সে বলিল, "কি রে শেলী, খবর কি?"

সমিতা থমকিয়া দাঁড়াইল; উৎসুকভাবে ছোড়্‌দাকে সুখবরটা শুনাইতে উদ্যত হইয়া, তখনই দিদির কথা স্মরণ হওয়ায়, ঢোক্ গিলিয়া থামিল। তাহার পর দ্রুতস্বরে বলিল, "একটা খবর আছে, ছোড়্‌দা! এসে বল্‌ছি—।" দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া সে আবার ছুটিল।

বিমল বিস্মিত হইয়া তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার আগেই নমিতা সস্নেহে কৌতুকস্মিত-বদনে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি তার আগেই খবরটা বলে দিই :—ছোড়্‌দা অনেক খেটেছে; ওর গুরু-দক্ষিণাটা ফাঁকী দিলে চল্‌বে না।—সেলুন এবার ক্লাশের মধ্যে ফাষ্ট হয়েছে, বিমল!"

"বটে? তা' হলে ত মানুষ হয়ে গেছিস্ রে! আচ্ছা, আমি স্কুল থেকে ফিরে আসি, তারপর সব জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো।" সমিতাকে এই কথা বলিয়া বিমল ঘরে ঢুকিল ও তাহার বইয়ের আল্‌মারি খুলিয়া প্রয়োজনীয় পুস্তক-খানি লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সহসা তাহার স্বভাবচঞ্চল দৃষ্টি টেবিলের উপরকার চিঠিখানার উপর পড়িল। উৎসুক-ভাবে সে বলিল, "কা'র চিঠি দিদি?"

চিঠির কথা তখন নমিতা ভুলিয়াই গিয়াছিল। বিমলের প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ডাক্তার মিত্রের—"। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বিষম খাইয়া কাশিয়া উঠিল ও ত্রস্তভাবে চিঠিখানা উল্টাইয়া হাতের নীচে চাপা দিয়া, খুব সহজভাবে উত্তর দিল—"এইখানকারই একটি ভদ্রমহিলা লিখ্‌ছেন; তাঁর কি দরকার আছে, তাই একবার সময়-মত গিয়ে দেখা কর্‌তে অনুরোধ করেছেন।"

নমিতা এমনই ভাবে কথা-কয়টি কহিল যে, উক্ত ভদ্রমহিলাটি যে তাহার কিছুমাত্রও পরিচিতা নহেন, এ-কথাটুকু বিমল আদৌ অনুমান করিতে পারিল না। সুতরাং, নিশ্চিন্ত হইয়া সে ছোট একটি "অ—" বলিয়া, নিজের কাজে চলিয়া গেল।

বিমল স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু নমিতা নিজের মধ্যে কেমন যেন দ্বৈধগ্রস্ত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ঘরের বা বাহিরের এমন কোনও পরামর্শ, এমন কোনও প্রয়োজন নাই, যাহা বিমলের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। বিমল বরং অনেক সময় পাশ কাটাইয়া চলিতে চায়, কিন্তু তাহার ন্যায়ান্যায় বোধকে যথাযথভাবে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার জন্য নমিতা নিজেই প্রায়শঃ উপর-পড়া হইয়া তাহাকে সেই ভিড়ের মধ্যে টানিয়া আনে। তবে আজ কেন নমিতা তাহার কাছে এই ব্যাপারটা চাপিয়া গেল? বিমলের প্রশ্নের উত্তরে সে বেশ সহজভাবেই পত্র-লেখিকার প্রয়োজনটুকু ব্যক্ত করিতে পারিল, কিন্তু তাঁহার পরিচয়টুকুর বেলা, কেন আপনা হইতে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল?

ঠিক্। ঐ পরিচয়টাই শুধু যত কুণ্ঠার মূল! ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর নামে শুধু ডাক্তার মিত্রকেই মনে পড়িতেছে, ডাক্তার মিত্রের চরিত্রটাই স্মরণ হইতেছে!···যদিও ডাক্তার মিত্র এ-পর্য্যন্ত নমিতার সম্পর্কিত ব্যাপারে কখনও অন্যায় আচরণ প্রকাশ করেন নাই, অথবা করিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু তবুও তিনি যে কি প্রকৃতির মানুষ, তাহা নমিতার অগোচর নাই! তাই তাঁহার সম্পর্ক-সান্নিধ্যে অগ্রসর হইতে তাহার সাহস হয় না!

নিজের চিন্তার মাঝখানে নমিতা নিজেই চমকিয়া উঠিল! এতবড় প্রকাণ্ড সত্যকে ইহার পূর্ব্বে সে একদিনও অনুভব করিবার অবকাশ পায় নাই! ডাক্তার মিত্রকে সে ভয় করিয়া থাকে; তাই নিজের অজ্ঞাতে তাহার মন ডাক্তার মিত্রের সংস্রব এড়াইয়া যথাসম্ভব দূরে দূরে—অন্তরালে থাকিয়া চলে। তাহা না হইলে, তাহার দৃষ্টিতে অগ্রজ অনিলও যেমন, স্বরসুন্দরও তেমনই; হাঁসপাতালের সত্যবাবুও তাই; এবং ডাক্তার মিত্রও তাহা ছাড়া আর কিছু অপূর্ব্ব বস্তু নহেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায়-বিগর্হিত ব্যবহারগুলাই তাঁহার স্বভাবকে অস্বাভাবিক ক্রূরতায় নিন্দনীয় ও অপ্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছে! কিন্তু শুধু তাহা হইলেও রক্ষা ছিল,—ধৈর্য্যের তেজ থাকিলে মানুষের ক্রোধকে সহ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু ক্রোধের ঊর্দ্ধস্থ দুরন্ত রিপুকে স্বেচ্ছায় প্রশ্রয় দিয়া যে মানুষ পাশবিক আনন্দে—!

নমিতার চিন্তা এইখানে সহসা স্তম্ভিত হইল। তাহার আপাদ-মস্তকে দৃপ্ত বিদ্রোহিতা যেন হঠাৎ তীব্র হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিল! ভাব-প্রবণ হৃদয়ের সমস্ত প্রফুল্লতা কোমলতা হঠাৎ উগ্র ধাক্কা খাইয়া বেদনায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল!—অসহ্য, অসহ্য! মানুষের নির্ব্বোধ মূঢ়তার সব ত্রুটি ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা! না! একেবারে অসহ্য!

নমিতার চিন্তাশক্তি নিজের মধ্যেই ক্ষুব্ধ অপমানে শুব্ধ হইয়া গেল; চিত্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; উত্তেজনা-উষ্ণতায় অর্দ্ধ-আর্দ্র মস্তকের চুলগুলা আবার ঘামে পুরামাত্রায় ভিজিয়া উঠিল। ভীষণ চাঞ্চল্যে নমিতার ইচ্ছা হইল, সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়ে, কিন্তু সে সঙ্কল্প-মাত্রেই সে তখনই যেন কেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল! মনে হইল, এখনই যদি ভাই-বোনেরা কেহ আসিয়া সামনে দাঁড়ায়, তাহা হইলে এই অবস্থায় কেমন করিয়া নমিতা দৃষ্টি তুলিয়া তাহাদের সহিত চোখোচোখী করিবে!

অধীর কম্পিত চরণে নমিতা ঘরের বাহিরে আসিল; নিঃশব্দে বাড়ীর উঠান পার হইয়া বাহিরের নির্জ্জন বারেণ্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বারেণ্ডার সম্মুখে, বৈশাখের তৃতীয় প্রহরের বিষম রৌদ্রতপ্ত পথ সম্পূর্ণ-রূপেই জন-মানব-শূন্য;—অদূরে মোড়ের মাথায় কাঁটাল গাছের তলায় শুষ্ক পত্রগুলা খড়্ খড়্ মড়্ মড়্ শব্দে মাড়াইয়া একটা ছাগল হেঁট-মুখে আহার খুঁজিয়া ফিরিতেছিল; আর কোন দিকে কেহ নাই,—কিছু শব্দ নাই। দ্বিপ্রহরের অগ্নিজ্বালানিভ উষ্ণ বাতাস থাকিয়া থাকিয়া হু হু করিয়া বহিতেছিল।

পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে করিতে নমিতা অন্যদিকে চিন্তাগতি ফিরাইয়া বিক্ষিপ্ত মনটা শান্ত করিবার চেষ্টা করিল। ক্ষণেক পরে আপন মনেই নিঃশব্দে হাসিল,—কি নির্ব্বোধ সে! সত্যই ত, তাহার এত রোখ্ কেন? ডাক্তার মিত্র ত নমিতার পিতাও নহেন, ভ্রাতাও নহেন; অধিক কি, রক্ত-সম্পর্কে ধরিতে গেলে, তিনি ত সম্পূর্ণই 'পর'! তাঁহার রুচি সুন্দর হউক, কুৎসিত হউক, নমিতার তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে কেন তাঁহার চরিত্র-কুৎসা নমিতার মনকে ক্লিষ্ট ও নিষ্পীড়িত করে?

কিন্তু না, ঐ একটি মাত্র মুখ-চেনা মানুষ নহে। উঁহার মত প্রত্যেক উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের নর-নারীর জন্ত নমিতার মন ঠিক্ এমনই ক্ষুব্ধ বেদনা অনুভব করে! মানুষের এ দৌর্ব্বল্য-কলঙ্কে, হায়, মানুষ হইয়া কেমন করিয়া সে বলিবে—'আমার তাহাতে কি?' না হউক্ তাঁহাদের লইয়া সংসার করিতে, না হউক্ তাঁহাদের লইয়া সমাজে থাকিতে,—তবু তাঁহাদের হীনতার কাহিনী, নীচতার স্মৃতি নমিতার মনকে কতখানি বেদনার কশাঘাতে জর্জ্জরিত করে, তাহা নমিতা জানে, আর অন্তর্যামী জানেন!

শব-ব্যবচ্ছেদের যন্ত্রাদি প্লেটের উপর সাজাইয়া রৌদ্রদগ্ধ পথের উপর দিয়া পুড়িতে পুড়িতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁস্‌পাতালের লাল্লু ছুটিয়া আসিতেছিল। নমিতাকে দেখিয়া, কপালে হাত ঠেকাইয়া সে বলিল, "সেলাম মাইজী!"

নমিতা চমৎকৃতা হইয়া দাঁড়াইল! লাল্লুর অভিবাদনের কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। সভ্যতার খাতিরে হাঁসপাতালে সে নমিতা প্রভৃতিকে কখনও 'মেম্-সাব্' বলিত, কখনও বা অভ্যাস-বশে 'মাইজী' বলিত। কিন্তু আজ সেই পুরাতন সম্ভাষণ নমিতার কানে হঠাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও নূতন বোধ হইল! এমন মিষ্ট, এমন মনোরম অভিবাদন সে যেন আর কখনও শুনে নাই! তাহার সমস্ত হৃদয় অপূর্ব্ব স্নিগ্ধরসে ভরিয়া উঠিল। বয়সের অজুহাতে যুবক লাল্লুর নিকট তাহার যেটুকু সঙ্কোচের ব্যবধান ছিল, তাহা সহসা যেন উচ্ছল স্নেহের মুক্ত প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া ভাসিয়া গেল! বিস্মিতা নমিতা চাহিয়া দেখিল, ঐ তরুণ বদনের কোনওখানে উদ্দাম যৌবনের উগ্র জ্বালা নাই;—কোন বিভীষিকা সেখানে তিষ্ঠাইবার স্থান পায় না! সেখানে শুধু কৈশোরের লালিত্য, শৈশবের কমনীয়তা স্নিগ্ধ আনন্দে বিরাজমান!—এক নিমিষে নমিতার সমস্ত প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল!—ক্ষুদ্র হউক, তবু এই ত মানুষ! অগ্রসর হইয়া সস্নেহে নমিতা বলিল, "কোথা যাচ্ছ এত রৌদ্রে, লাল্লু?"

নমিতার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই হউক্, অথবা বারেণ্ডার শীতল ছায়ায় কথঞ্চিৎ ক্লান্তি অপনোদনের আশাতেই হউক্, হাঁপাইতে হাঁপাইতে লাল্লু বারেণ্ডায় উঠিল; প্লেট্‌টা নামাইয়া, কোমরে জড়ান গামছা খুলিয়া মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, পুলীশের মারফাৎ একটা জলে ডোবা পচা মড়া আসিয়াছে। মৃত্যুটা উদ্বন্ধন কি বিষপান, না কি?—এইরূপ একটা সন্দেহজনক জনরব উঠিয়াছে! অতএব ব্যবচ্ছেদ-ব্যতিরেকে মৃতদেহটার সদ্গতি অসম্ভব। সুতরাং, কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থা মত মৃত দেহ অদূরে মাঠে, শব-ব্যবচ্ছেদাগারে আনীত হইয়াছে। ডাক্তার মিত্রও শীঘ্র সেইখানে যাইতেছেন, তাই লাল্লু আগে আগেই যন্ত্রের বোঝা লইয়া ছুটিয়াছে। কি-জানি, বিলম্বের ত্রুটিতে যদি খাপ্পা হইয়া ডাক্তারবাবু তাহার 'শির্‌তোড়েঙ্গা' বলিয়া বায়্‌না ধরিয়া বসেন, কে বলিতে পারে?

পূর্ব্ব-কথা নমিতার স্মরণ হইল; বুঝিল সেইদিনের পর হইতে লাল্লু সতর্কভাবে ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে, শুধু একহাত নহে,—পুর একশত হাত মাপিয়া চলিতেছে। উদ্যত বজ্র যে-কোনও মুহূর্ত্তে তাহার মাথার উপর অনিশ্চিতরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, তাহ

সে সুনিশ্চিত বুঝিয়া লইয়াছে।—নমিতা কোন কথা কহিতে পারিল না, নীরবে সকরুণ ছল্‌-ছল্‌ নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

বক্তব্য শেষ করিয়া লাল্লু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এ-দিক্‌ ও-দিক্‌ চাহিয়া বলিল,"আপ্‌কো নোকর লোগ্‌ কাঁহা হৈ ?"

নমিতা প্রশ্ন করিল, "কেন লাল্লু ?"

সঙ্কুচিত হইয়া লাল্লু বলিল, "থোড়া পিয়াস্‌ লাগল্‌ ভৈ ; এক চুক্‌ পানি,—!"

সাগ্রহে নমিতা বলিয়া উঠিল, "আমি এনে দিচ্ছি, তুমি দাঁড়াও—।"

ব্যস্ত হইয়া লাল্লু বলিল, "নেই নেই, আপ্‌কো নোকর্‌—।"

গমনোদ্যতা নমিতা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে বলিল, "তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, লাল্লু ! হলেই বা, আমি এনে দিচ্ছি।—'মাই-জী'র হাতে কি পানি খেতে নেই ?"

শিশুর মত সলজ্জ বিনয়ে ঘাড় ফিরাইয়া হাসিয়া, লাল্লু সসৌজন্যে বলিল, "বহুৎ, খুব।"

কৃতার্থ আনন্দে নমিতার সমস্ত বুক সুগভীর স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

শঙ্কর ও গৌরীপাঁড়ে ও-দিকের ঘরে ঘুমাইতেছে ; লছ্‌মীর মা ও অপর সবাই মাতার ঘরে কথা কহিতেছে, শুনিতে পাওয়া গেল ; কিন্তু কাহাকেও ডাকিতে নমিতার ইচ্ছা হইল না। নিজেই এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিল, মাজা ঘটি বা গেলাশ একটাও পাইল না,—সব উচ্ছিষ্ট ক্ষেত্রে পড়িয়া আছে ! দ্বিধা মাত্র না করিয়া নমিতা নিজেই একটা গেলাশ টানিয়া লইয়া, একমুঠা ছাই ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিল। পরে নিজের হাত-পা ধুইয়া, ঘরের কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "খাও লাল্লু—!"

হাঁসপাতালে প্রয়োজন-ব্যপদেশে অনেক সময় ইহাদের সহিত হাতে-হাতে জিনিস-পত্র নেওয়া-দেওয়া করিতে হয়। সুতরাং, অভ্যাস-বশে নমিতার এ-সম্বন্ধে সঙ্কোচ জড়তা কাটিয়া গিয়াছিল। সেইজন্যই, বোধ হয়, সে লাল্লুর হাতে দিবার জন্য গেলাশটা তুলিয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু লাল্লু কুণ্ঠিতভাবে পিছু হটিয়া গেল। পয়সার খাতিরে গোলামীর ক্ষেত্রে যে সম্মানকে সে বাধ্য হইয়া লঙ্ঘন করিয়া চলে, এখানে—মুক্ত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, তাহার উচ্চতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে, বোধ হয়, তাহার প্রবৃত্তি হইল না ; নতশিরে পিছাইয়া ভূমির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল,—"জী, হিঁয়া ধর্‌ দিজিয়ে।"

নমিতা ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিল ; কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিনা বাক্যে গেলাশটি নীচে নামাইয়া দিল। হাঁ, ঠিক্‌, মাতাপুত্রের সম্পর্ক !—যাহা সে কয় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে প্রত্যক্ষভাবে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিল, তাহা শুধু অন্তরের সম্পত্তি ! বাহিরের লৌকিক ব্যবহার লোকাচার-সম্মত বিধানানুসারেই অবশ্য প্রতিপাল্য ; ইহাকে লঙ্ঘন করা আদৌ শোভনীয় নহে।

বাঁ-হাতে গেলাশ ধরিয়া ডান্‌ হাতে জল ঢালিয়া, লাল্লু এক নিঃশ্বাসে চোঁ চোঁ করিয়া সমস্ত জলটুকু শুষিয়া লইল; তারপর গেলাশটা দ্বারের চৌকাঠের পাশে নামাইয়া রাখিল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, "আপ্‌কো তক্‌লীফ দিয়া !"

ঘরের ক্লক্-ঘড়িতে টং টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। ব্যস্ত লাল্লু, "ডাংদার বাবুকা আনেকো 'টাইম' হো গিয়া ;—সেলাম মেম-সাব্", বলিয়া অভিবাদন জানাইয়া যন্ত্রের প্লেট তুলিয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। নমিতাও মাথাটা খুব ঝুঁকাইয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া সেলামের প্রত্যুত্তর জানাইয়া, দ্রুতগমন-রত লাল্লুর পানে নীরবে ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আহা রৌদ্রের বড় তেজ !

পরক্ষণে নমিতার মনে পড়িল, ঠিক্ এই রৌদ্রে অমনই ভাবে পুড়িতে পুড়িতে ডাক্তার মিত্রকেও ঐ পথে কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইতে হইবে ! এই ভাবিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। মনের প্রচ্ছন্ন তিক্ততার উপর অজ্ঞাতে সুকোমল সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপ যেন অমৃত ঢালিয়া দিল। বাস্তবিক, এমন সুন্দর শিক্ষিত, উচ্চাঙ্গের কর্ম্মঠ, গুণী ব্যক্তি। —ইহাঁকে কে না সম্মান করিবে? কিন্তু ইহাঁর হৃদয়ের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলে, নমিতার অন্তরের শ্রদ্ধা আপনা হইতেই ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, ইহাই যে বড় পরিতাপের বিষয় ! সংসারে মূর্খের অভাব নাই, এবং তাহাদের মূর্খতা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং, তাহাতে দুঃখের বিষয় যথেষ্ট থাকিলেও দুঃখ করিবার মত অবকাশ বেশী নাই। কিন্তু দেশের এই সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানহীনের মত নিরর্থক খেয়ালের বশে অনর্থক শয়তানী খেলা !—ইহা যে বড় মনস্তাপ !

গেলাশটি তুলিয়া লইয়া নমিতা ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

(১৩)

মিনিট পনের পরে চুল পরিষ্কার করিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া, মুছিয়া, জামা-কাপড় বদলাইয়া, নমিতা বহির্গমনের বেশে সুসজ্জিত হইয়া মাতার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

কক্ষতলে মাদুরের উপর বসিয়া নমিতার মাতা সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতেছিলেন; সুশীল তাঁহার হাঁটুর উপর হেলিয়া বসিয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল। নমিতা তখন স্কুলের জামা-কাপড় ছাড়িয়া পাশের ঘরে ঝাড়ন লইয়া বিছানা-মাদুরের সুব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিল। লছ্মীর মা কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়াছিল।

নমিতা ঘরে ঢুকিতেই মাতা মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, "ক'টা বাজ্ল নমি? এর মধ্যে কি হাঁস্পাতালে বেরুতে হচ্ছে?"

প্রসন্নমুখে খুব সহজভাবে নমিতা উত্তর দিল, "না, হাঁসপাতালে নয়। আমাদের ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছি।"

মাতা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন?"

নমিতা উত্তর দিল, "কি দরকার আছে, তিনি তাই ডেকে পাঠিয়েছেন!" সুশীলের মুখ-পানে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, "সিসিল, বেড়াতে যাবি?"

আগ্রহচ্ছন্দে, "হুঁ" বলিয়া সুশীল তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিয়া পাশের ঘরে জামা-কাপড় পরিতে চলিয়া গেল। নমিতা মাদুরের প্রান্তে মাতার পায়ের কাছে বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মা, সেলুনের বই কিন্‌তে হবে; বিমলেরও জুতো ছিঁড়ে গেছে! সংসার-খরচের টাকা থেকে এ-মাসে কিছু বাঁচ্‌বে কি?"

ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা ম্লান

ভাবে বলিলেন, "ফুলুবে কি মা! এ-মাসে বাড়্‌তি খরচ বড় বেশী হয়ে গেছে। তাই হিসেব কর্‌ছিলুম! ঐ ছেলেটির অসুখের খরচে,—বল্‌তে নাই, এবার চৌদ্দ টাকার ওপর পড়েছে। গেল মাসের কিছু ছিল, তাই টানাটানি করে কুলিয়ে গেছে; না হ'লে ধার ভিন্ন গতি ছিল না।"

নতদৃষ্টিতে চাহিয়া, বাঁ-হাতের রুলি খুঁটিতে খুঁটিতে নমিতা বলিল, "কিন্তু এ খরচগুলো যে চাই-ই মা! মিস্ স্মিথ্ সময়-অসময়ে অনেক অনুগ্রহ কোরে থাকেন। কিন্তু আর ধার কোর্ত্তে পারিনে। আপ্‌নি যদি কিছু না মনে করেন, তা হ'লে এই রুলি দু'-গাছা—।"

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে মাতা বলিলেন, "ঐ দু'গাছাই ত শেষ সম্বল আছে, নমি! কিন্তু ওর জন্যে ব্যস্ত হওয়া কেন? সংসারে সময়-অসময়ের জন্যে আপদ্-বিপদের জন্যে কিছু সংস্থান রাখা চাই বই কি।"

সংসারে খরচের টানাটানির মুখে নমিতা আরও দুই-একবার নিজের ঐ অনাবশ্যক অলঙ্কারটা এইরূপে সদ্ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু মাতার আপত্তিতে পারিয়া উঠে নাই। সে জানিত, তাহার এই সামান্য প্রস্তাবটা মাতার মনে কতখানি কঠিন আঘাত দান করে! কিন্তু উপায় নাই! অভাবের মুখে বাধ্য হইয়া স্বাভাবিক অনিচ্ছাকে তাই বলিদান করিয়া চলিতে হয়। আজিও সে অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত তাহার মন্তব্য ব্যক্ত করিতে আসিয়াছিল. কিন্তু মাতা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করাতে সে সুবিধা পাইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক্ বলেছেন মা! আমিও ক'দিন থেকে ভাব্‌ছি কিছু সংস্থান রাখা চাই। এই রুলি দু'গাছা কোন কাজের জিনিস নয়, হাতে গুটিয়ে কাজ কর্‌বার সময় ভারি অসুবিধা ঠেকে; একে অনর্থক রেখে কোন লাভ নেই। দিই একে বিক্রী করে। যে ক'টা টাকা পাওয়া যায়, তা থেকে এদের জুতো আর বইয়ের খরচ কেটে নিয়ে, বাকী টাকা 'সেংভিং ব্যাঙ্কে' জমা করে দিই।"

বড় দুঃখে মাতার মুখে একটু হাসি ফুটিল; বলিলেন, "কি দুষ্টু বুদ্ধি তোর নমি! তবু ওটা বিক্রী করবি-ই?—না। আমি ও বিক্রী কর্‌তে দোব না; 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কে'র টাকা রাত-দুপুরে দরকার হ'লে পাবি? আমি যদি হঠাৎ মরে যাই, সে সময় শুধু-হাতে কার কাছে মড়া ফেলার খরচ ভিক্ষে কর্‌তে যাবি বল্ ত?—আমি বলছি, ও দু'গাছা সেই জন্যে থাক্—।"

নমিতা বুঝিল ইহাই যথেষ্ট!—ঘাড় হেঁট করিয়া সে ক্ষণেক নীরব রহিল; তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, হাসির ছলে মনের বেদনা ঢাকা দিয়া বলিল, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে এত দিন এত অসুবিধে যখন আপ্‌নি কেটে গেছে, তখন এ-ক্ষেত্রেও তাই হবে।— আচ্ছা অন্য চেষ্টায় রইলুম।"

ঝাড়ন হাতে করিয়া সমিতা সুশীলের সহিত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দিদি, তুমি ডাক্তার মিত্তিরের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছ? আচ্ছা, তিনি কি ছেলেটির কথা বল্‌বার জন্যে তোমায় ডেকেছেন?"

নমিতা বলিল, "অসম্ভব। ছেলেটি আমাদের বাড়ীতে আছে, তা তো তাঁরা কেউ জানেন না। তেওয়ারীকে বারণ করা হয়েছে।

সে ভদ্রলোক এ কথা নিয়ে কখনই হৈ চৈ করবে না, এটা ঠিক্।"

সুশীল উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কিন্তু ও-বেলা, সে বিছানা ছেড়ে একা বাইরের ঘরে গিয়েছিল। নির্ম্মলবাবু তাকে দেখ্‌তে পেয়ে সব জিজ্ঞাসা করলেন যে!"

নমিতা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সমিতা বলিল, "ডাক্তারবাবুর স্ত্রী যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন, কি বল্‌বে?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া নমিতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ক্ষেত্রে কার্য্যং বিধীয়তে।" দেখা যাক্, দরকার হয়, সত্যকে চেপে যাব; কিন্তু মিথ্যে দিয়ে তাকে বিকৃত কর্ব্বো না, এটা নিশ্চয়। বেরিয়ে যখন পড়েছি, তখন এগিয়ে যাওয়াই ঠিক্।" (সুশীলের প্রতি) "আয় সিসিল!"—(সমিতার প্রতি) ওরে সেলুন, বেলা চার্‌টের সময় ছেলেটিকে এক দাগ ওষুধ খাওয়াস্, তার পর ঠিক্ ছ'টায়!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের পরলোকগমনে

শোকোচ্ছ্বাস।

এ কি শুনি অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,—
নাহি মম কাকাবাবু স্নেহ-পারাবার,
নাহি ব্যথিতের আর স্থান জুড়াবার!

আজ দুই মাস গত,
নূতন মণি অবিরত,
কাঁদেন সদাই পড়ে ভূমিতে লুটায়া,
তাঁহার যে কত কষ্ট দেখনা চাহিয়া॥

পুত্র-শোকে ভাঙ্গা বুক,
চাহিয়া তোমার মুখ,
সংসারের একধারে আছেন বসিয়া,
উচিত হ'ল না যাওয়া তাঁহারে ফেলিয়া॥

'ধ্রুব'-হারা হ'য়ে শোকে,
বড় বেজেছিলা বুকে,
তাই কি চলিলে দেব, পুত্র-সম্ভাষণে,
যেখানে বিচ্ছেদ নাই অনন্ত মিলনে!

বধূটী বাপের বাড়ী,
যাইলে তাহারে ছাড়ি;
কখন ও থাকিতে দেব, পার নিকো হায়,
কন্যা-সমা পালিতেন স্নেহ মমতায়॥

কত স্নেহ সবাকারে,
ছিল যে তব অন্তরে,
এমন মমতা দেব কিছু না রাখিলে,
ব্যথা দিতে সবাকারে ব্যথিত না হলে॥

যাইলে তোমার কাছে,
যেন কত তৃপ্তি আছে,
আয় মা "সুমনি" এলি আয় মাতা আয়,
বলিতে আদর করে স্নেহ মমতায়!

তোমার স্নেহের ডোরে,
বেঁধেছিলে সবাকারে,
শত্রু মিত্র সবে মিলে তব গুণ গায়,
আত্মীয় স্বজনগণ করে হায় হায়!

জ্ঞান-কর্ম্মে অনুপম,
কার নিষ্ঠা তব সম,
কে জানে শাসন হায় এমন করিয়া,
ভক্তি প্রীতি ন্যায় শান্তি দয়া স্নেহ দিয়া ?
সারাটী জীবনে আর—
দেখা কি দিবে না আর ?
অক্রূরের গৌরব-রবি চলিলে কোথায় ?
চেয়ে দেখ, সবে মিলে ডাকিছে তোমায়।

হে প্রভু মঙ্গলময়,
তুমি যে করুণাময়,
কি মঙ্গল সাধিবারে লইলে তাঁহারে,
দাও দেব বুঝাইয়া আমা সবাকারে ॥

দুঃখিনী কন্যা সুহাসিনী

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিংশ অধ্যায় পশুপক্ষি-প্রতিপালন।

মানব সৃষ্টির রাজা। জগতের পশুপক্ষিগণের উপরেও ইহার প্রভুত্ব। দুর্দ্দান্ত মত্ত মাতঙ্গকে মানব স্বীয় আজ্ঞার অধীন করিতে পারে। মানব, কখনও আপনার কার্য্যসাধনের জন্য, কখনও বা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, কখনও স্বর বা রূপজ মোহে অভিভূত হইয়া, কখনও বা ভক্ষনার্থ, কদাচিৎ বা আপনাদিগের সুখের সহিত ইহাদিগের সুখাল্পতা চিন্তা করিয়া আপনার সুখের আদর্শে ইহাদিগকে সুখী করিবার জন্য, কখনও বা সন্তান-সন্ততির মনস্তুষ্টির অভিপ্রায়ে, কখনও বা পক্ষীর কণ্ঠে হরিনাম শ্রবণের আশায়, কখনও বা অপত্য-স্নেহের আধার প্রাপ্ত হইয়া অপত্যহীনতা দূরীকরণ মানসে এবং কখনও বা সম্পূর্ণ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া, অসীম আকাশতলে বা বিস্তীর্ণ ধরাধামে স্বাধীনতায় মুক্ত বায়ুতে বিচরণশীল পশুপক্ষিগণকে নিরুপদ্রব স্থানে রক্ষা করেন, বা পিঞ্জরে আবদ্ধ করেন এবং আহার, পানীয় প্রভৃতি প্রদান করেন। কিন্তু যে দিন দেহ পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া পশুপক্ষীর জীবনবায়ু অসীম বায়ুমণ্ডলীতে মিশিয়া যায়, সে-দিন সেই মানব প্রেমের ক্ষুদ্রগণ্ডী সেই স্থানটী বা লৌহ-পিঞ্জর সেই পালিত জীবের শূন্য দেহপিঞ্জর লইয়া বসিয়া থাকে! পশু পক্ষী প্রভৃতি পালনের জন্য তাহাদিগের জীবন-বিষয়ে মানবের জ্ঞান থাকা উচিত। এইজন্য কয়েকটী গৃহপালিত পশুপক্ষীর বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে।'

খরগোস :—খরগোস পালন করিতে হইলে টোং তৈয়ার করা উচিত। খরগোস-দিগের শরীর সাধারণতঃ মোটা; 'কিন্তু একবার পীড়িত হইলে ইহারা আর বাঁচে না। সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যের জন্য শুষ্ক স্থানের প্রয়োজন। যে-স্থানে বারিপাত হয়, অথবা যেস্থানে সহজেই শৈত্য লাগিতে পারে, তাদৃশ স্থানে পরিহর্ত্তব্য। খরগোসের

গৃহে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। প্রস্রাবই এই দুর্গন্ধের কারণ। সুতরাং তাহাদিগের খুব্রিতে যথেষ্ট পরিমাণে শুষ্ক মৃত্তিকা রাখিয়া দেওয়া উচিত। দুর্গন্ধ বাহির হইলেই সেই মৃত্তিকাকে ফেলিয়া দিয়া নূতন মৃত্তিকা দিবে।

খরগোসের ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে প্রতি ছয়টী খরগোসীর জন্য একটি করিয়া খরগোস রাখা উচিত। নতুবা ত্রিশটী খরগোসীর পক্ষে একটী খরগোস যথেষ্ট। প্রত্যেক খরগোসীর জন্য দুইটী করিয়া কামরা রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য। এক সঙ্গে সকলকে রাখিলে ক্ষতির সম্ভাবনা। খরগোস-মাত্রেই খরগোসীকে বড়ই বিরক্ত করে এবং শাবক হইলে মারিয়া ফেলে। খরগোসেরা সাধারণতঃ ৬ হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে; তন্মধ্যে পুং-জাতীয় খরগোস ১ হইতে ৫ বৎসর এবং স্ত্রীজাতীয় খরগোসেরা ৮ মাস হইতে ৫ বৎসর জীবিত থাকে। খরগোসী আটের অনধিক সন্তান প্রসব করে। আট মাসের না হইলে শাবকগণকে খরগোসের নিকট যাইতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ তদ্দ্বারা দুর্ব্বল সন্তান জন্মে। যে সকল সন্তান চৈত্র মাসে জন্মে তাহাদিগকে অগ্রহায়ণ মাসে খরগোসের নিকট যাইতে দিবে। খরগোসী সন্তানের সহিত ত্রিশ দিন থাকে। তৎপূর্ব্বে তাহাকে খরগোসের নিকট পাঠাইবে না। সন্তান জন্মের ১৫ দিন পরেই খরগোসী সুস্থ হয়। কিন্তু আরও ১৫ দিন তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

খরগোসীর গৃহের উপর পেন্সিল দিয়া লিখিয়া রাখিবে যে কে কবে সন্তান প্রসব করিবে। প্রসবের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে গৃহটীকে বিশেষরূপে পরিষ্কৃত করিয়া খড় বিছাইয়া রাখিবে। খরগোসী স্বীয় বক্ষের লোম ছিঁড়িয়া ও খড় লইয়া সন্তানের আবাস নির্ম্মাণ করে। খরগোসীকে শান্ত রাখিবে ও রীতিমত আহার দিবে। এই সময়ে যদি যত্ন না হয়, তবে খরগোসীর দুগ্ধ রোধ হইবার এবং সন্তানের মৃত্যুর সম্ভাবনা।

খরগোসী সন্তান প্রসব করিলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত যেন সন্তানকে স্পর্শ করিও না। কারণ, স্পর্শ করিলে অথবা বাসা খুলিলে খরগোসী সকল সন্তানগুলিকে বধ করে। যদি আর্দ্রতার ভয় থাকে, তবে নবজাত সন্তানগুলিকে শুষ্ক কোণে লইয়া যাইবে, কিন্তু যদি সমস্ত বাসাটা শুষ্ক হয়, তবে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়াই উচিত। যদি খরগোসী দ্বিতীয়বার সন্তান খাইয়া ফেলে, তবে তাহাকে বধ করিয়া ভক্ষণ করাই বিধি।

খরগোস শিশু জন্মিবার কালে অন্ধ থাকে; কিন্তু পঞ্চম দিবসে তাহাদিগের চক্ষু ফুটে। সন্তানগণ ২৫ দিনের হইলে তাহাদিগকে খাইতে শিখাইবার জন্য বাসা হইতে বাহিরের কামরায় তাড়াইয়া দিবে। যদি ইতঃপূর্ব্বে তাহারা বাহিরের কামরায় আসে, তবে উক্ত উপায়ের আবশ্যক হয় না; কারণ, তখন তাহারা স্বেচ্ছায় বাহিরে আসিবে।

জন্ম দিবস হইতে একমাস অতিক্রান্ত হইলে, যখন তাহারা উত্তমরূপে খাইতে শিখে তখন তাহাদিগকে মায়ের নিকট হইতে দূরে রাখিবে; নতুবা তাহারা তাহাকে অস্থিচর্ম্ম সার করিবে। যে সকল খরগোস-শিশু তিন মাসের নহে, তাহাদিগকে অন্য কামরায় রাখিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিতে দিবে। খাদ্য পড়িয়া

ন, সেই উদ্বৃত্ত খাদ্য তাহাদিগকে খাইতে না ; প্রত্যেক দিন তাজা খাদ্য খাইতে ই বিধি। চারি মাসের হইলে শিশু-ক তাহাদিগের জ্যেষ্ঠের সহিত রাখিতে কিন্তু এরূপ করিবার পূর্ব্বে পুংখরগোস-ক অগ্রে কাটিয়া ফেলিবে। ছয় মাসের বলবান খরগোসগুলিকে সন্তান জননের নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাদিগকে দূরে রাখিবে এবং উপযুক্ত সময়ে পুং খরগোসের নিকট পাঠাইবে। পুং খরগোস শিশুগুলিকে ৫ মাস বয়সেই দূরে রাখা উচিত।

*　*　*

খরগোসদিগকে একবার প্রাতঃকালে ও একবার সন্ধ্যাকালে খাইতে দিবে। এতদ্‌রিক্ত খাওয়াইবার কোনও আবশ্যকতা নাই। পেট ভরিয়া দুইবেলা খাইতে দেওয়া বরং ভাল, তথাপি অল্প অল্প করিয়া সারাদিন খাওয়ান উচিত নহে। কোমল বৃক্ষ, শাখা পল্লবাদি খরগোসের উত্তম খাদ্য; কেবল মাত্র Geranium তাহারা খাইতে ভালবাসে না। যাহাদিগের উদ্যান আছে, তাহাদিগের খরগোস পুষিতে অতি সামান্য খরচ পড়ে।

বর্ষাকালে বা মেঘলা দিনে কাঁচা খাদ্য না দিয়া শুষ্ক খাদ্য দিবে। গ্রীষ্মকালে শাক-শবজির সহিত ছোলা মিশ্রিত করিয়া একবেলা, বিশেষতঃ গর্ভিনী খরগোসীকে দিবে। এরূপ করিলে পুষ্ট ও বলবান সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রচুর পরিমাণে তাজা খাদ্য দেওয়াই বিধি ; পর্য্যুসিত খাদ্য নিষিদ্ধ। একই প্রকার বস্তু খাইতে না দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আহার দেওয়া উত্তম। ৯৭টী খরগোস শতকরা শৈত্য বা অনাহারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। শীতকালের জন্য আলু, জেরুজিলম আর্টিবোক, সালগম, মটর, সিম, ছোলা চোকর প্রভৃতি আহরণ করিয়া রাখিবে। যে সকল খরগোসীর সন্তান হইয়াছে, বিশেষতঃ তাহাদিগকে উত্তমরূপে খাওয়াইবে।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, খরগোস জলপান করে না। ইহা ভ্রম মাত্র। অন্যের পক্ষে যেমন জলের আবশ্যকতা খরগোসের পক্ষেও তাহাই! প্রসূতা খরগোসীর পক্ষে জলের অধিক আবশ্যক। কাঁচা খাদ্য জলের আবশ্যকতা হ্রাস করিয়া থাকে।

খরগোসকে বধ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে সুগন্ধ গাছ-গাছড়া তাহাকে খাওয়াইলে তাহার মাংস অধিকতর সুস্বাদু হয়।

খরগোসগুলিকে যত্নে রাখিলে তাহাদের রোগ হইতে পায় না। রোগ হইলে আরোগ্য করা অপেক্ষা, রোগকে বাধা দিবার চেষ্টা করা উচিত। খরগোস-শিশুদিগের প্রায়ই চক্ষু উঠিয়া থাকে। অপরিচ্ছন্নতাই উক্ত রোগের কারণ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নর্দ্দামার সাফাই, এবং স্থান পরিবর্ত্তন উক্ত রোগের প্রতিকার জানিবে।

যকৃতের রোগ অথবা উদরী খরগোসের প্রাণহা হইয়া থাকে। এ রোগের প্রতিকার করিতে যাওয়া বৃথা। হনন করাই প্রকৃষ্ট উপায় জানিবে।

খরগোসকে ধারণ করিতে হইলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কর্ণ ধারণ করিয়া, বাম হস্তের উপর তাহাকে চিৎ করিয়া ধারণ করাই উচিত। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে ধারণ করিলে খরগোসের হানি হইতে পারে। প্রসূতা খরগোসীর বিশেষ যত্ন করিবে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

পুস্তক সমালোচনা।

জীবন-সংগ্রাম—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বাঁধাই সুন্দর। উপরে সুবর্ণাক্ষরে গ্রন্থের নাম অঙ্কিত আছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

গ্রন্থখানি দেশপূজ্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকার পরিচিত প্রবীণ সাহিত্যিক। তাঁহার 'পদ্যসার' 'সাহিত্যমঞ্জরী' প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পাঠ্য এবং 'ঘরের কথা' প্রভৃতি গৃহপাঠ্য অনেকগুলি পুস্তক আছে। তিনি তাঁহার এই বার্দ্ধক্যনিপীড়িত, জরাজীর্ণ, রুগ্ন, ভগ্ন দেহে, দেশের দারিদ্র্য প্রভৃতি দুর্গতি নিবারণ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য, তাঁহার ৭৮ বৎসরের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করিয়া উপন্যাসচ্ছলে এই উপদেশ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং ইহা মূল্যবান। গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই ইহার উদ্দেশ্য বুঝা যায় গ্রাম্যের আধুনিক অবস্থা প্রতিফলিত ক হইলে এবং পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য ইজন্য দিন যত্ন করা হইয়াছে এবং অন্নসমস্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রন্থকার গভীর গবেষণাও করিয়াছেন। কত প্রকার অজ্ঞানতা এখনও দেশবাসীর হৃদয় আবৃত করিয়া আছে, তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কারণে জ্ঞাতি-বৈরতার বিষম ফল এবং সাধুতা ও উদ্যমশীলতার পরস্পরের চিত্র অতিসুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের প্রধান চরিত্র ধীরোদাত্ত নরেন্দ্রনাথ, স্বার্থত্যাগী, বিদ্বান্, আত্মশ্লাঘাহীন, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিনয়ী, উদার, কর্ম্মবীর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরদুঃখকাতর, গম্ভীরপ্রকৃতি ও ঈশ্বরে ভক্তিমান ; সুতরাং, আদর্শ-স্থানীয়। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, হৃদয়ে বল হয়, এবং ঈশ্বরপ্রীতি বর্দ্ধিত হয়। ইহার ভাষা অতিশয় সরল। সকলেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।
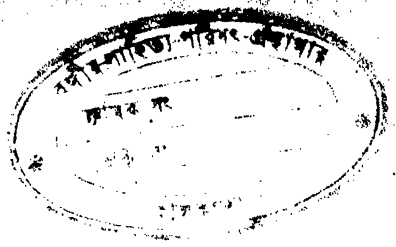
বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 647. July, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৭ সংখ্যা। আষাঢ়, ১৩২৪। জুলাই, ১৯১৭। ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

আসাতে—

তোমায় আমায় মিলন হ'ল
আজ্‌কে যখন, নাথ,
তখন গভীর রাত!
সাঁঝের বেলাই আস্‌বে তুমি
আমার এই ঘরে,
ছিলাম আশা ভরে।
জ্বালিয়েছিলাম গন্ধ-প্রদীপ
ধূপের সুরভি
অস্ত গেলেই রবি!
হাজার কানন ঘুরে ঘুরে
ভরেছিলাম ডালা,
গেঁথেছিলাম মালা!
পেতেছিলাম শয়ন যেথা
দখিন বাতাসে
মাতায় সুবাসে।

ক্রমে আঁধার ঘনিয়ে এল,
গভীর হ'ল রাত,
কোথায় তুমি, নাথ!
মিলিয়ে গেল সুখের হাসি
অধর-কোণে মোর,—
নয়ন জলে ভোর!
কত আশায় যত্নে পাতা—
কোমল শয়নখানি
দূরে ফেলে টানি,
দ্বারের কোণে আঁচল পাতি
ঘুমে আছি ঢ'লে,
তখন তুমি এলে!
নিভে গেছে গন্ধ-প্রদীপ
সন্ধ্যা-বেলায় জ্বালা,—
শুক্‌নো ফুলের মালা!

বেসুর আমার বাজ্‌ল বীণা,
কণ্ঠে নাইকো তান,—
শুন্‌তে চাইলে গান !
কোথায় তোমায় বস্‌তে দিব—
আসন কোথা পড়ে ?
আমার আঁচল 'পরে
মাটীর উপর লুটায় যেথা—
ঈষৎ মধুর হেসে
বস্‌লে, নাথ, এসে !

নয়ন-তারায় তারার মত
প্রেমের আলো জ্বেলে
প্রেমিক ! দিলে ঢেলে
আঁধার হৃদয়-গহন-মাঝে ;
নিয়ে বীণাখান
শুনাইলে গান !
দুঃখ ব্যথা মিলিয়ে গেল,
ভরে আমার বুক
তৃপ্তি এল, শান্তি এল, সুখ !

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রভাতে গঙ্গাবক্ষ হইতে কাশী-ধামের পবিত্র দৃশ্য সন্দর্শন-মানসে একটি ক্ষুদ্র তরণী ভাড়া করিলাম! কর্ণধার একজন বৃদ্ধ। তাহার পূর্ব্ব-পুরুষগণও এবম্প্রকার নৌকা-চালনা করিয়া অনেকানেক অপরিচিতের দর্শন-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে। কর্ণধার নিজ হইতেই প্রসঙ্গাদি সহ তীরবর্ত্তী প্রাচীন অট্টালিকা, দেবমন্দির, স্নানের ঘাট, ইত্যাদি দেখাইয়া চলিল।

গঙ্গাগর্ভ হইতে বহু উর্দ্ধে পবিত্র বারাণসী-ধাম। বরুণা ও অসীর সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া ইহার এতাদৃশ নামকরণ। স্রোতের বিপরীত দিকে আমাদের ক্ষুদ্র তরণীখানি তীরের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। কিয়দ্দূর ব্যবধানে এক-একটি স্নানের ঘাট। তাহার সুদৃঢ় প্রস্তর-সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া কত শত নরনারী গঙ্গায় অবতরণ করিতেছে। অদূরে গঙ্গাগর্ভে এক-একটি শুভ্র প্রস্তর-মন্দির ;—অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে গঙ্গাজল কুণ্ডলীকৃত হইয়া মন্দিরাভ্যন্তর ধৌত করিয়া দিতেছে!—তথায় কেহ কেহ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন,—কেহ বা তার-স্বরে পবিত্র মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। স্নানের ঘাটে তিল ধারণের স্থান নাই! কোথাও কেহ অর্দ্ধনিমজ্জিতাবস্থায় নিমীলিতনেত্রে যুক্তকরে দণ্ডায়মান, কেহ বা নিরক্ষর পাণ্ডার উচ্চারিত মন্ত্র পুনরাবৃত্তি করিয়া গঙ্গার জলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। গঙ্গাবক্ষে পুষ্প-বিল্ব[illegible]াদি প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হইতেছে, আবার স্রোতের টানে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে! গঙ্গার কল্লোল নাই—শব্দ নাই! ব্য[illegible]তা-সহকারে নিঃশব্দে সে কোথায় [illegible]য়া যাইতেছে! ধর্ম্মপ্রাণ-হিন্দুনৃপতি-নির্ম্মিত [illegible]

একটি রম্য হর্ম্ম্য গঙ্গাগর্ভ হইতে বহু উর্দ্ধে শির তুলিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে!—তাহাদের দৃঢ়তা এবং স্থাপত্য সমধিক প্রশংসনীয়। স্থানে স্থানে পুরাতন প্রস্তর-প্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গঙ্গাগর্ভে চিরশান্তি লাভ করিতেছে এবং অপরাংশ পতনোন্মুখ হইয়া নৌযাত্রীদিগের ভীতি উৎপাদন করিতেছে;—বুঝি বা, সঙ্গীর নির্ব্বাণ-প্রাপ্তিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে! কোথাও বা অতিপ্রাচীন একটি নিম্ব-বৃক্ষ সমূলোৎপাঠিত হইয়া নদী-পুলিনে পড়িয়া রহিয়াছে,—কোনও মতেই গঙ্গাগর্ভে যাইতে পারিতেছে না;—বোধ হয়, এখনও তাহার সময় হয় নাই। দীর্ঘকাল গঙ্গাতীরে বাস করিয়াও অন্তিমে গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল না, তাই বুঝি, ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া সে ধূলায় লুটাইতেছে! কোথাও বা গঙ্গা দুই একটি জীর্ণ শীর্ণ আবাসের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাহাদিগকে অভয়প্রদান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে অকস্মাৎ যে দৃশ্য উন্মুক্ত হইয়াছিল, তাহা অতীব বিস্ময়কর! কাশীধামে দেহত্যাগ হইলে শিবত্ব প্রাপ্তি হয়, এই ধারণা হিন্দুর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তাই কত বৃদ্ধ অন্তিমে শিবত্ব-কামনায় কত কাল ধরিয়া কাশীবাস করিতেছেন—কত সাধের পুত্র-পৌত্রকে জন্মের তরে বিদায় দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, কত সাধের অট্টালিকা, ধন-সম্পত্তি, ভোগবিলাস সমুদয় পশ্চাতে ফেলিয়া মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাহা ভাবিতেও প্রাণে কষ্ট হয়। এ প্রলোভন ত সামান্য নয়! আজন্ম কঠোর সাধনায়ও ত এই ফল লাভ হয় না! হৃদয়ের কি অসীম বল, কি অটল বিশ্বাস! দেখিলাম, প্রস্তরময় মহাশ্মশানের তিনদিকে প্রবাহিতা উদার-গঙ্গা নিমেষ-মধ্যে চিতাভস্ম কোথায় বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে! এ স্থানে মানবের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই শ্মশানের দৃশ্য সন্দর্শনে প্রণয়িনীর মর্ম্মভেদী হাহাকার, জননীর সকরুণ বিলাপ, পুত্রের গভীর শোকোচ্ছ্বাস, কিছুই মনে পড়ে না; প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয় না,—জীবন-মরণের কিছুই পার্থক্য অনুভূত হয় না!—যেন সব ভুলিয়া যাইতে হয়! কোথা হইতে অনির্ব্বচনীয় ভাবনারাশি আসিয়া প্রাণের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দেয়!

যে শ্মশানে জীবের সমস্ত শেষ হইয়া যায়,—মান-মর্য্যাদা, অভিমান-অহঙ্কার, সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়,—এমন কি পার্থিব যাহা কিছু, সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই শ্মশানে ক্ষণকাল অবস্থান করিলে প্রাণে স্বতঃই একটা অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা জন্মে। মনে হয়, হায় জীব, কোথায় তোমার সুখ-দুঃখানুভূতি! এই সুকোমল দেহে অগ্নি-সংযোগ করিল, আর তুমি নীরবে তাহা সহ্য করিয়া রহিলে! তোমার আদেশে কত লোক কত কঠোরভাবে প্রপীড়িত হইত, কি প্রভূত ক্ষমতা তোমার ছিল!—তোমার অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া কত শত লোক তোমার দ্বারদেশে যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিত,—তোমার ভ্রূ-কুটিতে কত জনের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইত, তোমার ইঙ্গিতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে কত অসাধ্য কার্য্য সাধিত হইত! আর আজ তোমার এই পরিণাম! কত জন ভাবিত, তুমি বিধাতার এক সুন্দর সৃষ্টি, আর আজ তাহা

ভস্মীভূত হইয়া গেল! আজ তোমার ও পথের ভিখারীর একই পরিণাম!

কিন্তু মহাশ্মশানের উদার উন্মুক্ত দৃশ্যে প্রাণ-মন বিস্ময়-বিজড়িত হইয়া যায়! মনে হয়, যেন সব সত্য। মহাশ্মশানের পার্শ্বদেশে চণ্ডালগণ অপূর্ব্বরূপে সংসার রচনা করিয়া মনের সুখে কালযাপন করিতেছে। তাহারা নির্ব্বিকার-চিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছে! প্রলয়ের পাশাপাশি সৃষ্টির সূচনা অতীব বিস্ময়ব্যঞ্জক। পুত্র-

দশাশ্বমেধ-ঘাটে আসিয়া কর্ণধারকে বিদায় দিলাম। ঘাটের উপর লোকে লোকারণ্য! বহুকষ্টেও দাঁড়াইবার স্থান পাইলাম না। অগত্যা অদূরবর্ত্তিনী সৈকতভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পবিত্র মন্ত্র-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইতেছিল! গঙ্গায় অর্দ্ধনির্মজ্জিত যাত্রিকুলের বাহুৎক্ষেপ-সঞ্জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চঞ্চল বীচিমালা সৌর-করে ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। তথায় যেন কি মহান্ এক পুণ্য-প্রভাব চির-বিকশিত! সংসারের সীমাবদ্ধ সুখ-দুঃখ,

কাশীর মহাশ্মশান।

শোকাতুরা জননী হইতে তাহারা অপত্য-স্নেহ শিক্ষা করিতেছে, দুঃখ হইতে তাহারা সুখের কল্পনা করিয়া লইতেছে। গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ মহাশ্মশানের দিকে বহুক্ষণ ধরিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বহুদূরে চলিয়া আসিলাম। ধীরে ধীরে শ্মশানের প্রস্তর-স্তম্ভ-গুলি দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেল। সম্মুখ দিয়া গঙ্গা প্রবল-বেগে চলিয়া যাইতেছিল! আমি ভাবিলাম, এমনই করিয়া সংসারের সকলই চলিয়া যাইবে,—কেহ কাহারও অপেক্ষা করিবে না!

মায়া-মমতা নিমেষে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবগাহনে ভক্তের ব্যাকুলতা, বৃদ্ধার আত্মপ্রসাদ, ব্যথিতের তৃপ্তি, চিরদুঃখীর দুঃখ-ভ্রান্তি পরিস্ফুট হইতেছে! সকলেই অপার্থিব যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। ভাবিলাম, এইজন্যই মায়ের নাম সন্তাপহারিণী।

মণিকর্ণিকার ঘাটটীও ঠিক্ দশাশ্বমেধ-ঘাটের ন্যায়;—আকৃতিগত বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। ঘাটের নিকটে লৌহবেষ্টনী-পরিবৃত মণিকর্ণিকা-কুণ্ড। তাহাতে যাত্রিগণ সর্ব্বপ্রথমে অবগাহন করিয়া তৃপ্ত হয়। নাতিবৃহৎ কুণ্ডে

অসংখ্য লোক স্নান করিতেছে,—বিরাম নাই! এজন্য জল কর্দ্দমাক্ত। অসীঘাট, কেদারঘাট, প্রভৃতি আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘাট আছে, তাহাতে সর্ব্বদাই লোকের ভিড়।

স্বর্গীয় মহাত্মা ভাস্করানন্দস্বামীর আশ্রম সহরের একপ্রান্তে অবস্থিত। কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল মহাত্মার দেহ-ত্যাগ হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি যেন তিনি আশ্রমে সশরীরেই বিরাজমান। মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত তুষার-ধবল একটি মন্দির; তাহার চারিদিকে বৃক্ষরাজি। মন্দিরে মহাত্মার প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তথায় প্রতিদিন মহাত্মার আরতি ও পূজা-আরাধনা সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানটির নাম আনন্দবাগ। মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে মহাত্মার ব্যবহৃত পুস্তক, পাদুকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি অতিযত্নে সুরক্ষিত। এই মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে জীর্ণ একটি দ্বিতল ইষ্টকালয়; তাহাতে মহাত্মা ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন।—আরোহণের সোপান-গুলি স্থানে স্থানে ভগ্ন এবং জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; কাহারও উপরে উঠিবার অধিকার নাই। এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া দেখিলাম, স্বচ্ছন্দজাত পুষ্পবৃক্ষাদি বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে! কোনটি অতিস্থবির এবং স্বীয় জীর্ণ শীর্ণ দেহের ভার রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গুল্মের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার নিম্ন দেশ অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; যেন কেহ সম্মার্জ্জনী-দ্বারা সদ্যঃ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বত্র নীরবতা, নিস্পন্দতা,—একটি বৃক্ষ-পত্রের পতন শব্দও শ্রুতিগোচর হয় না! যেন কেহ পরোক্ষে থাকিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছেন! মন্দিরের একপ্রান্তে অনেক ক্ষণ বসিয়া রহিলাম। সুশীতল আনন্দবাগ কি শান্তিপূর্ণ এবং গম্ভীর! জ্বালাময় সংসারের পাপ-তাপ এস্থানে আসিতে পারে না।

আনন্দবাগের অনতিদূরেই দুর্গাবাড়ী। এই দেবতালয় বহু-প্রাচীন। ইহার পার্শ্বে একটী নাতিবৃহৎ দীর্ঘিকা;—প্রাঙ্গণে স্থবির বৃক্ষরাজি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। অগণিত শাখামৃগ দলে-দলে আসিয়া আগন্তুকের ত্রাস উৎপাদন করিতেছে! তাহাদিগের অত্যা-চার অত্যন্ত অধিক। ছোলাভাজা বা অন্য প্রকার খাদ্য তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে উপ-ঢৌকন প্রদান না করিলে, সে-স্থান হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন একপ্রকার অসম্ভব। তাহারা আগন্তুককে নানাপ্রকারে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্নতা এবং গমনের ক্ষিপ্রতা অতীব প্রশংসনীয়।

অদূরে নিবিড় অরণ্যানী-পরিবেষ্টিত শঙ্কটমোচন শিবের মন্দির। ইহা যেন একটী মুনির পবিত্র আশ্রম। বৃক্ষরাজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া স্থানটীর গাম্ভীর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে; শ্যামশষ্প ও তৃণগুল্ম তরু-রাজির পাদদেশ আবৃত করিয়া রহিয়াছে;—সর্ব্বত্রই এক স্নিগ্ধ ভাব চির-বিরাজমান। ফল-ভারাবনত বিটপী-শ্রেণী মন্দিরটীকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে;—প্রচণ্ড তপনের প্রখরতা তথায় অনুভূত হয় না;—মৃদু মারুত-হিল্লোলে তাপিত দেহ-মন শীতল হইয়া যায়!

প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পথিমধ্যে সেণ্ট্রাল হিন্দু কালেজ ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস দেখিয়া আসিলাম। বহুদূর-বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, গগনস্পর্শী

অট্টালিকা স্থাপয়িত্রীর প্রশান্ত হৃদয়ের পরিচায়ক। ছাত্রাবাসের প্রবেশদ্বারের উপরে বীণাপাণির পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি সুরক্ষিত। প্রাঙ্গণে কুমুদ-কহ্লার-পরিশোভিত সুবৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়ে নানাবর্ণের বিচিত্র মৎস্য নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল; ফোয়ারা হইতে সহস্র ধারায় সলিলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সুশীতল শান্তি বর্ষণ করিতেছিল।

কাশীধামে অবস্থানকালে সংসারের তীব্র যাতনা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সুকৃতির ফলে কিয়দ্দিবসের জন্য দেবদুর্লভ এক শান্তিময় রাজ্যে বাস করিয়াছিলাম। এ স্থানের সব নিত্য, সব সুন্দর—সব স্নিগ্ধ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বৈরাগ্য।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে।)

আমার গর্ব্বিত মন! হয়ো না চঞ্চল,
আপন গৌরবে কভু হইয়া বিহ্বল।
কে তুমি, এসেছ কেন, যাইবে কোথায়?—
কভু কি ভেবেছ মনে নির্জ্জনে উষায়?
"আমার" "আমার" কর, কি রহে তোমার?
ভেবেছ কি কভু তুমি, তুমি যে কাহার?

জীবনে রহিবে যদি তব অধিকার,
বিপদে কেন বা বল, "কি হবে আমার?"
কেন বা রাখিতে নার প্রাণ-প্রিয়জন,
যা'রে বিনা অন্ধকার নিরখ ভুবন?
কেন বা সৃজিতে নার যা' ভাব যখন,
কেন বা অভাবে কর হতাশে রোদন?

যে তুমি তোমারে ভাব মহাগরীয়ান্,
সেই তুমি হও ভবে ধূলির সমান!
নিয়ত দলিত হও ভবাঘাতে কত,
তোমার উন্নত শির হয় ক্ষণে নত!
তোমার সকল দর্প নিমেষে ফুরায়,
তথাপি গৌরব কর, নাহি লাজ তায়?

তুমি যে আলেয়া হও, নিশার স্বপন,
তুমি যে চপলা-প্রায়, ক্ষণিক তেমন!
তুমি পত্রে ধারা-সম হও যে ধরায়,
ফুৎকারে উড়িয়া যাও নিমেষে কোথায়!
তুমি হও দীপ-সম সহসা নির্ব্বাণ,
'রাখ নিজে' নহ তুমি হেন বলীয়ান্।

ওরে মন! যাও ভুলে "আমার" "আমার"
কিছুই তোমার নাহি, যা' হের ধরার।
এ দেহ জীবন মন যাহা সমুদয়
লভিয়াছ,—"উপহার"; কিছু নিজ নয়।
তুমি যে 'যাত্রিক' হও অনন্ত পথের,
জান না ঠিকানা আজো আপন ঘরের!

ক্ষণেক নির্ব্বাক্ হয়ে ভাব আপনায়,—
"কে তুমি, এসেছ কেন, যাইবে কোথায়?
এ জীবন খেলা নহে, তপস্যা-প্রধান,
এসেছি পশরা শিরে করিতে প্রদান।
বিনিময়ে যেতে হবে লয়ে "সার ধন",
তবেই গৌরব তব, সার্থক জীবন!

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১৪)

মাতার নিকট হইতে হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেও, রাস্তায় নামিতেই কিন্তু নমিতার মুখের সেই হাসি মিলাইয়া গেল। সাংসারিক অর্থকৃচ্ছ্রতার জটিল সমস্যাটা যে, কোনও উপায়ে সুমীমাংসিত হইবে, তাহার কোনই নির্দ্দেশ নমিতা খুঁজিয়া পাইল না। মাতার কাছে রুলী বিক্রয়ের প্রস্তাব তুলিয়া, তাঁহাকে আঘাত দিতে যাইবার পূর্ব্বে, তাহাকে নিজের হৃদয়কেও অনেকখানি আঘাত দিয়া সতর্ক ও সাহসী করিয়া লইতে হইয়াছিল; নচেৎ এ প্রস্তাব উল্লেখের কুণ্ঠাটুকু কাটানই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। তাহার সব চেয়ে বেশী সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল এইজন্য যে, রুলী-দুই-গাছা তাহার নিজের নহে;—উহা চিরদিনই সমিতার নিজের সম্পদ্ বলিয়া গণ্য ছিল। কয়দিন পূর্ব্বে হঠাৎ অত্যন্ত পছন্দ হওয়ায় নমিতা উহা সমিতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া, নিজের চুড়িগুলা তাহাকে দান করিয়া দিয়াছে।

অবশ্য, নমিতার মত পছন্দ-জ্ঞানহীনা নির্ব্বোধের পক্ষে এইরূপ নীতি-বিগর্হিত পর-দ্রব্য-লুব্ধতার মূলে যে একটুখানি ইতিহাস না ছিল, তাহা নহে; কিন্তু নমিতা তাহা সকলের নিকট চাপিয়া গিয়াছিল। কারণ, প্রকাশ হইলে, উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হইত। ব্যাপারটা আর কিছুই নহে:—সে-দিন বৈকালে নিদ্রাভঙ্গের পর, পার্শ্বের ঘরে নির্জ্জন-বিশ্রান্তালাপ-রত সুশীল ও সমিতার কথা কিছু কিছু তাহার কাণে ঢুকিয়াছিল। বিদ্যালয়ের মেয়েরা সমিতার ক্ষয়া, ময়লা-ধরা রুলী-দুইগাছা মান্ধাতৃ-মহারাজের গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত বলিয়া, সে-দিন খুব কৌতুক-বিদ্রূপ করিয়া সমিতাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। সেই কথাই দুঃখের দুঃখী ছোট ভাইটির কাছে ব্যক্ত করিয়া সমিতা মনের ভার লাঘব করিতেছিল। সেই দুঃখ-কাহিনীর দুই-চারিটা টুক্‌রা আসিয়া সদ্যঃ-সুপ্তোত্থিতা নমিতার কাণে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু তখন কোন কথা না বলিয়া সে হাঁসপাতালে চলিয়া যায়। পরদিন সকালে বাড়ীতে সকলের সহিত 'চা' পান করিতে করিতে নমিতার হঠাৎ মনে পড়ে যে, তাহার হাতের চুড়িগুলা সম্প্রতি অত্যন্তই উপদ্রব-পরায়ণ হইয়াছে; চুড়ির ঘ্যাঁস লাগিয়া তাহার প্রায়শঃ জামার ককের বোতাম ছিঁড়িয়া যায়।—তা ছাড়া, আকস্মিক ঝনৎকার-শব্দে নিদ্রিত রোগী-দের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এবং হাঁসপাতালের কাজে আরও নানারকম অসুবিধা হইতেছে··· ইত্যাদি। সুতরাং, তৎক্ষণাৎ চুড়িগুলা খুলিয়া ফেলিয়া সমিতার রুলী-দুইগাছার জন্য জরুর তাগাদা জানাইয়া বসে। হাঁসপাতালের কাজে যাহারা ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের পক্ষে হাতের চুড়ি ও মাথার সুদীর্ঘ চুল যে কতদূর বিড়ম্বনা-জনক, তাহা সে যথাযথ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিল এবং কাজের সুবিধার জন্য তাহার মাথার চুলগুলা যে সময় সময় ছাঁটিয়া ফেলিতে তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা.

হয়, তাহাও জানাইতে ত্রুটি করিল না। চুলগুলার কথা অবশ্য খুব নিম্নস্বরে বলিল; কারণ, মাতা বাহিরের রোয়াকে বসিয়াছিলেন। পাছে তিনি শুনিতে পান, তাই সে ভয়টা বাঁচাইয়া—সে সন্তর্পণে নিজের মাম্‌লা শেষ করিল। করুণহৃদয়া সমিতা দুঃখ-ছল্‌ছল্‌ চক্ষু-দুইটা তুলিয়া অবাক্ হইয়া দিদির পানে চাহিয়া রহিল; তারপর দিদির সুবিধায় সহায়তা করিবার জন্য বিনাবাক্যে নিজের রুলী-দুইগাছা খুলিয়া, সাবান ও ব্রুসে মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া দিদিকে দিল। বলা বাহুল্য, কাজেই দিদির চুড়িগুলিও নিজে পরিতে বাধ্য হইল।

মা ঐ সকল তুচ্ছ ব্যাপারে কিছু বলেন নাই। কয়দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার সেই অত্যন্ত পছন্দের অলঙ্কার যখন অত্যন্ত অনাবশ্যক বলিয়া নমিতার মনে পড়িল, তখন সে সাহসে ভর করিয়া মাতার কাছে কথাটা তুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু প্রস্তাব টিকিল না। সহজ পন্থাটা যত সহজে মস্তিষ্কে উদয় হইয়াছিল,—ততোধিক সহজেই তাহা মন হইতে অন্তর্হিত হইল। নূতন উপায় অন্বেষণে নমিতা নূতন দুর্ভাবনায় মনোযোগ দিল। কিন্তু দুর্ভাবনা যতই বাড়ান হউক্, উপায়ের চিহ্ন কোথাও নাই!

নমিতা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে, এমন সময় ও-দিকের পথ হইতে হাঁসপাতালের মিস্ চার্শ্মিয়ান ডান-হাতে ছাতা ও বাঁ-হাতে পরিচ্ছদের পশ্চাদ্ভাগ গুটাইয়া ধরিয়া দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুশীল নমস্কার করিলে, প্রসন্না আনন্দময়ী চার্শ্মিয়ানের তুষার-শুভ্র বদনমণ্ডলে উৎফুল্ল হাস্য অজস্র কৌতুকে উছলিয়া উঠিল। অগ্রসর হইয়া সুশীলের হাত ধরিয়া একটু ঝাঁকনি দিয়া—"হ্যালো লিট্‌ল মিটার্,” বলিয়া তিনি সুশীল, সুশীলের মা, সুশীলের দিদি, দাদা, ছাগল-ছানা, কুকুর-বাচ্ছা এবং অন্যান্য সকলের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল এক-নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন। সপ্রতিভ সুশীল ঘাড়-মুখ নাড়িয়া, হাত ভাঙ্গা হিন্দী ও পা-ভাঙ্গা বাংলাকে কোনমতে জোড়াতাড়া দিয়া খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত সৌজন্য বাঁচাইয়া যথাযথ উত্তর দিল। স্বভাব-সিদ্ধ-কৌতুকোৎসারিত-হৃদয়া চর্শ্মিয়ান্ আজেবাজে মাথা-মুণ্ড নানাকথা কহিয়া, শেষে নমিতার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "এত রৌদ্রে ভাইকে নিয়ে বেড়াতে চলেছ নাকি?”

নমিতা বলিল, "কতকটা তাই। ডাক্তার মিত্রের বাড়ী যাচ্ছি।”—পাছে চর্শ্মিয়ান, 'কেন' 'কি বৃত্তান্ত' প্রশ্ন সুধাইয়া বসেন বলিয়া, পর-ক্ষণে নমিতা তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি এমন সময় বাড়ী গিয়েছিলে না-কি?”

স্নিগ্ধ চন্দ্ররশ্মির মত শান্ত মাধুর্য্যময়ী নমিতার পাশ ঘেঁসিয়া উগ্রদীপশিখার মত উজ্জ্বল সুন্দরী চর্শ্মিয়ান্ চলিতে চলিতে বলিলেন, "হাঁ, আমার আহার্য্য প্রস্তুতের দেরী ছিল ব'লে, তখন তাড়াতাড়ি হাঁসপাতালে চলে এসেছিলুম। এখন বেহারা গিয়ে খবর দিলে, তাই পণের মিনিটের জন্য তেওয়ারী কম্পাউণ্ডারকে বসিয়ে রেখে এসেছি। তিনি সাহায্য না করলে এখন আসা দুর্ঘট হ'ত।—লোকটি বড় ভদ্র, বড় সহৃদয়!

নমিতা কোন উত্তর দিল না। তেওয়ারী

কম্পাউণ্ডারের নামটা সুশীলের কাণে পৌঁছিয়াছিল; সে ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইয়া আগ্রহোন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তেওয়ারী—কম্পাউণ্ডার? হেড্ কম্পাউণ্ডার?—তিনি আছেন হাঁসপাতালে?—এখন আছেন?"

চার্ম্মিয়ান্ বলিলেন, "আছেন। হাঁ ভাল কথা, কৈ সিসিল, তুমি এখন তাঁর কাছে সিরাপ খেতে যাও না?"—

নমিতার পানে চাহিয়া সুশীল সঙ্কুচিত হইল। এমন গুপ্ত রহস্যটা দিদির কর্ণগোচর করা তাহার ইচ্ছা ছিল না;—এমন কি, এইজন্য সে সুরসুন্দরকেও পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া রাখিয়াছিল।

সমুদ্রপ্রসাদ কম্পাউণ্ডার ছেলেমানুষীটা খুব ভালবাসে। সে-ই সর্ব্বপ্রথমে সুশীলের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া, সিরাপের মিষ্ট-সরবতের সাহায্যে কিশোর বন্ধুটিকে একান্ত মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সুরসুন্দরের সহিত আলাপ হওয়ার পর হইতে সুশীল এখন সমুদ্রপ্রসাদের খোঁজ-খবর লওয়ার প্রয়োজন ভুলিয়াছে; এখন সুরসুন্দরই তাহার অত্যন্ত আপন-জন!

তা সে যাহাই হউক, বাহিরের বন্ধুত্বের সেই গুপ্ত গৌরব-মহিমা যে এমনভাবে, ঘরের লোক, দিদির কাছে অতর্কিতে ফাঁশ হইয়া যাইবে, ইহার প্রত্যাশা সুশীল মোটেই করে নাই। লজ্জায় পড়িয়া নমিতার মুখপানে তাকাইয়া কুণ্ঠিত-ভাবেই সে বলিল, "আমি ত প্রতিদিনই যাই না, এক-আধ দিন যাই। তেওয়ারীর কাছে আমি কখনো সিরাপ চাই নি; তিনিই নিজেই ধর-পাকড়্ করে খাওয়ান, কিছুতেই ছাড়েন না।……তিনি নিজে খুব ভাল লোক কিনা……!" অর্থাৎ, তেওয়ারীর ভালমানুষীটা সুশীলের এই ত্রুটি ও অপরাধের হেতু!

নমিতা হাসি চাপিতে পারিল না। চার্ম্মিয়ানও সকৌতুকে খুব খানিক হাসিয়া লইলেন ও তারপর নমিতার পানে চাহিয়া বলিলেন, "আমরা সবাই তেওয়ারী কম্পাউণ্ডারের ব্যবহারে সন্তুষ্ট বলে ডাক্তার মিত্র, কাল দত্তজায়ার কাছে তাঁকে 'মহিলাগণের মনোরঞ্জনকারী' বলে বিদ্রূপ করছিলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র শিশুর মনোরঞ্জন করায় তাঁর কি স্বার্থ আছে বল ত? ডাক্তার বোঝেন না। ওটা তার স্বভাব, ওতেই তাঁর আনন্দ!"

নমিতা মনে মনে একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। চার্ম্মিয়ান পুনরায় বলিলেন, "ডাক্তার মিত্র আদৌ সুবিধার লোক ন'ন্। তাঁর দৃষ্টিও যেমনি ছিদ্রান্বেষণে সূক্ষ্মদর্শী, রসনাটিও তেমনি তীব্র-কুৎসা-পরায়ণ। ভাল কথা, মিস্ মিত্র, তোমার উপর তিনি কেমন সন্তুষ্ট?"

নমিতার সমস্ত মুখমণ্ডল উচ্চ শোণিতোচ্ছ্বাসে রক্তোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আত্মদমন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, "অব্যবস্থিত-চিত্তানাং প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।—তাঁর সন্তোষ অসন্তোষ আমার পক্ষে সমান লোভনীয়।"

চার্ম্মিয়ান্ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বোঝ না; তুমি কাজের গণ্ডির বাইরে পা বাড়াও না, তোমার নাগাল ধরা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। তা ছাড়া, স্মিথ্ তোমার মুরুব্বি আছেন বলে, ডাক্তার বাধ্য হয়ে তোমায় খাতির করে চলেন। আর এক কথা, 'হাঁসপাতাল-গ্রাউণ্ডে'র মধ্যে আজকাল তাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখ্ছি; কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা ক'ন্ না!—ডাক্তার সত্যবাবু আর 'হেড্ কম্পাউণ্ডারের'

ওপর, মনে হয়, যেন খড়্গহস্ত হয়ে আছেন। ব্যাপারটা কি জান?"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; শুধু কাশিতে লাগিল।

চার্মিয়ান্ কয়মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "কিন্তু যাই বল, পর-ছিদ্রান্বেষণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি যতই তীক্ষ্ণ হোক্, কিন্তু নিজের ব্যবহার-সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ! এক এক সময় তাঁকে বেত্রাঘাত করে, তাঁর পদমর্য্যাদা স্মরণ করিয়ে দিতে আমার ইচ্ছা হয়!......"

চার্মিয়ানের রূঢ় সদিচ্ছার সংবাদ নমিতার কানে ঢুকিল কি না—ঈশ্বর জানেন; কিন্তু নমিতার কাশি অত্যন্তই বাড়িয়া উঠিল! চর্মিয়ান্ চুপ করিতে বাধ্য হইলেন। নমিতার কাশি থামিলে তিনি বলিলেন, "তুমি ডাক্তার মিত্রের বাড়ী যাচ্ছ, কিন্তু সেখানে তাঁর দেখা পাবে না ত! তিনি শব-ব্যবচ্ছেদ কর্‌তে গেছেন—।"

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া নমিতা বলিল, "সে জানি। আমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছি—।"

চার্মিয়ান্ বলিলেন. "ওঃ! আচ্ছা যাও।—তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমারও কিঞ্চিৎ আলাপ আছে। তিনি বেশ শিষ্ট-স্বভাবের ভদ্রমহিলা। এখানে যতগুলি বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে আমার জানা-শুনা আছে, তার মধ্যে তোমার মাকে আর ডাক্তারের স্ত্রীকে আমার বড় ভাল লাগে—।"

শেষের কথাগুলি চার্মিয়ান্ ভাঙ্গা বাঙ্গালাতে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং, সুশীল তাহার অর্থ বুঝিল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সোৎসুকে বলিল, "আর আমার দিদিকে—?"

হো-হো-শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া চার্মিয়ান্ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তোমার দিদিকে? আরে রাম! আমি আদৌ পছন্দ করি না, একেবারেই পছন্দ করি না!"

নমিতা হাসিতে লাগিল। সুশীল অপ্রতিভ হইয়া কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। হঠাৎ ফশ্ করিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা আপ্‌নিও আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আস্‌বেন চলুন না?"

"ধন্যবাদ" উচ্চারণ করিয়া, হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া চার্মিয়ান্ সহাস্যে বলিলেন, "অনুরোধ রাখ্‌তে পারলুম না ভাই, ক্ষমা কর। পনের মিনিটের জায়গায় সাড়ে পনের মিনিট খরচ করা আমার পক্ষে অসম্ভব! তোমরা যাও।"

চার্মিয়ান্ হাঁস্‌পাতালের পথ ধরিলেন, নমিতা ও সুশীল মোড় ভাঙ্গিয়া ডাক্তারের বাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইল। বাড়ীর দ্বারের কাছে আসিয়া প্রবেশোদ্যতা নমিতা মুহূর্ত্তের জন্য একবার থামিল। তাহার বক্ষের মধ্যে বিদ্রোহোন্মত্ত হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইল!—আত্মসম্বরণের জন্য হঠাৎ সে হেঁট হইয়া ব্যস্তভাবে জুতার গোড়ালীর কাছে ইতস্ততঃ কি যেন খুঁজিতে লাগিল ও মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিল:—ছিঃ! শিষ্টতা ও সৌজন্যের অনুরোধে এখনই যাঁহার সম্মুখে গিয়া প্রসন্ন-মুখে দাঁড়াইতে হইবে, তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে কেমন করিয়া সে মনের মধ্যে গুপ্ত অন্ধকারে অপ্রসন্ন বিদ্বেষ পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিবে? ন্নাঃ, এ

চাতুরী অসহ্য! ডাক্তার মিত্র যাহাই হউন্, নমিতা নিজের আত্মনিষ্ঠা বিসর্জ্জন করিবে কেন? পৃথিবীর যেমন অসীম হিংসা, অসীম বিদ্বেষ, অসীম ক্রূর নিষ্ঠুরতা আছে—তেমনই ভগবান্ মানুষের হৃদয়ে অনন্ত ক্ষমা, অনন্ত প্রেম, অনন্ত করুণা দিয়াছেন! নমিতা কিসের দুঃখে সে সব মূল্যবান সম্পত্তির অপ-ব্যবহার করিয়া, কোন্ দুষ্টবুদ্ধির প্ররোচনায় কেন প্রতারক দরিদ্রের মত দেউলিয়া খতে নাম সহি করিয়া নিজের মর্য্যাদা ডুবাইবে,—পরকেও অশান্তিতে মজাইবে?—না, সে হইতে পারে না। নমিতাকে স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে,—সে কোন্ পিতার কন্যা!—সংসারের সহস্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে সে যে আজিও নিজের মাথাটা বাঁচাইয়া চলিতেছে, সে শুধু ঐ একটিমাত্র অমর মন্ত্রের জোরে! —জীবনের যেখানেই কোনও দৈন্য-দুর্ব্বলতা তাহার হৃদয়কে হীনতায় অভিভূত করিতে চাহিয়াছে, সেইখানেই সেই স্বর্গীয় স্মৃতি তাহাকে নীরব শক্তি-মন্ত্রে, তেজস্বিনী ও প্রাণ-বতী করিয়া তুলিয়াছে! সকল বিপদে, অক্ষয়-কবচের মত তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, প্রতি-মুহূর্ত্তে তাহার চিত্তকে চেতনায় জাগ্রৎ করিয়া রাখিয়াছে, প্রতিদণ্ডে তাহাকে স্মরণ করাইয়া চলিতেছে,—সে শুধু এই বাহিরের রক্ত-মাংসে গঠিতা দেহসর্ব্বস্ব, নমিতা-নাম-ধারিণী একটা সামান্যা নারী নহে,—সে জগতের শ্রেষ্ঠশক্তি-সমবায়ে সংগঠিতা, একটা জীবন্ত প্রাণী! তাহার জীবনের উদ্দেশ্য —আত্মোন্নতি! সে আত্মোন্নতি সাধনে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাহাকে জলে ডুবিতে, আগুনে পুড়িতে,—নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ডকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না! সে-সাধনার জন্য সে সব করিতে পারিবে,—সব! একজন অবজ্ঞেয়, অশ্রদ্ধেয়, সকলের ঘৃণা-বিদ্বেষের পাত্রকে শ্রদ্ধা-সম্মান তাহার পক্ষে—তাহার ব্রতের পক্ষে—করা কি এতই কঠিন কাজ! কখনই না।

এক নিমেষে নমিতার সমস্ত মন অকপট প্রসন্নতায় পরিষ্কার নির্ম্মল হইয়া গেল! বাহ্যিক অবস্থা-বৈষম্যের প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব ও উৎ-পীড়নের হাত হইতে, এতক্ষণের পর সে যেন নিষ্কৃতি লাভ করিল,—আপনাকে ফিরাইয়া পাইল! আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সুশীলের হাত ধরিয়া নমিতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সিসিল, ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে নমস্কার কর্‌তে ভুলিস্ নি যেন!"

বিজ্ঞতার সহিত মাথা নাড়িয়া বুদ্ধিমান সুশীল ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, "যদি কথা বল্‌বার দরকার হয়, তা' হ'লে তাঁকে কি বলে ডাক্‌বো দিদি?"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "দিদিমণি।—"

(১৫)

নমিতা ও সুশীল উভয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সম্মুখে উঠান। ও-পাশে রান্না-ঘরের রোয়াকের উপর দিয়া, থর-চরণে একজন মাঝারি রকমের সুন্দরী মধ্যবয়স্কা বিধবা রমণী চলিয়া যাইতেছিলেন; নমিতাকে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন ও বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তুমি কেগা?"

নমিতা এ-কথার উত্তর দিবার জন্য পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল; সুতরাং, অম্লান-বদনে বলিল, "আমি হাঁসপাতালের 'নার্শ'। ডাক্তার-বাবুর স্ত্রী কোথায়?"

অসন্তোষের সহিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া সেই রমণী বলিলেন, "জানি নে কোথায়! ঐ ঘরে আছেন বুঝি, দেখো গে—।" মুখ ফিরাইয়া তিনি নিজের কাজে প্রস্থানোদ্যতা হইলেন।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার নমিতাকে কিছু বিপন্ন করিয়া তুলিল। রমণীর তীব্র অবজ্ঞাব্যঞ্জক দৃষ্টি নমিতার সহিষ্ণুতাকে একটা জোর ধাক্কা হানিয়া গেলেও, তাহাকে টলাইতে পারিল না। কুণ্ঠিত হইয়া নমিতা নিজের কাছে নিজেই জবাবদিহি করিল, "উহার দোষ নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে সকলেই অল্প-বিস্তর ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য হন।—ইহার জন্য ধৈর্য্যহারা হইব কেন?" খুব শান্তভাবে, সবিনয়ে সে পুনরায় বলিল, "যদি অনুগ্রহ কোরে একবার তাঁকে ডেকে দেন— !"

ঘোরতর তাচ্ছিল্যের সহিত চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বিরক্তি-কর্কশ কণ্ঠে রমণী ডাকিলেন, "ওগো, অ—বৌদিদি! বেরিয়ে দেখসে বাবু, কে এসেছে— !" এই বলিয়া রমণী দ্রুতপদে অন্য ঘরে গিয়া ঢুকিলেন; দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন না।

নমিতা প্রমাদ গণিল। তাহার দুর্ভাগ্য! এই অদ্ভুত-স্বভাবের মানুষটির সুস্থ মেজাজকে ব্যস্ত করিয়া, সে ইহার সম্বন্ধে ত বড়ই অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু এখন আর লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পিছু হটিবার পথ নাই! যখন গৃহে ঢুকিয়াছে, তখন গৃহকর্ত্রীর সহিত না দেখা করিয়া ফিরিবার উপায় নাই।

অনতিবিলম্বেই ও-দিকের বারেণ্ডায় একটি অর্দ্ধোন্মুক্ত গৃহদ্বার-পথে দুইটি উৎসুক দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে একটি স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠের প্রশ্ন আসিয়া নমিতার কানে পৌছিল—"কে গা?"

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া নমিতা বিস্মিত হইল!—ইনিই কি ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী!—আশ্চর্য্য সুন্দরী ত!......না, গায়ের চামড়াটা কটা নহে; কিন্তু কি স্নিগ্ধ কমনীয়তা উহাঁর শ্যামোজ্জ্বল অবয়বের উপর শান্ত মধুর রূপের ছটা বিছাইয়া দিয়াছে! যান্ত্রিক নির্দ্দেশ-মত পরিমাপ করিতে গেলে, উহাঁর মুখের গঠন, হয় ত, নিখুঁত সুন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না, কিন্তু কি নম্র কি ললিত ভাবের অভিব্যক্তি ঐ তরুণ মুখের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে! কি হৃদয়গ্রাহী সুন্দর একটা বিষণ্ণ করুণার ম্লান ছায়া ঐ শান্ত দৃষ্টির মাঝে নির্লিপ্তভাবে মিশিয়া রহিয়াছে! কি চমৎকার, কি অপরূপ রূপসী! নমিতার দৃষ্টি বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল! রমণীর 'কে গা—'প্রশ্নের উত্তরে সে আপনার পরিচয় দিতে ভুলিয়া গেল!

রমণী ক্ষণেক পরেই উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতায় বলিয়া উঠিলেন, "ও, আপ্‌নি কুমারী মিত্র!—চিনিছি চিনিছি! মাপ করুন। নমস্কার!—আসুন!" এই বলিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া রমণী নমিতার হাত ধরিয়া কৃতজ্ঞ-কোমল কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, "আপ্‌নি আজই এখানে কষ্ট করে যে পায়ের ধূলা দেবেন, এত সৌভাগ্যের আশা ত আমি করি নি! আপ্‌নার অনুগ্রহকে কি বলে ধন্যবাদ দোবো?"

এই উচ্ছল আদরপূর্ণ অভ্যর্থনা-স্রোতে নমিতা যেন নূতন করিয়া বিচলিত হইয়া পড়িল! সঙ্কুচিত হইয়া সে বলিল, "এ কি

কথা! আপ্‌নি আমায় স্মরণ করেছেন, এ ত আমার গৌরবের বিষয়!—এ আনন্দে কষ্ট আবার কি?"

নমিতা মুখে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু কথাটার সহিত পরিপূর্ণ আন্তরিকতার যোগ হইল কি না, তাহা সে নিজেই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিল না।—মনে মনে অনুতাপবিদ্ধ হইয়া, আত্ম-সংশোধনের চেষ্টায় প্রসঙ্গান্তর টানিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নি আমায় দেখ্‌বামাত্র চিন্‌লেন কি করে—?"

সলজ্জ হাস্যে তিনি বলিলেন, "আপ্‌নি রাস্তা দিয়ে হাঁসপাতালে যান আসেন, আমি জানালা থেকে প্রায়ই দেখি!"

সুশীল বিস্ময়ে এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে রমণীকে নিরীক্ষণ করিতেছিল;—এইবার মৌন ভঙ্গ করিয়া অযাচিত আগ্রহে প্রশ্ন সুধাইয়া বসিল,—"আপ্‌নিই কি কুমার আর কিশোরের মা?"

রমণী সরল হাস্যের সহিত খুব সহজ ভাবে উত্তর দিলেন, "হাঁ ভাই, তা'রাই আমাকে 'মা' বলে।—আর তোমার নাম ত সুশীল? তোমাকেও আমি এর আগে দেখিছি। ছেলেদের কতদিন বলিছি, তোমাকে একবার ডেকে আন্‌তে, কিন্তু ওরা ত কথার বাধ্য নয়!"—এই বলিয়াই তাড়াতাড়ি কথাটা উল্টাইয়া লইয়া নমিতার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আসুন, কতক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন?"

উক্ত সুমধুর আহ্বান করিয়াই তিনি সুশীলের হাত ধরিয়া নমিতার সহিত বারেণ্ডা পার হইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। নমিতা এই সুযোগে তাঁহার সম্পূর্ণ আকৃতিটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।—শীর্ণ, দীর্ঘ, সুগঠিত ঋজু অবয়ব;—স্নায়ুপ্রধান-প্রকৃতির মানুষের স্পষ্ট পরিচয় সর্ব্বাঙ্গে প্রকটিত। শ্যাম-স্নিগ্ধ লাবণ্যোজ্জ্বল ক্ষীণ তনুটির চলন-ফেরন সমস্তই যেন ঈষৎ ক্লান্তি-অলস। ক্ষীণশক্তি ফুস্‌-ফুস্‌-দুইটী বাক্যোচ্চারণের জন্য শক্তিব্যয় করিয়া যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িতে চাহে; কণ্ঠস্বরের মাত্রা হ্রাস হইয়া যায়, নিঃশ্বাস হঠাৎ যেন রুদ্ধ হইয়া আসে, রক্তহীন মুখে পাণ্ডু বিবর্ণতা অধিকতর ম্লান হইয়া ঘনাইয়া উঠে। শীর্ণ দুর্ব্বল হাত-পাগুলা যেন নিজের শক্তিতে সচল নহে। তাহাদিগকে শুধু জবরদস্তি করিয়া খাটাইয়া যেন কাজ আদায় করা হইতেছে,—এমনই লক্ষণ। কিন্তু আশ্চর্য্য পার্থক্য তাঁহার বিশাল উজ্জ্বল শোভাময় চক্ষু-দুইটিতে! তাঁহার নিস্তেজ ক্ষীণ আকৃতির মধ্যে এই আশ্চর্য্যজনক তেজস্বী দীপ্তিময় করুণা-সজল চক্ষু-দুইটি বড় চমৎকার বিশেষত্বপূর্ণ! ইহাঁকে ঠাহর করিতে হয়, শুধু যেন ইহাঁর চক্ষু দেখিয়া;—নচেৎ ইহার মধ্যে আর কিছু লক্ষণীয় আছে বলিয়া বোঝা যায় না। তাঁহার পরিধানে সামান্য একখানি সাড়ী ও সেমিজ। গলায় প্রকাণ্ড মোটা 'নেক্‌লেশ';—ক্ষীণ কণ্ঠ ও অপ্রশস্ত বক্ষের উপর সে কণ্ঠহার যেন অত্যন্ত বিসদৃশ ও ভারজনক হইয়া উঠিয়াছে। হাতে মোটা মোটা জল-তরঙ্গ চুড়ি; খুব টক্‌টকে গিনি সোণার জিনিস বটে, কিন্তু শীর্ণ প্রকোষ্ঠের উপর তাহার বৃহৎ আয়তন ও বিপুল পুষ্টতা আদৌ শোভনীয় মনে হইতেছে না।

নমিতা দেখিল, যে ঘরটায় তাহারা ঢুকিয়াছে, সে ঘরখানি বসিবার ঘর; অন্ত

পক্ষে পোষাকের ঘরও বলা চলে। দেয়ালের গায়ে হুকে কতকগুলা 'কোট্' 'প্যান্ট' ঝুলিতেছে; ঘরের মেঝেয় মাদুরের উপর কতকগুলা বস্ত্রাদি স্তূপাকার করা রহিয়াছে। বোধ হয়, সেগুলা এই মাত্র 'ব্রাস্'-মার্জ্জনা করিয়া, গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। এক পাশে পোষাকের দেরাজ; তাহার উপর আয়না চিরুণী ব্রাস্ সাজান রহিয়াছে। পাশে টেবিল, খান-দুই চেয়ার, একটা বেতের মোড়া। দেয়ালের গায়ে খানকতক বাঁধান ছবি ও ফটো। একটা টেনিস ব্যাট্ এক পাশে ঝুলিতেছে। আরও দুই-চারিটা খুচরা জিনিস আছে।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সুশীলকে একটা চেয়ারে ধসাইয়া দিলেন। নমিতা মোড়াটা টানিয়া লইয়া, অন্য চেয়ারখানি ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর দিকে টানিয়া দিলে, তিনি হাসিয়া তাহা অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, "আপ্নি বসুন! কিছু মনে করবেন না। আগে এই পোষাকের বোঝাটা সাম্নে থেকে সরাই, তারপর...।"

তিনি পোষাকগুলা লইয়া দেরাজে তুলিতে তুলিতে পুনরায় বলিলেন, "আপ্নাকে এমন ভাবে গায়ে-পড়ে জ্বালাতন করার জন্যে আপ্নি কি মনে কর্ছেন, জানি নে; কিন্তু আমি পরিচয় পেয়েছি, আপ্নি আমাদের 'পর' নন্। আপ্নার দাদা অনিলবাবু,—যিনি এখন বিলেতে রয়েছেন, তাঁর সহপাঠী বন্ধু অক্ষয় সেনের নাম, বোধ হয়, শুনে থাক্বেন।"

উৎসুক হইয়া নমিতা বলিল, "বিলক্ষণ! অক্ষয়-দা ত আমাদের বাড়ীর-লোক ছিলেন; আমার দাদার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আপনার—?"

দেরাজটা পোষাক বোঝাই করিয়া, ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সস্মিত-বদনে বলিলেন, "তিনি আমার মামাত ভাই। এবার মামার বাড়ী গিয়ে সব খবর শুনলুম্।"

তিনি নমিতার খুব কাছে আসিয়া মেঝের উপর বসিলেন ও সলজ্জভাবে বলিলেন, "আমার ভয় হয়েছিল যে, যে-সম্পর্কের ছুতোয় আপ্নার উপর উপদ্রব কর্তে যাচ্ছি, আপ্নি, হয় ত, তা ভুলে গেছেন। সেই জন্যে চিঠিতে সব খুলে লিখ্তে পারি নি; ক্ষমা কর্বেন। আপনার বাবার কথাও সব শুন্লুম; তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন।"

নমিতার বুকের ভিতর উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ঠেলিয়া উঠিল, চোখ-দুইটা অনিচ্ছায় অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। সে কথা কহিতে পারিল না।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর মুখেও বিষণ্ণতার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া তিনি নমিতার হাতখানি টানিয়া লইয়া, বেদনা-করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "তাঁর অকাল-মৃত্যুতে আপ্নাদের সংসারটার বড় ক্ষতি হয়েছে! আপ্নি পড়াশুনা ছেড়ে এখন 'নার্শে'র কাজ কর্ছেন শুনে অক্ষয়-দা কত দুঃখু কর্লেন।"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "বাবার মৃত্যুর পর অবস্থা মন্দ হওয়ায়, পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের সংস্রব থেকে আমরা এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।—তা ছাড়া দূর-দেশে চলে আসাও হয়েছে! আমি যে 'নার্শে'র কাজ কর্ছি, এ কথা অক্ষয়-দা'র মত

অনেকেই জানেন না। আমি ইচ্ছে করেই জানাই নি ; জানি, তাঁরা শুনে শুধু দুঃখিত হবেন।”

বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, “আপনাদের ভাই বোনের ছেলে-বেলার বুদ্ধি-প্রশংসা যা শুনে এলুম, সে সবই দেখ্‌ছি অক্ষরে অক্ষরে ঠিক্‌! আপ্‌নাকে ভক্তি কর্‌তে আমার ইচ্ছা হচ্ছে।”

অপ্রস্তুত নমিতা, পরিহাসের অন্তরালে লজ্জার দায় এড়াইবার জন্য, স্নিগ্ধ হাস্যে বলিল, “ও ইচ্ছাটা আপাততঃ মুলতুবী রাখুন। আমাদের সেই ছেলেবেলার দাদা অক্ষয়বাবুর আপ্‌নিও যেমন ছোট বোন্‌, আমাকেও তাই মনে কোরে নিন্‌।”

নমিতার হাতখানা ঈষৎ পীড়ন করিয়া তিনি বলিলেন, “সে ত নিয়িচিই ; দেখুন না, কত দূরের সম্পর্ক খুঁজে টেনে নিয়ে এলুম!”

নমিতা বলিল, “ভাগ্যেশ, খুঁজে টেনে-ছিলেন! আমি ত কিছুই জান্‌তুম না। আমার মা শুন্‌লে কত সুখী হবেন—!”

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী হঠাৎ বিচলিত ভাবে বলিলেন, “কিন্তু আপ্‌নাদের ডাক্তারবাবু এখনো কিছু জানেন না।”

নমিতা চমকিয়া উঠিল! নূতন পরিচয়ের আনন্দে পুরাতন কথা সে যেন এক নিমেষে সব ভুলিয়া গিয়াছিল ; ডাক্তার বাবুর নাম পর্য্যন্ত! সহসা অতর্কিত খড়্গাঘাতের মত এই আনন্দের মাঝে একটা কড়া ঘা পড়িয়া যেন তাহাকে ত্রস্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলিল। নমিতার মনে পড়িল, যাহার সহিত সে কথা কহিতেছে, তিনি তাহাদের হাঁসপাতালের ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রী!—সেই ডাক্তার প্রমথ মিত্র—! যিনি—! সঙ্গে সঙ্গে, কে জানে কেন, একটা গুপ্ত উদ্বেগ যেন তাহার কণ্ঠ নিষ্পেষণ করিয়া ধরিল! নমিতার মনে হইল, “উঠিতে পারিলে বাঁচি! আর এখানে এক মুহূর্ত্তও নয়!”

নমিতার আভ্যন্তরিক চাঞ্চল্য, ডাক্তার-বাবুর স্ত্রী বুঝিলেন কি না, বলা যায় না ; কিন্তু বোধ হইল, তিনি যেন একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ-দিক ও-দিক চাহিয়া তিনি বলিলেন, “আপ্‌নি ত অনেক দিন আগে অক্ষয়-দাকে দেখেছেন। এখন তাঁর ফটো দেখ্‌লে চিন্‌তে পারেন?—দ্যালের গায়ে ঐ ফটোখানায়—!”

নমিতা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া, অত্যা-বশ্যক আগ্রহে ফটোর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রাণপণে দৃষ্টি সংযত করিয়া একাগ্র মনোযোগে ফটো দেখিতে লাগিল। তাহার ভয় হইতেছিল, পাছে এই মুহূর্ত্তে ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর সহিত তাহার চোখোচোখী হইয়া যায়!—পাছে তিনি তাহার মুখ দেখিয়া অন্তরের প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ টের পান্‌!...... ছি, ছি, সে বড় লজ্জা, বড় দুঃখের বিষয়! নমিতার মনের মধ্যে অস্বস্তি ও কুণ্ঠা যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

পরক্ষণে, তাহার মনের সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিক্ষেপ যেন স্নেহার্দ্র সৌহৃদ্যে বিগলিত করিয়া, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “অক্ষয়-দাকে চিন্‌তে পারলেন্‌ নি? এই দেখুন, তাঁর চেহারা!” এই বলিয়া তিনি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন। নমিতা এতক্ষণে ফটোর উপর যথার্থ মনো-যোগ দিবার শক্তি পাইল। প্রসন্ন হাস্যে সে বলিল, “হাঁ চিনিছি ; অনেক বদলে

গেছেন। এ-খানা কত দিন আগে তোলা হয়েছিল?"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তিন বৎসর। আর এই দেখুন, এরা সব আমার মামার বাড়ীর ছেলে; এদের কাউকে চিন্‌তে পারবেন না।—আর এ পাশে ইনি আমার মা—!"

"বিধবা!—"এই বলিয়া বিস্ময়-ব্যথিত দৃষ্টি তুলিয়া নমিতা ডাক্তারের স্ত্রীর পানে চাহিল। তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি যখন খুব ছোট, তখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়েছে। বাবার কথা ভাল মনেও পড়ে না।"

নমিতার মন অভিভূত হইয়া পড়িল! নিজের পিতার কথা মনের ভিতর জ্বল্‌-জ্বল করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে মাতার বর্ত্তমান অবস্থাও স্মরণ হইল। বিষণ্ণ করুণ দৃষ্টি তুলিয়া সে চিত্রের সেই জীবন্ত বেদনাঙ্কিত বিধবা-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল! তাহার বুকের উপর যেন গভীর বিষাদ চাপিয়া বসিল!

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আচ্ছা, এ চেহারাটা কা'র বল্‌তে পারেন্?—এই যে কোলে কচি ছেলে? যার পাশে বসে,—এই যে এক হাতে পাখা—?"

নমিতা মূর্ত্তিটা দেখিল; তাহার পর ডাক্তারের স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "আপ্‌নার কি?—না, ও চেহারা যে বড্ড ছেলেমানুষের বোধ হচ্ছে! আপ্‌নার ছোট বোন্ বোধ হয়।"

হাসিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "না, আমি-ই—।"

সবিস্ময়ে নমিতা বলিল, "বলেন কি! তিন বৎসরে এত পরিবর্ত্তন! আপ্‌নার বয়স এখন—?"

তিনি বলিলেন, "উনিশ বছর! ষোল বছরে ঐ ছেলেটি আমার হয়েছিল। মাস-তিনেক বেঁচেছিল, কিন্তু এক দিনের জন্যে সে সুস্থ ছিল না। দেখ্‌ছেন, কত কাহিল চেহারা...!"

নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "তা'হ'লে কি কুমার-কিশোর আপ্‌নার ছেলে নয়? তারা আট-দশ বছরের করে হবে, নয়?"

সুকোমল হাস্যে তিনি বলিলেন, "আপ্‌নি বুঝ্‌তে পারেন নি? আমি তাদের বিমাতা!—দেখুন, ও ছেলেটা এত সকাল সকাল গেছে বলে, আমার কিছু দুঃখু নেই;—কিন্তু আমার মত স্বাস্থ্যহীনা দুর্ভাগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, ও যে পৃথিবীতে একদিনের জন্য সুস্থতার মুখ দেখ্‌তে পায় নি, এটা আমার বড় দুঃখু আছে!"

ব্যথিতা নমিতা ইহার উত্তরে কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। অথচ একটা কিছু বলা চাই; তাই কোন মতে আত্মদমন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তারপর আর আপ্‌নার ছেলে হয় নি?"

উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া, মুখে সেই পূর্ব্বের স্নিগ্ধ কোমল হাস্যমাধুরীটুকু জোর করিয়া টানিয়া ফুটাইয়া তিনি বলিলেন, "আর বল্‌বেন না! একজনের জীবনের ওপর দিয়ে যথেষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিছি; আর অপরাধের মাত্রা বাড়াতে কামনা নেই। শ্বশুরের বংশধর যারা বেঁচে আছে, তারা দীর্ঘজীবী হোক্, আপ্‌নারা এই আশীর্ব্বাদ

করুন।” হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, “আপ্‌নারা বসুন ;—আমি চা করে আনি। আপ্‌নার হাঁসপাতাল যাওয়ার আর বেশী দেরি নেই, সেটা ভুলে যাচ্ছিলুম।”

নমিতা ‘হাঁ,’ ‘না,’ কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নমিতা ফাঁফরে পড়িল ; একটু ইতস্ততঃ করিয়া অগত্যা আবার আসিয়া নিজের স্থানে বসিল।

সুশীল নমিতার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, “দিদিমণি বেশ ভাল লোক, নয় দিদি ? আচ্ছা, কুমার আর কিশোরকে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে কেন বল দেখি ? নির্ম্মলবাবুই বা কোথায় ?”

অন্যমনস্কা নমিতা বলিল, “কি জানি—!”

সুশীল। এবার দিদিমণি এলে জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো ?”

“কর্‌তে পারিস্—” এই বলিয়া নমিতা অন্যদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল !

সহসা দ্বারের নিকট হইতে তীব্র কর্কশ কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ঝঙ্কার হানিয়া কে বলিয়া উঠিলেন, “বৌদিদি, ওগো বৌদিদি ! বলি সারা-ক্ষণই কি গল্প নিয়ে—!”

নমিতা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল,—সেই তিনি !—বাড়ী ঢুকিয়াই প্রথমে যাঁহার সুমধুর অভ্যর্থনায় সে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল ! তখন দূর হইতে সে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, এবার ভাল করিয়া দেখিল :- রমণীর কঠিন ভ্রূভঙ্গীটুকু অত্যন্ত ভয়ানক বটে ! তাঁহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া অকারণে যেন একটা ক্রূর-বিদ্বেষ ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছে। রমণীর দৃষ্টি-সঞ্চালনে রমণীয়তার লেশমাত্র নাই ; আছে শুধু, কঠোর শাসন ও কর্ত্তৃত্বের দম্ভ ! নমিতার মুখের উপর সেই কঠোর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন, “ঠাক্‌রুণ গেলেন কোথা ? ঢং করে উনুনে আগুন দিতে বলে ,উনি –! এখানে নেই ?”

নমিতা দৃষ্টি নামাইয়া বলিল, “না, তিনি বেরিয়ে গেছেন।”

এতখানি শাসন-কর্ত্তৃত্ব নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইয়াছে, দেখিয়া রমণী নিজের প্রতি ক্ষুণ্ণ হইলেন। অনাহূতচিত্তে নিরাপদে প্রস্থিতা শাসিতার উপর রাগও, বোধ হয়, কিছু বাড়িল। কিন্তু আপাততঃ সেটা চাপিয়া যাওয়া ভিন্ন গতি নাই দেখিয়া, তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া, ঘরে ঢুকিয়া নমিতার সম্মুখে দুই কোমরে দুই হাত রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তুমি, বুঝি, হাঁস্‌পাতালে দাদার কাছে চাক্‌রী কর ?”

নমিতা বুঝিল, ‘দাদা’, অর্থাৎ প্রথম মিত্র ! কিন্তু কাহার কাছে চাক্‌রী করে, তাহার সবিশেষ সংবাদ খুলিবার দুর্ভোগ সহ্য করা অপেক্ষা ইহার কথায় সায় দিয়া সুস্থ হওয়াই বেশী সুবিধা, বুঝিয়া নমিতা সংক্ষেপে বলিল, “হুঁ !”

শূন্য চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া, প্রচণ্ড আত্মম্ভরিতার প্রতিমূর্ত্তির মত রমণী সগর্ব্বে উঁচু হইয়া জাঁকিয়া বসিলেন। রান্নাঘরের ধোঁয়ার গন্ধে সুগন্ধ ও বহুদিনের সঞ্চিত তৈল, কালী ও হলুদের রঙে সুচিত্রিত পরিধেয়ের আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে তিনি অবজ্ঞামিশ্রিত অনুগ্রহে নমিতার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নমিতা

কত মাহিনা পায়, সে টাকাগুলা কি করে, সে কেন আজিও বিবাহ করে নাই, কোথাও তা'র বর ঠিক্ আছে কি না, এবং সে কিরূপ বর-বিবাহ করিবে, ইত্যাকার প্রশ্নের সমস্যা ভঞ্জন করিতে করিতে নমিতা বিব্রত হইয়া হাঁপাইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে মুক্তিদাত্রী শান্তিময়ীর মত ডাক্তারবাবুর স্ত্রী একটা থালার উপর দুই 'কাপ্' চা ও দুইখানা রেকাবীতে খাদ্য-দ্রব্য সাজাইয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন, এবং তাহাদের প্রশ্নোত্তরের মাঝে পড়িয়া সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে রসভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "উঠুন কামাই যাচ্ছে, বামুনদিদি! আপ্নার মোহনভোগ তৈরী করে নিয়ে, ভাত চড়িয়ে দিন্ গে, যান্।"

বামুনদিদি আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন, "খাবার হবে না?—জল-খাবার?"

হাতের থালাখানা মেঝের উপর নামাইয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "না; ঠাকুরপো কিশোরকে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বাগান-ভোজ করতে গেছেন; আজ রাত্রে তাঁরা কেউ কিছু খাবেন না। আপ্নার দাদার লুচি,—সে সব-শেষে হবে।"

সুশীল বলিল, "কুমার কোথা?"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "সে তার ঠাকুমার সঙ্গে দেশে গেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বামুনদিদি শ্লেষ-ঝঙ্কৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "সে ছেলের কথা ছেড়ে দাও। 'ন্যাকা' নেই 'পড়া' নেই, ইস্কুল কামাই কোরে নেচে বেড়ানই তার কাজ। অমন যে বাঘের মত বাপ, তাকেও সে ভয় করে না! আর তাও বলি, বাপের ত গেরাজ্জ্যি নেই!...না হলে, ছিষ্টি সংসারে সৎমা আর কা'র নেই বাপু? এই যে কিশোর তার চাইতে কত ছোট! সে কি সৎমার কাছে থাক্‌তে পার্‌ছে না?—না, সৎমা তাকে যত্ন করছে না? নিমু তাই কাল কত রাগ কর্‌ছিল যে, ঠাকুমাই আদর দিয়ে নাতির মন বিগ্‌ড়ে দিলে!"

তাহাদের পারিবারিক তথ্য শুনিবার জন্য নমিতার কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না। কিন্তু বামুনদিদির দুরন্ত রসনার ভাষা এমনই অনর্গল উচ্ছ্বাসে উৎসারিত হইয়া গেল যে, নমিতাও নির্ব্বাক্ ভাবে সমস্ত শুনিতে বাধ্য হইল!

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী টেবিলের কাছে গিয়া কতকগুলা ক্রুশ, কাঁটা, পশম, সূতা লইয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি অপরিচিতা নমিতার সম্মুখে, সাংসারিক প্রাণীগুলির এই সব পরিচয় প্রকাশ হওয়ার ব্যবস্থায় অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। নমিতাও লজ্জিতা হইল। এ-বিষয়ের বাড়াবাড়িটা এইখানে শেষ করিবার জন্য, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার আর দশ মিনিট মাত্র দেরী আছে; আজ তা হ'লে উঠি। সুশীলকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে।"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী একটা ক্রুশ ও সবুজ রেশমের এক গুলি সূতা লইয়া নমিতার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, "স্মিথের কাছে শুনিচি, আপ্নার কাছে অনেক রকম 'নেক্‌টাই'য়ের নমুনা আছে। যদি অনুগ্রহ করে আমায় একটা নমুনার গোড়া তুলে দেন—!"

সাগ্রহে হস্ত বিস্তার করিয়া নমিতা বলিল

"বেশ ত দিন্; আমি কালই আপ্নাকে পাঠিয়ে দোবো।"

নমিতার হাতে সূতা ও ক্রুশ দিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বামুনদিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বামুনদিদি, উনুন কামাই যাচ্ছে, ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে আসুন!"

"যাই—"বলিয়া বামুনদিদি উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

ছিন্নপুষ্প।

একদৃষ্টে কি দেখিতে তুমি,
যত দিন ছিলে এ ধরায়?—
কা'র সাথে হ'ত তব কথা,
আধ আধ নূতন কথায়?
কিসের তরে তত হাসি তব,
খিল্ খিল্ আপনার মনে?—
জিজ্ঞাসিলে বার-বার তবু,
কও নি' কথা আমাদের সনে!
এসেছিলে সবার শেষে তুমি;
গেলে কেন সবার আগে চলি?
কি জানি কি উপদেশ কেবা
কানে কানে দিয়া গেলে বলি!
আঁধার ঘরের মাণিক তুমি,
ঘরে মোর জ্বেলেছিলে বাতি!
অসময়ে চলে গেলে কেন,
একলা ফেলে, না পোহাতে রাতি?
দেবের পূজার শুভ্র ফুল!—
এর যোগ্য নহে ত এ ধরা!
তাই বুঝি না ফুটিতে ওগো,
তুলে নিল আগে হ'তে ত্বরা!

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গানের স্বরলিপি।

পূরবী—একতালা।

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে;
শূন্য ঘাটে একা আমি;
পার্ করে' লও, পার্ করে' লও, পার্ করে' লও, খেয়ার নেয়ে!
ভেঙ্গে এলাম খেলার বাঁশি,
চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি;
সন্ধ্যা-বায়ে, শ্রান্ত কায়ে, ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে।

ও-পারেতে ঘরে ঘরে,
সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিল রে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির 'পরে ;
এস এস শ্রান্তি-হরা,
এস শান্তি-সুপ্তি-ভরা ;
এস এস তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

II { গা ক্ষা পক্ষা। গা গঋা সঋসা। ন্‌া -সন্‌া সা। ঋা গা -া } I
বে লা গে ০ ল ০ তো মা ০ র প ০ ০ থ চে য়ে ০

I গক্ষা -গক্ষপা পা। পা পা -া। পা ক্ষপা -ক্ষপা। ক্ষপা গা -া I
শূ ০ ০ ০ ন্য ঘা টে ০ এ ০ কা ০ ০ আ ০ মি ০

I গা -ক্ষগা ক্ষা। পক্ষা গা -া। গা -ক্ষগা ক্ষা। পক্ষা গা -ঋা I
পা ০ র্ ক রে ০ ল ও পা ০ র্ ক রে ০ ল ও

I গা -ক্ষগা ক্ষা। পক্ষা পনা -ধনধা। পা ক্ষা -পক্ষা। গক্ষা গক্ষপাঃ-ক্ষাঃ II
পা ০ র্ ক রে ০ ০ ল ও ০ ০ খে য়া ০ র নে ০ ০ ০ য়ে ০

II { -া -া গপা। গা পা ধা। ধা র্সা -নর্সর্রা। র্সা র্সা -া I
০ ০ ভে ঙ্গে এ লাম খে লা ০ ০ র বাঁ শি ০

I র্সা র্সা নর্সা। না ধা -া। ধা -না ধনর্সা। নধা পধপাঃ -ক্ষাঃ } I
চু কি ০ য়ে এ লে ম কা ০ ০ ন্না ০ ০ হা সি ০ ০ ০

I গক্ষা -গক্ষপা পা। পা পা -া। পা -ক্ষপা ক্ষপা। ক্ষপা গা -া I
স ০ ০ ০ ন্ধ্যা বা য়ে ০ শ্রা ০ ০ ০ ন্ত কা ০ য়ে ০

I ক্ষা পা -ক্ষপনা। ধা পা -া। ক্ষপা গাঃ -ক্ষাঃ। গক্ষা গক্ষপাঃ -ক্ষাঃ I
ঘু মে ০ ০ ০ ন য় ন ০ আ সে ০ ছে ০ ০ ০ য়ে ০

[সা সা -পা]
[{ গা গক্ষা -গক্ষপা । পা পা -া । পা ক্ষপা -ক্ষপা । ক্ষা গা -া I
ও পা • • • • রে তে • ঘ রে • • • ঘ রে •

I গা -া ক্ষা । গক্ষা -পা পক্ষা । গা গক্ষা -গক্ষপা । ক্ষপা গা -া I
স • ন্ধ্যা • দী • • প জ্ব লি • • • • ল • রে •

| -া -ঋা ঋা । গা ঋা ঋা । সা -া সা । সন্‌া -সা সা I
• • আ র তি র শ • ঙ্খ বা • • জে

| সা সা -পা । পা পা -ক্ষা । গা -মা গঋা । ঋা ঋা সা } I
সু দূ • র ম • ন্দি • র • প • রে

| { -া -া গা । গা পা ধা । ধা র্সা -নর্সর্রা । র্সা র্সা -া I
• • এ স এ স শ্রা ন্তি • • • হ রা •

| -া র্সা নর্সা । না -ধা ধা । ধা -না ধনর্সা । নধা পধপাঃ -ক্ষাঃ } I
• এ • স শা • ন্তি সু • প্তি • • ভ • • • রা •

[গা গক্ষা -পা । পা পা -া । পা ক্ষপা -ক্ষপা । ক্ষা গা -া I
এ স • • এ স • তু মি • • • এ স •

I ক্ষা পা -ক্ষপনা । ধা পা -া । ক্ষপা গাঃ -ক্ষাঃ । গক্ষা গক্ষপাঃ -ক্ষাঃ II
এ স • • • তো মা র • ত রী • বে • য়ে • • •

সুর-সহযোগে তালের বোল্।

I সা র্সর্রা র্সা । র্সা পা ধা । মা পা পধা । পমগা গা মা I
| খুব তার নাম্ । বেশ্ ধুম্ ধাম্ । কয় দিন্ পরে । সকলি সুম্ সাম্ I
I ধিন্ ধিন্ ধা ধা থুন্ না ক ত্তে ধাগে তেটেকেটে ধিন্ ধা I

বঙ্গে কৃষির উন্নতি।

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য-শ্যামলাং"—এই কয়টী কথায় বাঙ্গালা-দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশের তুল্য উর্ব্বরা স্থান আর কোথাও নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য স্থানে কৃষি-বিষয়ে উন্নতি করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, বাঙ্গালা-দেশের স্বাভাবিক অবস্থাতেই তাহা লাভ হয়। সুতরাং, এখানে কৃষিবিষয়ে আরও উন্নতি হইলে, দেশের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভাগেই গঙ্গা এবং তাহার শাখানদী-সকল প্রবাহিত। এই সকল নদীর পলি পড়িয়া কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করে এবং নদীর জল অনেক স্থান প্লাবিত করিয়া মৃত্তিকাকে সরস করিয়া দেয়।

দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং সমুদ্র-তীরস্থ সুন্দরবন জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও সে-সকল স্থানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ী হইতে সুন্দরবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড অত্যন্ত উর্ব্বরা।

বঙ্গদেশের বার্ষিক বারিপাত সাধারণতঃ ৬০ ইঞ্চি। এখানকার লোক-সংখ্যা ৪৬, ৩০৫,৬৪২; ইহার ভূমির পরিমাণ ৮৪,০৯২ বর্গ-মাইল। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের অন্তর্গত নিম্নলিখিত 'ডিভিসন' বা বিভাগ আছে। যথা,—বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি ডিভিসন, দার-জিলিং, রাজসাহি, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম। ইহার মধ্যে কুচবিহার এবং পার্ব্বত্যভূমি ত্রিপুরাও অবস্থিত।

বঙ্গদেশের সমগ্র ভূমির পরিমাণ ৫০, ৪৭৯,৯৮৪ একর; তন্মধ্যে আবাদের উপযুক্ত ৩৬,০৭০,৩৬৭ একর; আবাদের অনুপযুক্ত ১০,১৫২,৬২৭ একর; এবং জঙ্গল ৪,২৫৬,৯৯০ একর। বঙ্গদেশের ২॥০ বিঘাতে এক একর পরিমাণ জমী হয়।

বাঙ্গালা-দেশে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাহারা বাঙ্গালীই হউন বা অন্যদেশবাসীই হউন, প্রায় সকলেই চাউলের অন্ন আহার করিয়া থাকেন। প্রত্যেক লোক, ছোট-বড়, গড়ে প্রতিদিন আধ সের চাউলের অন্ন ব্যবহার করিলে প্রত্যেকের বাৎসরিক প্রায় ৪॥০ (সাড়ে চারি) মণ চাউল প্রয়োজন হয়। সাড়ে চারি মণ চাউল প্রস্তুত করিতে ৭ মণ ধান্যের প্রয়োজন। অতএব সমগ্র অধিবাসীর অন্ন সরবরাহের জন্য বাঙ্গালাদেশে বাৎসরিক ৩২৪,১৩৯,৪৯৪ মণ ধান্যের প্রয়োজন। প্রতি-বিঘায় ৬ মণ ধান্য হইলে, সমস্ত লোকের উক্ত হারে আহারের জন্য ৫৪০২৩২৪৯ বিঘা, অর্থাৎ ২১,৬০৯,২৯৮ একর জমীতে ধান্যের চাষ হওয়া প্রয়োজন।

১৯১৩-১৪ সালের সরকারী রিপোর্টে জানা যায়, বাঙ্গালা-দেশে কত জমীতে কোন্ শস্যের আবাদ হইয়াছিল। যথা,—

ধান্য—১৯,৭২৫,০০০ একর।
গম—১৪৪,০০০ একর।
যব—৯৪,০০০ একর।
দালের শস্য—১,৬০২,০০০ একর।
তৈল-শস্য—১,৮০৫,০০০ একর।
ইক্ষু—২৭৭,০০০ একর।
তুলা—২৬,০০০ ”
পাট—২,৭১৬,০০০ ”

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা-দেশের অন্ন-সংস্থানের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাহা হইতে অল্পই ধান্য উৎপন্ন হয়; পরন্তু অধিক নহে। তাহা হইতেও যদি আবার বিদেশে ধান্য রপ্তানি হয়, তাহা হইলে দেশে অন্নাভাব অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালা-দেশের উন্নতি করিতে হইলে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত, যাহাতে ধান্য বিদেশে রপ্তানি না হয়। প্রত্যেক গ্রামের ধনবান্ লোক যদি কৃষক-দিগের নিকট হইতে ধান্য ক্রয় করিয়া, তাহাই আবার কৃষকদিগের নিকট ধারে খাটান, তাহা হইলে কৃষকদিগেরও উপকার হয় এবং তাঁহারাও তাহাতে লাভ করিতে পারেন। বাঙ্গালা-দেশ নিজের ধান বাহিরে পাঠাইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল কিনিয়া খায়। একটু সুবন্দোবস্ত হইলে, আমাদের ধান্য আমাদের দেশে থাকিয়া ব্রহ্মদেশের জিনিস বিদেশে যাইতে পারে।

বাঙ্গালাদেশের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এখানে মানুষ অন্যান্য অনেক স্থানের ন্যায় অন্নাভাবে কষ্ট পায় না। সে যতই দরিদ্র হউক না কেন, বাঙ্গালাদেশে সকলেই দুই বেলা অন্নাহার করিতে পায়; উপবাস বা অল্পভোজনে কাহাকেও কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু বিহার প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ দরিদ্র লোক এক বেলাও পেট ভরিয়া আহার পায় না। অন্নাহার ত দূরের কথা, নিকৃষ্ট জাতীয় শস্যও তাহাদের প্রচুর পরিমাণে জোটে না। বাঙ্গালা-দেশের দুর্ভিক্ষ-কষ্টও অন্য দেশ অপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। এ সকলের মূল কারণ, বাঙ্গালা-দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি অধিক, এবং বাঙ্গালাদেশের কৃষকগণ কৃষিকার্য্য ভালরূপ জানে।

সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে বাঙ্গালা-দেশে ৩২ কোটী অধিবাসী কৃষিকার্য্য করে, তন্মধ্যে ৩ কোটী অধিবাসী কৃষক এবং অবশিষ্ট তাহাদিগের ভৃত্য বা কুলি। অর্থাৎ বঙ্গদেশের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে ৪/৫ অধিবাসী কৃষি-কার্য্যে ব্যাপ্ত।

বাঙ্গালাদেশে ধানের জমিই অধিক; রবি-শস্য বা আউসের জমী অল্প। ধানের জমীতে পাটের চাষ হইয়া থাকে। পাটের চাস যত অধিক হইবে, ধানের চাষ সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে। কিন্তু পাটের মূল্য এত অধিক যে, ধানের চাষ অপেক্ষা, পাটের চাষ করাতেই লাভ বেশী। ধানের পরিবর্ত্তে যদি পাটের চাষে দেশে অধিক অর্থাগম হয়, তাহাতে দেশের তত ক্ষতি হয় না। দেশের উন্নতির পক্ষে পাটের চাষের প্রয়োজন। দেশের ধান্য যদি বাহিরে চলিয়া না যায়, তাহা হইলে পাটের চাষে উপকার ব্যতীত অপকার হয় না।

রবি-শস্যের জমী বাঙ্গালাদেশে অতিশয় অল্প। সেই কারণে, সকল প্রকার রবিশস্যের বাঙ্গালাদেশে আবাদ করা হয় না। তামাক, চা, নীল, তুলা, তিসি, সরিষা, তিল, মকাই, ছোলা প্রভৃতি অতিশয় অল্পেরই আবাদ এখানে হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা-দেশের ভবিষ্যদ্-উন্নতি-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, কৃষি-সম্বন্ধে আলো-চনাই প্রথমে আবশ্যক। কৃষিকার্য্যে উন্নতি না হইলে, বাঙ্গালা-দেশের অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির আশা নাই। কারণ, অন্নসংস্থান প্রথমেই আবশ্যক।

আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মিষ্টার জন ওয়ানামেকার (Mr. John Wanamaker—a cabinet officer of America) ভারতবর্ষে আগমন করিলে, লক্ষ্ণৌ-সহরে কলেজ-গৃহে তাঁহাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি তখন একখণ্ড খড়ি লইয়া বোর্ডে লিখিয়া দিলেন—

India Needs
Heads to think,
Hearts to feel,
Hands to work.

অর্থাৎ, ভারতবর্ষে এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি, হৃদয়বান্ ব্যক্তি এবং কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির অভাব।

তিনি নানাকথা-প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, নিজ-নিজ উন্নতি ও দেশের উন্নতির জন্য *Infra dig*—ashamed to dig—অর্থাৎ মৃত্তিকা-খননে লজ্জা বোধ করিলে চলিবে না। 'There is no honest work that can degrade me'.—সাধুতার সহিত কার্য্য করিলে, আত্মোন্নতির জন্য যে কোন কার্য্যই করি, তাহাতে লজ্জা নাই।

বাঙ্গালা-দেশের উন্নতির জন্য বঙ্গের সন্তানগণকে খাটিতে হইবে। যেখানে ছোট ছোট-লোকেরা অগ্রসর হয় না, সেখানে ভদ্রসন্তানগণ নিজেরাই বনজঙ্গল কাটিয়া তাহাদিগকে পথ দেখাইবেন। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে-সকল উপায় গ্রহণ আবশ্যক, ভদ্রসন্তানেরা তাহা নিজ-হস্তে করিয়া দেখাইবেন ও ছোট-লোকদিগকে তাহা করিতে শিখাইবেন। গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে গ্রামের উন্নতির জন্য নিজে খাটিয়া সাধারণ লোককে উৎসাহিত করিতে হইবে।

বঙ্গে কৃষির উন্নতি হইলে, বঙ্গের ম্যালেরিয়া চলিয়া গেলে, বাঙ্গালা-দেশ আবার সত্যই সোনার বাংলা হইবে। তখন তাহার সহিত শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতি আপনা হইতেই আসিবে।

বঙ্গদেশের কৃষির উন্নতি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহার পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা আবশ্যক।

১ প্রজাসত্ব-বিষয়ক আইন।

কৃষকগণ যে জমী লইয়া চাষ-আবাদ করিবে, তাহাতে তাহাদের সত্বসম্বন্ধে গোলযোগ থাকিলে, তাহাদের কার্য্যে ব্যাঘাত হয়। একজন কৃষকের হয় ত ১০ বিঘা জমী আছে, কিন্তু সে অপর জমী ক্রয় করিয়া জোত বাড়াইতে ইচ্ছা করিলে, নানা-প্রকার গোলমালে পড়িয়া থাকে। কোন জমীদারের আম্‌লা ক্রেতার নিকট চৌথ চাহিবেন, কেহ কেহ ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের নিকট হইতেই চৌথ চাহিবেন, কেহ বা রসিদ ক্রেতার নামে দিবেন না, কেহবা পৃথক্ সেলামী চাহিবেন, ইত্যাদি নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। একজন প্রজার মৃত্যুর পর, তাহার ওয়ারিসের নাম খারিজ করিতে কোন কোন জমিদারের আম্‌লাগন কতই ওজর-আপত্তি করিয়া থাকেন। কোন প্রজা উইল করিয়া গেলে, জমিদারের আম্‌লাদের অনেক স্থলে গোলমাল বাধাইবার একটা পন্থা হয়। এই প্রকার বিভ্রাট অনেক স্থলে দেখা যায়। আইন-আদালতে প্রজাকে কত সময় যাইতে হয় ও কৃষিকার্য্যে অবহেলা করিয়া মকদ্দমা

লইয়াই থাকিতে হয়! ইহা বাঙ্গালা-দেশে বিরল নহে।

প্রজাসত্ব-সম্বন্ধে পরিষ্কার আইন না থাকিলে, কো-অপারেটিব সোসাইটির কার্য্যেও নানাপ্রকার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। বেহার অঞ্চলের কো-অপারেটিব বিভাগের সরকারী রিপোর্টে (১৯১৩-১৪) এই বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে :—

"Another subject discussed at the conference was the importance from the co-operative point of view of settling once for all the question of transfer of occupancy right...... It was agreed that the leaving of this right to be governed by local custom has proved disastrous to both landlord and ryot alike, since it is responsible for a large proportion of agrariculitigation, which involves all classes whether they will or no."——

"কন্‌ফারেন্সে আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, যাহাতে প্রজাসত্ব বিক্রয়-সম্বন্ধে সকল প্রকার কথার একেবারে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। এইরূপ মত প্রকাশ করা হয় যে, স্থানীয় প্রথার উপর প্রজাসত্ব বিক্রয়ের প্রশ্ন ছাড়িয়া দেওয়ায় প্রজা এবং জমিদার উভয়ের পক্ষেই ভয়ানক কুফল ফলিয়াছে। কারণ, ইহার ফলে গ্রাম্য মকদ্দমা অধিক পরিমাণে হইয়াছে, যাহাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেককে জড়িত হইতে হইয়াছে।"

অতএব প্রজাসত্ব-আইন-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরিবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন :—

(ক) প্রজার মৃত্যুর পর, তাহার ওয়ারিস বা যাহার নামে উইল হইয়াছে, কলেক-টরিতে দরখাস্ত দিলেই, জমিদার তাহার নামে রসিদ দিতে বাধ্য হইবেন।

(খ) প্রজাসত্ব ইচ্ছানুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় হইতে পারিবে। জমিদার কেবলমাত্র খাজনার দ্বিগুন,—বা যেরূপ গবর্ণমেণ্ট উচিত মনে করেন,—সেলামী পাইবেন। এই ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে কলেক্টরিতে দরখাস্ত ও টাকা জমা দিলেই জমিদার ক্রেতার নামে রসিদ দিতে বাধ্য হইবেন।

(গ) কো-অপারেটিব ব্যাঙ্কের টাকার জন্য প্রজার ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রের শস্য উভয়ই আইনের মধ্যে বাধ্য থাকিবে; তবে, জমি-দারের ও গবর্ণমেণ্টের পাওনার নিমিত্ত তাহা সর্ব্বপ্রথম বাধ্য বিবেচিত হইবে।

(ঘ) প্রজা নিজের জমি যেরূপে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

নীরা।

(গল্প)

শরতের সন্ধ্যাগমের অনতিপূর্ব্বে নদী-তীরবর্ত্তী উদ্যানে দাঁড়াইয়া কিশোরী নীরা সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত মেঘের দিকে চাহিয়াছিল। আর সেই নবীনার নব-সৌন্দর্য্য-বিভাসিত অপূর্ব্ব মুখের দিকে চাহিয়া ধীরেন তাহার প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিল।

কোমল স্নেহপূর্ণ-স্বরে ধীরেন আবার প্রশ্ন করিল, "বল নীরা!" নীরার উন্নত দৃষ্টি এবার নত হইয়া ভূমি-সংলগ্ন হইল। কম্পিত কণ্ঠে সে উত্তর করিল, "তুমি ত সবই জান; নীরার হৃদয়ে যদি কেহ স্থান পায়, সে কেবল তুমি—"

ধীরেন ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, "নীরা! তোমার কথা শেষ কর।"

তখন নীরার দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিল। সে সেই তৃণাশনে ধীরেনের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "মার্জ্জনা কর, তোমার নীরাকে মার্জ্জনা কর।—তুমি স্বর্গের দেবতা, আমি তুচ্ছ ধূলীকণা তোমার চরণের রেণুরও যোগ্যা নহি, প্রভো! অবলাকে প্রলুব্ধ করিও না। আমি স্বর্গের দেবতাকে কোন্ প্রাণে ধূলার আসনে লুটাইব? আমি এ উন্মত্ত ভালবাসা চিরদিন বক্ষে লুকাইয়া জীবন কাটাইব। তুমি নীরাকে পরিত্যাগ কর—।" নীরার অশ্রুধারা কণ্ঠ-রোধ করিল।

ধীরেন সেই অবনত মুখ দুই হাতে তুলিয়া বক্ষে স্থাপন করিল; বস্ত্রে নীরার চক্ষু মুছাইয়া বলিল, "নীরা, আমিও তো জগতে আর কিছু চাহি না; শুধু তোমারই আশায় জীবন ধরিয়া আছি! বল নীরা, তুমি আমারই—।"

ধীরে ধীরে নীরা ধীরেনের বক্ষ হইতে মুখ উঠাইয়া একটু সংযত হইয়া বসিল। পরে সেই শান্ত স্থির নীল চক্ষু-দুইটি ধীরেনের মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "তুমি আমার হৃদয়ের দেবতা। কিন্তু তোমার বিবাহিত-পত্নীরূপে তুমি নীরাকে পাইবে না।"

বিস্মিত ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

নীরা কহিল, "কেন! তুমি কি নীরাকে এতই হেয় মনে কর? তাহার এই ভালবাসা কি এতই নীচ, স্বার্থপরতাপূর্ণ মনে কর যে, সে নিজের সুখ-লালসায় তোমার সর্ব্বনাশ করিবে? মনে করিয়া দেখ, তুমি কে, আর আমি কে! তুমি রাজ্যেশ্বরের পুত্র, মাতাপিতা তোমারই মুখ চাহিয়া জগতে আছেন। তোমার সন্তানের উপর তোমার এই বিপুল বংশের সুখ-সম্মান নির্ভর করিবে। সেই তুমি যদি আজ অজ্ঞাতকুলশীলা মাতা-পিতৃহীনা দরিদ্রের গৃহে প্রতিপালিতা নীরাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যাও,—ভাবিয়া দেখ, সমাজ কোন্ থানে তোমায় স্থান দিবে! তোমার অবাধ-সুখময় গৃহের দ্বার চিরদিনের জন্য তোমার চক্ষে রুদ্ধ হইবে। তোমায় ভালবেসে নীরা শেষে রাক্ষসী সাজিবে!

বাধা দিয়া ধীরেন বলিল, "যাক্ নীরা, সব যাক্; আমি ত কিছুরই প্রত্যাশী নহি; কেবল তোমাকেই চাহি। পাষাণী, তোমার ভালবাসায় আমার ভালবাসায় অনেক তফাৎ। তুমি অনায়াসে আমাকে ফেলিয়া দিবে, কিন্তু চাহিয়া দেখ, তোমার জন্য আমার প্রাণ কি আকুল বেদনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! নীরা, কেন তোমায় দেখিয়াছিলাম—!"

নীরা বলিল, "সত্যই! কেন আমাদের দেখা হইয়াছিল, জানি না!"

তখন চন্দ্রদেব মাথার উপর অনেকখানি উঠিয়াছিলেন। নৈশ কুসুমকোরকগুলি ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিস্তার করিতে-ছিল! বহুক্ষণ উভয়ে নিজ-নিজ চিন্তায় নিমগ্ন ছিল!—সহসা কে ডাকিল, "নীরা!" চকিত

হইয়া নীরা উত্তর করিল, "যাই—।" গমনোদ্যতা নীরার হস্ত ধারণ করিয়া ধীরেন বলিল, "কাল আবার দেখা দিবে ?"

উত্তরে নীরা কহিল,"দেখ, আমাদের আর বেশী দেখা হওয়া কি ভাল ? অবলার কতটুকু হৃদয়বল !—তাহাকে আর এরূপ করিয়া আঘাত করিও না।"

ধী। নীরা, জানি না, তুমি কি পাষাণে গঠিত ! কিন্তু তুমি যাহাই হও, ধীরেন তোমারই।

নীরা চলিয়া গেল।

রাত্রে পিতার আহারের নিকট বসিয়া নীরা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমাদের বসন্তপুরের বাটী একেবারে কি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ?"

পিতা কহিলেন, "কেন রে ? সে খোঁজ তোর কেন আসিল ?"

নী। কি জানি বাবা ! এক জায়গায় ভাল লাগে না। দুই দিন কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে।

পিতা। গৃহাদি ভাঙ্গিলেই বা কি ! মা আর ছেলেটী ব্যতীত আর ত কেহ নাই ! ভিটের উপর একখানি কুটীর তুলিয়া কয়দিন কাটাইয়া আসিতে পারিব। কিন্তু সম্মুখে এমন নদীটি আর ফুলের বাগানটি ত আর নাই মা ! স্নান করিয়া আসিয়াই বৃদ্ধ পুত্রের পূজার আয়োজন করিবে কিরূপে ? তাহার উপর জমীদার-বাটীর বিবাহটা দেখিয়া যাইবে না ?

নীরা কহিল, "ঐ বাবার যত ছুতা ! বাবা ! এখান হইতে এক পা নড়িতে চাহ না কেন, বল দেখি ?"

মুষ্টিবদ্ধ আহারের গ্রাস হস্তে রাখিয়া, বৃদ্ধ একবার স্নেহভরা সজল চক্ষুদুইটি নীরার মুখের দিকে তুলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঠিক্ বলিয়াছ মা ! জগদম্বা এইস্থানে আবার নূতন করিয়া সংসার-বিরাগীর পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়াছেন কিনা ! তাই এখানকার মায়ার টান বড় বেশী হইয়াছে ! আচ্ছা মা, তোমায় লইয়া আমি একবার বসন্তপুর বেড়াইয়া আসিব।"

(২)

বৃদ্ধ কন্যাকে লইয়া বসন্তপুর যাত্রার আয়োজন করিলেন। প্রাতঃকালেই যাত্রার কথা। গ্রামের মাধব ঘোষের গো-যান ঠিক্ করা হইয়াছে। ধীরেন ইহা শুনিতে পাইয়া অতিপ্রত্যুষে নীরার নিকট আসিয়া বলিল, "নীরা ! এ কি !" ঈষৎ হাসিয়া নীরা উত্তর করিল, "কি হইয়াছে ?"

ধী। কি হইয়াছে ! যাওয়া হইতেছে কোথায় ?

কৌতুকপূর্ণ চক্ষু-দুইটি ধীরেনের মুখের দিকে ফিরাইয়া নীরা বলিল, "বসন্তপুর, বসন্তপুর !"

"নীরা, তুমিই সুখী ! তোমার অন্য চিন্তা, অন্য সুখ আছে। হায় ! আমিই শুধু অভাগা ! জগতে আমারই আর কিছুই নাই !" এই বলিয়া অভিমানী ধীরেন দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিল। হাতের ফাঁক গলাইয়া অশ্রুজল বহিয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া নীরা মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে মৃদুস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "একটি কথা বলি ; সত্য উত্তর দিবে ?"

ধীরেন বলিল, "এতদিন পরে জানিলে কি আমি মিথ্যাবাদী !"

নীরা কহিল, "ভাবিলে ত বাঁচিতাম! তোমার এ কথার বাঁধনে আমায় শতপাকে আর জড়াইতে পারিতে না।"

ধী। তবে বল কি?

নীরা বলিল, "অমলার সঙ্গে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় নাই কি?"

ধীরেন বলিল, "হইলেই বা? কে তাহাকে বিবাহ করিবে? আমার জগৎ একদিকে, আর তুমি নীরা,—তুমি একদিকে!"

সবিস্ময়ে নীরা বলিয়া উঠিল, "এ কি কথা!"

ধীরেনের কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "ঠিক্ কথা নীরা! সব ত্যাগ করিয়া তোমায় গ্রহণ করিব।"

দৃপ্তা ফণিনীর মত নীরা বলিয়া উঠিল, "কখনই নহে! তুমি যাও! আমায় আর ডুবাইও না। নীরা কখনও তোমার স্ত্রী হইবে না।"

নীরা ফিরিত, কিন্তু উন্মত্ত ধীরেন তাহার পায়ের উপর যখন আছাড় খাইয়া পড়িয়া কহিল, "নীরা! তুমিও বিমুখ হইলে!" হতভাগী তখন সেইস্থানে বসিয়া পড়িল ও অশ্রুসিক্ত মুখে ডাকিল, "উঠ উঠ।—নীরার তুমিই সর্ব্বস্ব।"

কাঁদিয়া ও কাঁদাইয়া নীরা ধীরেনের নিকট বসন্তপুর গমনের জন্য বিদায় লইল। কিন্তু দূরে আসিয়া এ কি কষ্ট! এ কি যাতনা! কিন্তু যাহাই হউক্ না, নীরা সকলই সহিয়া থাকিবে! ধীরেন তাহাকে ভুলুক্! ধীরেন কি তাহাকে ভুলিতে পারিবে? না।—কেন পারিবে না?—সে যে পুরুষ।

দারুণ মনঃকষ্টে দুইমাস কাটিয়া গেল। একদিন পিতা বলিলেন, "নীরা, আর ত মা, এখানে থাকা যায় না!" নীরা কহিল, "কেন বাবা?"

কন্যার প্রতি চাহিয়া একটু সস্নেহ হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "মা কন্যা বড় হইলে পিতার কন্যা-দায় হয়, তাহা ত তুমি জান!"

নীরা কিয়ৎক্ষণ লজ্জিতার ন্যায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু আমি জানিতাম আমার পিতার কন্যাই আছে, দায় নাই।"

পিতা হাসিয়া বলিলেন, "পাগল কোথাকার!"

নী। বাবা, একটা কথা বলিব?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "কি মা?"

নী। বাবা, তোমার মেয়ে ত অনেকদিন বড় হইয়াছে! আজ তোমার এত দায় হইল কিসে? আর তোমার যদি-বা দায় হইয়া থাকে, তোমার এ কুড়ানো মেয়ে লইতে লোকের তো দায় নাই!

বৃদ্ধ কহিলেন, "এতদিন ছিল না; এখন লোকেরও দায় হইবে।"

উৎসুক ভাবে নীরা পিতার মুখের প্রতি চাহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "শোন মা! আজ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, এই বসন্তপুরের ভিটায়, আমার সংসারের আপনার বলিতে যাহা কিছু, সকলই কালের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আমি বাহির হইয়া পড়ি ও কেবল নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই। শেষে ধীরেনের পিতা তাঁহার গ্রামে আমাকে জমী দিয়া বাস করান। প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিব ও অবশিষ্ট কাল তাঁহারই নামগুণ-গানে

কাটাইব, সংকল্প করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিন মহামায়া তাঁহারই চরণের আশীর্ব্বাদের মত নদীগর্ভ হইতে তোমাকে তুলিয়া আমার হাতে সমর্পণ করিলেন। মা! সে-কথা সকলই তোমায় বলিয়াছি। তুমি তখন দুই-বৎসরের অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা! জলে পাইয়াছিলাম বলিয়া 'নীরা' বলিয়া তোমাকে ডাকিতাম। প্রথম প্রথম তোমার মাতাপিতার অনেক সন্ধান করিয়া, শেষে হতাশ হইয়া তোমার প্রতিপালনে আমি মন দিয়াছিলাম। দিবারাত্র আমার মনে জাগিত—"যাহার কেহ নাই, তাহারই সব" হইবার জন্যই জগন্মাতা বালিকারূপে আমার গৃহে আসিয়াছেন!"

বৃদ্ধ একটু চুপ করিলে, নীরা বলিল, "এ-সব তো শুনিয়াছি বাবা!" বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "হ্যাঁ মা, এইবার শেষটুকু বলি। আজ ৪।৫ দিন হইল, সংবাদপত্রে তোমার মাতাপিতার সন্ধান পাইয়াছি!"

নীরার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল! আকুল আগ্রহে সে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "শোন মা, অত অধীর হইও না; তাঁহারা ইহ-সংসারে নাই। তবে তাঁহাদের পরিচয় জানিয়াছি। নীরা, তুমি সৎকুলোদ্ভবা ব্রাহ্মণ-কন্যা। তোমার পিতা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তোমার জনক-জননী তোমাকে লইয়া যখন ত্রিবেণীতে নৌকা করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, তখন তুমিই তাঁহাদের একমাত্র সন্তান! দৈবক্রমে নৌকা ডুবিয়া যায় ও আমার এই স্থলপদ্ম-মাকে আমি কুড়াইয়া পাই! তোমার জননীরও, বোধ হয়, তাহাতেই মৃত্যু হয়; কেন না, তাঁহার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তোমার পিতা অনেক কষ্টে প্রাণ লইয়া কর্ম্মস্থানে যান ও তোমাদের সন্ধান করেন, কিন্তু নিরাশ হইয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি অগাধ সম্পত্তি ও একমাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। যদি প্রথমা স্ত্রী বা কন্যা জীবিতা থাকে, এই ভাবিয়া তোমাদের জন্যও তিনি সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তোমার সেই বৈমাত্র ভ্রাতাই এখন তোমার সন্ধানে বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছেন।"

নীরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কাজ কি পিতা, আর সম্পত্তিতে! পিতার অভাব আমার নাই; তবে যদি মাকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও বা আবার পুরাতন সম্পর্ক ধরিয়া লইতাম। যখন সে সবই গিয়াছে, তখন আমরা যাহা আছি তাহাই ভাল।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তাহাও কি হয় মা! আমি আর কয় দিন! নীরা! তোমায় উপযুক্ত পাত্রে দান করিয়া সুখী দেখিলেই, আমি নিশ্চিন্তে শ্রীহরির চরণে আশ্রয় লইতে পারিব।"

এইবার নীরার চক্ষে জল আসিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

বৃদ্ধ কন্যার মস্তকের উপর সন্তর্পণে হাত রাখিয়া বলিলেন, "মা! একটি কথা বলি, লজ্জা করিও না; যথার্থ উত্তর দাও। মা, আমি অনেক দিন হইতে অনুমান করিতেছিলাম যে, তুমি ও ধীরেন পরস্পরের প্রতি অনুরাগী। এটী কি যথার্থ?"

নীরা কোনও উত্তর দিতে পারিল না। তাহার মুখ মাটির দিকে নত হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "মা, সে অতিশয় অসম্ভব কাণ্ড বলিয়া, আমি দেখিয়া শুনিয়াও উদাসীন ছিলাম; কিন্তু এখন তোমার যাহা পরিচয় জানিয়াছি, তাহাতে তুমি জমীদার-বধূর অযোগ্যা নও! কিন্তু মা! বিধাতার অন্য ইচ্ছা! ধীরেনের সহিত রজনীর কন্যা অমলার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে; আর এক পক্ষ পরেই বিবাহ হইবে।

কন্যাকে আরও কাছে টানিয়া তিনি বলিলেন, "মা! তোমার মূর্খ পিতার যতটুকু সামর্থ্য ছিল, তোমায় শিক্ষা দিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, তাহা অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। দেখ মা, তুমি যদি ধীরেনকেই পতি ভাবিয়া থাক,—এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পুত্রের তুমি তাপসী মা—সুতরাং, ইহাতে ভোগের কামনায় তোমার পবিত্র প্রাণ নিশ্চয়ই কাতর হইবে না!"

নীরা তখন মনে মনে বলিল, 'তাহাই বল পিতঃ, যেন তোমার উপযুক্ত কন্যা হইতে পারি।'

(৩)

নীরা যখন পিতার সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল, তখন জমীদার-বাটীর বিবাহের গোল একেবারে থামিয়া গিয়াছে। বধূর রূপ, গুণ ও অলঙ্কারের কথা এবং আহারের পারিপাট্যের বর্ণনা লোকের মুখে মুখে চলিতেছিল মাত্র। নীরা ভাবিল, "বাঁচিলাম! ধীরেনের সঙ্গে আর দেখা হইবে না। অমন পত্নী পাইয়া ধীরেন নিশ্চয়ই সুখী হইয়াছে। একটু হাসিয়া সে ভাবিল, ধীরেন এই প্রেমের এত গর্ব্ব করিত!

পরদিন তখনও জগতে ভাল করিয়া আলোক ফুটিয়া উঠে নাই! প্রভাত গগনে উষার নবীন আভা ধীরে-ধীরে দেখা দিতেছিল! সুশীতল বায়ু তড়াগ-সলিলে বীচিমালার সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে তালে-তালে নাচাইতেছিল! দুরন্ত বালকের দলের মত পাখীর ঝাঁক আকাশ-গাত্রে উড়িয়া উড়িয়া গান গাহিতেছিল! নীরা স্নান করিয়া কূলে উঠিয়াই দেখিতে পাইল, কে যেন তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! ভাল করিয়া দেখিতেই নীরার বক্ষের রক্ত জল হইয়া গেল। সেখান হইতে সে আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না; মাটির দিকে চাহিয়া মাথা নত করিল।

ধীরেন নিকটে আসিয়া ডাকিল, "নীরা! এতদিনে ফিরিলে! কি পাষাণী তুমি! একবার মুখ তোল, নীরা! আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

নীরার প্রথমে বাক্য সরিল না; ধীরেনের সেই আকুল-বাণী তাহার অবোধ মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত-পরেই সে সচেতন হইয়া উঠিল। নিম্নদৃষ্টি ধীরেনের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সে বলিল, "তুমি এখানে কেন? আমাকে দেখিতে আসিয়াছ! তোমার পরিণীতা পত্নীকে গৃহে ফেলিয়া তস্করের মত পর-নারীর অনুসরণ করিতেছ! পথ দাও, আমি গৃহে যাই।"

বিস্মিত ব্যথিত ধীরেন ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "ভুল! ওঃ—কি ভুল বুঝিয়াছি! নীরা আমায় ভালবাসে! নীরা, প্রেম কি যদি জানিতে, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যদি কাহাকেও হৃদয় সমর্পণ করিতে, তাহা হইলে আজ আমায় এরূপ করিয়া দূর করিতে পারিতে

না,—সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যের আজ্ঞায়! তাহার প্রতি কর্ত্তব্য-পালন তাহাও তাহারই আজ্ঞায়! কিন্তু এ উত্তাল হৃদয়াবেগ সংযত করিব কাহার আজ্ঞায়? প্রেমের এ মন্দাকিনীর বেগের নিকট সংসারের সকল শক্তি যে ভাসিয়া যায়, নীরা! নীরা, একবার চক্ষের দেখা, তাহাও দিবে না?"

হায়! অভাগীর বুকের ভিতর রুদ্ধ রোদন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল! মৃদুস্বরে অনেক কষ্টে কণ্ঠ খুলিয়া নীরা উত্তর দিল, "না—।"

ধী। আচ্ছা, তাহাই ভাল! কিন্তু নীরা, জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখনই এমন হইলে? না, চিরকালই এইরূপ ছিলে? আমি কি নিজের স্বপ্নের প্রমাদে বিভোর হইয়া তোমায় প্রেমের রাণীরূপে দেখিয়াছিলাম? বল, নীরা, একদিনও কি তুমি আমায় ভালবাস নাই?

কত সহে! অবলার দুর্ব্বল হৃদয়ে কত সহে! নীরা আর পারিল না। ধীরেনের পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "ক্ষমা কর, ধীরেন! ক্ষমা কর! প্রেম উত্তাল নহে, প্রেম অসংযত নহে, প্রেম ক্ষণভঙ্গুর নহে! তুমি অমলাকে বিবাহ করিয়াছ; তাহাকে লইয়া চির-সুখী হও! কিন্তু আমার চক্ষের সম্মুখ হইতে তুমি সরিয়া না যাইলে, আমার কি হইবে! আমাকে আর প্রলোভন দেখাইও না। তোমারই চরণ সাধনা করিয়া আমায় জীবন কাটাইতে দাও; প্রেমের অমর্য্যাদা করিতে দিও না!—আমার ভালবাসায় তোমার সংসার যেন বিষ না হয়!" নীরার চক্ষে অশ্রুধারার পর অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ধী। তাহাই হইবে নীরা! হতভাগ্য ধীরেন আর তোমায় দেখা দিবে না। কিন্তু হয় ত, দিনান্তে একবারও সে গোপনে তোমার অজ্ঞাতে তোমায় দেখিয়া যাইবে! নীরা, তাহাতে বঞ্চিত করিলে, ধীরেন আর বাঁচিবে না।

(৪)

সেই শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন কুটিরের দ্বারে একদিন কালের ভেরী বাজিয়া উঠিল। নীরার বৃদ্ধপালক সংসারের কাছে সকল হিসাব চুকাইয়া অনন্তপথে যাত্রা করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে পদতলে আসীনা রোদনরতা কন্যাকে আশ্বাস দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "মা, মানুষ কখনই আশ্রয়হীন একাকী হয় না! সেই অসহায়ের সহায় সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বদাই আমাদের রক্ষক আছেন। মা, তাঁহার নাম-গানে কখনই বিরক্ত হইও না। যদি কখনও আত্মীয়ের আশ্রয়ের আবশ্যকতা হয়, তোমার ভাই আছেন, সেখানে যাইও। রামচরণ রহিল, বাল্যে যে তোমায় বক্ষে করিয়া পালন করিয়াছে। তুমি নিশ্চিন্তে ইহার উপর নির্ভর করিতে পার।"

কিন্তু সকল কথা জানিলেও মন মানে কই? সেই চিরস্নেহময় চিরাশ্রয় পিতার অভাবে আজ জগৎ যেন নীরার শূন্য অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল! যে চিরদিন নির্ভরশীলতায় দিন কাটাইয়াছে, আজ ভীতিপ্রদ সংসারের উত্তপ্ত বালুকাতে সে কি করিয়া দেহ-প্রাণ রক্ষা করিবে! হায়! অভাগিনী নীরা আজ কাহার মুখে চাহিবে! শূন্যগৃহে শূন্য হৃদয় লইয়া ভূমিতে লুটাইয়া লুটাইয়া যখন নীরা কাঁদিতেছিল, তখন একখানি স্নেহকোমল হস্ত ধীরে ধীরে নীরার ললাট স্পর্শ করিল। সে স্পর্শ কি মধুর,—কি স্নেহময়! নীরার এত যে দুঃখ,এত

যে কষ্ট, সব যেন সেই স্পর্শের মধ্যে লুকাইতে চাহিল! ধীরেন ডাকিল,– "নীরা!" সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখে তাহা বাধিয়া গেল। সে-দিন নীরা ধীরেনকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। ধীরেনের পদযুগলের ভিতর মুখ লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া সে কাঁদিতে লাগিল! হায়! এ চরণ-দুইটি যে নিরাশ্রয়ার মহান্ আশ্রয়! ইহা তাহার যে চির-ঈপ্সিত স্বর্গ! আজ কি নীরা এ চরণ ছাড়িতে পারে!!

ধীরেন ধীরে ধীরে বলিল, "নীরা, এইবার আমাদের গৃহে চল। এখানে একাকিনী কি করিয়া থাকিবে?"

নীরা অসম্মত হইয়া বলিল, "তাহা হইতে পারে না! পিতার এই আশ্রমটুকুতে পড়িয়াই দিন কাটাইব।"

ধী। নীরা! এখন তুমি একাকিনী! তাহার উপর তুমি স্ত্রীলোক! তোমার পিতার যাহা আছে, তাহাতে তোমার গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে সত্য! কিন্তু আমি দাস-দাসী রাখিয়া দিই; নতুবা তোমায় দেখিবে কে?

নীরা মৃদুস্বরে দৃঢ়তার সহিত বলিল, "না। আমার কিছুরই আবশ্যকতা নাই। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, আমি সন্ন্যাসিনী! কিন্তু তথাপি দেখ, মন কি দুর্দ্দমনীয়! আজ তোমায় দেখিয়া আর মনকে বাঁধিতে পারিলাম না। তুমি আমাকে বিস্মৃত হও, নতুবা সংসারে সুখ পাইবে না; সুখদুঃখে যাহাকে জীবনের সঙ্গিনী হইবার জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়াছ, তাহারও প্রতি অন্যায় করিবে! আমাকেও তোমায় ভুলিতে দাও; আর আমার কাছে আসিও না! দেখ, এ হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল! তুমি বড় লোভনীয় বস্তু! এ হতভাগ্যা নারীর সর্ব্বনাশ করিও না!" ধীরেন নীরবে চলিয়া গেল।

হায়, দারুণ দর্প কোথায় রহিল! নীরা যে আর পারে না। এখন দারুণ শোকে ও দুঃখে নীরার সেই দুঃখহারী মুখটী সম্মুখে যে জাগিয়া উঠে! যখন পিতার সঙ্গহীনতায় প্রাণ আকুল হয়, তখনই ধীরেনের সঙ্গ পাইবার জন্য তাহার ক্ষুধিত প্রাণ যে হাহাকার করিয়া উঠে! একবার সেই মুখখানি দেখিলে যেন নীরার সকল যাতনার শান্তি হয়! কিন্তু সে কেমন করিয়া তাহা হইতে দেয়? ধীরেনের সাধের সংসারে কি নীরা আগুন লাগাইবে! কিছুতেই না! তাহার এ নারীজীবন পণ করিয়া সে সংগ্রাম করিবে।

নাঃ! আর চলে না! শেষে কি নীরা পাগল হইয়া যাইবে? সে রামচরণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিল, সে গ্রাম ছাড়িয়া তাহার ভ্রাতার নিকট চলিয়া যাইবে; রামচরণ পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।

(৫)

নীরা তাহার ভ্রাতার নিকট আসিল। তখনও গৃহে বধূ-সমাগম হয় নাই; সুতরাং, গৃহস্থলীর কাজ অনেক। সংসারটা যখন গোছান-গাছান একরকম হইল, তখন সে ভ্রাতার বিবাহের তাগাদা আরম্ভ করিল। ছোট ভাই!—কি মিষ্ট জিনিস! নীরার যে বুক কেবলই খাঁ খাঁ করিত, ভ্রাতৃস্নেহে আজ নীরা তাহাতে অনন্ত অক্ষয় তৃপ্তি আস্বাদন করিল! শৈশবে মাতৃহীন, অধুনা পিতৃহীন, ললিতও এই ভগিনীর স্নেহনীড়ে ধরা দিল।

হায়! স্নেহাতুর প্রাণ যে কেবলই আশ্রি-

চাহে ! যখন গৃহকার্য্যে অবকাশ পাইত, তখনই নীরা বাটীর নিকটবর্ত্তী বালিকা-বিদ্যালয়টিতে গিয়া বসিত। সময় সময় সে বালিকাদিগকে শ্লোক শিখাইত। কখনও বা আবশ্যক হইলে, কোনও শিক্ষয়িত্রী নীরার উপর ভার দিয়া দুই দিন ছুটি লইতেন। কর্ম্মহীন জীবন অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই! এখন নানা-কর্ম্মের মধ্যে নীরা নিঃশ্বাস ফেলিল।

একবৎসর পরে গৃহে নববধূ আসিলে নীরার কাজ আরও বাড়িল। এইবার নীরা নিশ্চিন্ত হইল; ধীরেনকে, বুঝি, সে ভুলিতে পারিবে।

এইভাবে ক্রমে চারি বৎসর কাটিয়া গেলে ধীরে ধীরে নীরার হৃদয়ে আবার মেঘ দেখা দিতে লাগিল। এই স্নেহময় ভ্রাতৃগৃহ, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার অনন্ত ভালবাসা নীরার অন্তরে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতে লাগিল। সকল হৃদয় ব্যস্ত করিয়া শুধু একখানি মুখ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল! সে মুখে যেন অনন্ত প্রেম উচ্ছ্বসিত হইতেছে!—করুণ চক্ষু-দুইটি যেন অশ্রুতে ছল্-ছল্ করিয়া নীরারই পথ চাহিয়া আছে! নীরার শ্রবণে অবিরত বাজিতে লাগিল, যেন কে ডাকিতেছে—"ফিরে এস নীরা, একবার ফিরে এস! পাষাণী—একবার দেখা দিয়া যাও।"

নীরা প্রথম প্রথম মনকে দমন করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু নদীতে যখন জোয়ারের বেগ আসিতে থাকে, মানুষের শত চেষ্টায় কি তাহা রোধ করা যায়? নীরার সুপ্ত প্রেম দিনে দিনে প্রবল হইয়া ঠিতে লাগিল। শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখিবার জন্য নীরার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। একদিন ললিতকে ডাকিয়া নীরা বলিল, "আমায় একটী লোক ঠিক্ করিয়া দাও, আমি একবার হরিনাথপুর যাইব।" ললিল বিস্মিত হইয়া বলিল, "সেই পোড়ো ঘরে যাইবার জন্য আবার সাধ হইল কেন, দিদি?"

নী। ললিত, পোড়ো হো'ক, আর যাই হোক্, তাহার মায়া কি আমি ছাড়িতে পারি? আমার মন ভারি চঞ্চল হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া কিছুতেই মনকে বুঝাইতে না পারিয়া তবে তোমাকে বলেতিছি।

ল। একান্তই যাইবে?

নী। হাঁ ভাই!

ল। শীঘ্র ফিরিবে তো?

নীরার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। সে বলিল, "ললিত, অভাগীর আর কে আছে? তোমাদের ছেড়ে কতদিন থাকিব?"

(৬)

নীরা পূর্ব্বগৃহে ফিরিয়া দেখিল, সত্যই তাহা পতনোন্মুখ। তাহার পিতার স্বহস্ত রোপিত পুষ্পোদ্যান কণ্টক-বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কেবল কলনাদিনী স্রোতস্বিনী তেমনই বহিয়া যাইতেছে!

নীরা প্রথমেই রামচরণকে ডাকিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে জমীদার-বাটীর সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

যথাযথ উত্তর দিয়া রামচরণ কহিল, "দিদি জমীদার-বাটীর সংবাদ আর কি বলিব! কর্ত্তা ও গৃহিণী স্বর্গে যাইবার পর মা লক্ষ্মীর কি কুদৃষ্টি যে পড়িয়াছে, জানি না!"—

নী। কেন রে? কি হইল?

রা। ধীরেনবাবুর দুরবস্থার শেষ নাই! আজ ছয়মাস হইল বিসূচিকায় তাঁহার সেই লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রীটী মারা গিয়াছেন।

নীরার প্রাণ যথার্থই কাঁদিয়া উঠিল। সে বিস্ময়-ব্যথিত কণ্ঠে বলিল,—"এঁ্যা! বলিস্ কি!"

রামচরণ কহিল, "শুধু তাহা নহে! সেই কষ্টের উপর আজ দুই মাস হইল, ধীরেনবাবুর শয়নগৃহের চারিদিকে এমনভাবে আগুন ধরে যে, তাঁহার বহির্গত হইবার পথ থাকে না। তিনি জানালা দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়েন।"

রুদ্ধশ্বাসে নীরা জিজ্ঞাসা করিল, "রক্ষা পাইয়াছেন তো?"

না। যে-ভাবে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার অপেক্ষা না পাওয়াই ভাল ছিল।

নীরার কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইল না; সে কেবল ব্যাকুল দৃষ্টিতে রামচরণের মুখের দিকে চাহিল!

রামচরণ কহিতে লাগিল, "এত কষ্ট করিয়াও আগুনের হাত এড়াইতে পারিলেন না। যেখানে লাফাইয়া পড়েন, তখন সেখানে খুব আগুন। তাঁহার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হয় ও তিনি অজ্ঞান হন। তখন পাঁচ-জন গিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আসে। এখনও পোড়া ঘায়ে তিনি শয্যাগত আছেন। ডান-পাখানি একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার উপর দেখিবার শুনিবার লোক কেহ নাই। সেই-বংশের দুলাল আজ কত কষ্ট পাইতেছে, ভাবিলে আমাদেরই চক্ষে জল আসে!"

নীরা আর কথা কহিতে পারিল না। বর্ষার নব মেঘমালা সমুদায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া নীরার সুবিশাল সুনীল চক্ষুতারকা-দুইটীতে, আকাশভ্রমে বুঝি, নামিয়া আসিতে-ছিল! সহসা নীরার নয়ন হইতে তুষারপাতের ন্যায় দুই-চারিবিন্দু অশ্রু পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে অশ্রুবৃষ্টি আরম্ভ হইল। নীরা বুঝিল, আজ কয়মাস হইতে কেন তাহার মন এমন করিয়া তাহাকে আক-র্ষণ করিতেছিল!

বাহিরের আকাশে তখন ঘনঘটা। পৃথি-বীতে গাঢ় অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছিল। পথঘাট শূন্যময়;—দেখিবার উপায় নাই। মুষলধারায় বৃষ্টিও পড়িতেছিল। সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া বারিধারার মধ্য দিয়া ক্ষণপ্রভার মন্দ আলোকে পথ দেখিয়া দেখিয়া অস্থিরপ্রভার ন্যায়ই নীরা ত্বরিত চরণে জমীদার বাটীতে উপস্থিত হইল।

অতিধীর-পাদবিক্ষেপে সে ধীরেনেরে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ধীরেন রোগশয্যায় পড়িয়া আছে। ধীরেনের চক্ষু মুদ্রিত ছিল; সে নীরাকে দেখিতে পাইল না। সন্তর্পনে নীরা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুনিল, শুষ্ককণ্ঠে ধীরেন কহিতেছে, "উঃ মাগো! বড় তৃষ্ণা!"

নীরা কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে ধীরেনের শুষ্ক জিহ্বায় তাহা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "এই যে দুধ! খাও দেখি!" চমকিত হইয়া ধীরেন চক্ষু মেলিল। সম্মুখে কেহই নাই। নীরা তখন শয্যানিম্নে বসিয়া গ্লাসে দুধ ঢালিতেছিল। ধীরেন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "শেষে পাগলও হইব! হা ভগবন্! সত্যই যদি এ সময় এক-বার তাহাকে দেখিতাম! উঃ বড় তৃষ্ণা! কে আছ?" কম্পিতকণ্ঠে নীরা পুনরায় বলিল, "দুধ খাও!" ধীরেনের এবার চোখে জল আসিল। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "কেন এ কষ্টের উপর কষ্ট দাও, ঠাকুর! এ কি

তাহাকে ভালবাসারই প্রায়শ্চিত্ত! উঃ! কে তুমি দুধ আমায় দাও?"

নীরা ধীরে ধীরে গ্লাসটী মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, "খাও।" কথা কহিতে তখনও নীরার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। শুষ্ক কণ্ঠ ভিজাইয়া দিলে ধীরেন মুদিত চক্ষে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? নীরাও কি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে! আজ কি তাহারই আত্মা আমায় দেখিতে আসিয়াছ? দেখিতে আসিয়াছ কি যে, এই দেহের যন্ত্রণার উপর ব্যর্থ প্রেম কি করিয়া আমায় দগ্ধ করিতেছে! দেখিতে আসিয়াছ কি, আজ সব বিসর্জ্জন দিয়াও কি করিয়া তোমার স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া দগ্ধ হইতেছি! জীবনে পাষাণী ছিলে, মরণেও কি সে রীতি ছাড় নাই?"

তখন ধারার উপর ধারা আসিয়া নীরার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছিল। শত চেষ্টাতেও কণ্ঠে স্বর বাহির হইল না। সে ধীরে ধীরে ধীরেনের ক্লিষ্ট হাতখানি নিজের হাতের ভিতর তুলিয়া লইয়া অতিধীরে তাহাতে নিজের স্ফুরিত অধর স্পর্শ করিল।

তখন ধীরেন চোখ খুলিয়া নীরার দিকে চাহিল। চাঁহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে সে অতি-তৃপ্তির একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার পর তেমনি ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি যতই নিষ্ঠুর হও নীরা, কিন্তু তোমার স্মৃতি বড় মধুর! তোমার প্রকৃতি বড় সুন্দর! আঃ!—দেখ, আমার বুকের জ্বালা আজ কত নিভিয়া আসিয়াছে! কিন্তু তুমি না আসিলেই ভাল করিতে। আবার যখন চলিয়া যাইবে, তখন সে জ্বালা যে আরও বেশী হইবে!"

কাঁদিতে কাঁদিতে নীরা বলিল, "কোথা যাইব! এই চরণ ছাড়া নীরার জগতে স্থান আর কোথায়!"

ধীরেন কিছু ক্ষণ একদৃষ্টে নীরার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল; শেষে নিজ-মনে অতি-মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিল, "নীরা আমায় সত্যই ভালবাসে।"

নীরা কোমল কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "মাথায় একটু বাতাস দিই? ঘুম আসিবে কি?"

ধী। আঃ! আজ একটু তৃপ্তিতে ঘুমাইব।

আহার-নিদ্রা-পরিত্যক্তা নীরার অক্লান্ত সেবা সার্থক হইল। ধীরেন সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার দক্ষিণ পদটি খঞ্জ হইয়া গেল। নীরার সাহায্য লইয়া সে একটু একটু বেড়াইতে লাগিল। একদিন প্রদোষকালে ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে নীরা বলিল, "একটি কথা আছে।" ধীরেন ভীতভাবে নীরার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বলিবে?—যাওয়ার কথা নাকি?"

নী। না। থাকিবারই কথা।

ধীরেন বিস্ময়ানন্দে নীরার মুখের দিকে চাহিলে, নীরা বলিল, "যদি চিরদিনের জন্য চরণে স্থান দাও! তাহা না হইলে, এভাবে তো শুধু থাকা যায় না!"

হাসিয়া ধীরেন উত্তর করিল, "ওঃ, বুঝিয়াছি। পুরোহিত আহ্বান?"

নীরা লজ্জিতা হইয়া মুখ নত করিল।

ধীরেন আবার কহিল, "যখন সাধিয়াছিলাম তখন গুমোর হইয়াছিল। এখন এই আগুনে পোড়া খোঁড়াকে, বুঝি, বড় পছন্দ হইল?"

নীরা হাসিয়া উত্তর দিল, "সোনা পুড়িয়ে খাঁটি করে নিয়েছি; এইবার হার করে বক্ষে ধারণ করব।" শ্রীনমীবালা দেবী।

সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখী

আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ফুল, তুমি মহীয়ান্,
তবু তোমা পানে ধায় আকুল পরাণ !
লোকে বলে সূর্য্যমুখী সূর্য্য-সোহাগিনী ;
তারা ত জানে না মম গোপন-কাহিনী !
কি মোহ-মন্ত্রের বলে আমার জীবন চলে,
আমায় চালায় কোন্ শক্তি সঞ্জীবনী,—
পরে কি বুঝিবে, আমি নিজে যা' বুঝি নি !

আমি ক্ষুদ্র অণুকণা, তুমি প্রভাকর !
তোমাতে আমাতে প্রভু, অনেক অন্তর !
বহু উর্দ্ধে বহুদূরে তুমি থাক সুরপুরে,
আমি ফুটি ক্ষুদ্র ফুল মাটির উপর !

অতৃপ্ত তৃষিত আঁখি, সারাবেলা চেয়ে থাকি,
তবুত মেটে না তৃষা ;—বিরহে তোমার
জগৎ আমার চোখে শূন্য অন্ধকার !
তুমি রবি, অর্দ্ধ-প্রাণ বিশ্ব-জগতের ;
তোমার করুণা মাগি দিবস রয়েছে জাগি,
ব্রহ্মাণ্ড হিসাব রাখে উদয়-অস্তের !

হে অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়, বুঝিবে কি তুমি—
কি মহান্ দিব্য সুখে মগ্ন রহি আমি !
সাধকে কি সিদ্ধি-তরে ইষ্টদেবে পূজা করে ?
শুধু কি পূজায় তৃপ্তি হয় না-ক তার ?—
চির-সাধনার সিদ্ধি পূজাতে আমার !
জান না আমায় তুমি, জানাতে না চাই ;
আমি যেন যুগেযুগে এই সুখই পাই !

শ্রীইন্দিরা দেবী।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

২৭

শীলা ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল ; শয্যা ত্যাগ করিয়া বসিবার কক্ষে আসিতে লাগিল। সুব্রত তখনও সেই হোটেল পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। যখন ডাক্তার-সাহেব বলিলেন যে আর কোনও ভয় নাই, তখন সুপ্রকাশ গাড়ী 'রিজার্ভ' করিবার জন্য লিখিলেন ! শীলা দুই-একটি কার্য্যে সাহায্য করিতে আসিত, কিন্তু সুপ্রকাশ তাহাকে তাহা করিতে দিতেন না। সুব্রতও আর সুপ্রকাশের বসিবার কক্ষে আসিতেন না ; সুপ্রকাশই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতেন। যাত্রার দিবস পূর্ব্বাহ্নে শীলা একখানি আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়াছিল, এমন সময় সুপ্রকাশ তাহার কাছে গিয়া বলিলেন, "শীলা, তোমার সঙ্গে একজন দেখা কর্‌তে চান !"

শীলা বলিল, "কে ?"

সুপ্রকাশ। সুব্রত এখানেই আছেন। আমার সঙ্গে প্রত্যহই তাঁর দেখা হয়। তিনি আজ চলে যাবেন। তাই দেখা কর্‌তে চান্। তোমার অসুখের সময় তিনি যথেষ্ট সাহায্য কোরেছেন। সর্ব্বদাই আমার কাছে কাছে থাক্‌তেন।

শীলা অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে লাগিল; তাহার পর বলিল, "তবে কি সুব্রত বসুর সঙ্গে আমার সত্যিই দেখা হয়েছিল? তিনি যে তোমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিলেন! আমি ভেবেছিলুম সে-সব স্বপ্ন; তাই তোমায় কিছু বলি নি।"

সুপ্রকাশ। সেই সব কথার জন্যেই তোমার সঙ্গে দেখা কোরে ক্ষমা চাইবেন; তাই দেখা করতে চান্।

শীলা কাতর দৃষ্টিতে সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আবার এসে ত কিছু বল্‌বেন না! আমি আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

সুপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে বাহিরে গিয়া সুব্রতকে ডাকিলেন। সুব্রত ও শৈলেন উভয়েই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুব্রত শীলার সম্মুখে আসিয়াই বলিলেন, "আপ্‌নি আমায় ক্ষমা করুন্। আমি অনর্থক মিঃ রায়ের নামে কতকগুলি অপবাদের কথা বলে, আপ্‌নার কাছে বিশেষভাবে দোষী হয়েছি। আমি যা বলেছিলাম সবই অন্যায় বলিছি; না জেনে অপরাধ করিছি। ক্ষমা করুন্।"

শীলা ব্যাকুলনেত্রে সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া বলিল, "তবে কি আমার স্বপ্ন সত্য! মিঃ বসু কি আমায় এসে বলেছিলেন যে, তোমার নামে 'কেস্' হয়েছিল? তুমি মিসেস্ দাসকে—?"

শীলার কথার শেষ না হইতেই শৈলেন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "সুপ্রকাশ-দার নামে 'কেস' হয় নি; 'কেস' আমার নামেই হয়। মিসেস্ দাস বাইরে আছেন, তাঁর সাম্‌নেই সব বল্‌ছি শুন্‌বেন্।"

শীলা ব্যস্তভাবে বলিল, "না না; তাঁকে আর ডাকবেন না।"

সুপ্রকাশ। শীলা, ডাক্‌তে দাও। এতে ভালই হ'বে!

শৈলেন বাহিরে গিয়া মিসেস্ দাসকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। শীলা দেখিল, তাহার মাতার সমবয়স্কা পক্বকেশা আরব্ধ-বার্দ্ধক্যা ঘোরতরকৃষ্ণবর্ণা একটী রমণী অগ্রসর হইয়া আসিলেন। শৈলেন পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য শীলাকে দেখাইয়া মিসেস্ দাসকে বলিলেন, "—মিসেস্ রায়।"

মিসেস্ দাস সম্ভ্রমের সহিত মস্তক নত করিয়া করজোড়ে শীলাকে প্রণাম করিলেন। শীলা এত বিস্মিত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে বসিতে বলিতে ভুলিয়া গেল। শৈলেন তাঁহাকে একখানি বেত্রাসনে বসিতে বলিয়া, শীলাকে বলিলেন, "বৌদি! ইনিই মিসেস্ দাস।" তাহার পর পূর্ব্বাপর সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিয়া শৈলেন আপনার প্রিয়তমা পত্নী সুষমার বিচিত্র সন্দিগ্ধতার বিবরণ, এবং এই সন্দিগ্ধতা-হেতু তাহার নিকট এই সকল ব্যাপার গোপন করিয়া রাখিবার জন্য মিসেস্ ব্যানার্জ্জির উপদেশ, অল্পবয়স্ক শিশুটীর মৃত্যু প্রভৃতি যাবতীয় দুঃখপূর্ণ সাংসারিক অবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শীলা একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, আপ্‌নার আর বল্‌তে হবে না। এ কথার আর আবশ্যকতা নাই।" তাহার পর মিসেস্ দাসকে সে বলিল, "আপ্‌নি বসুন! দাঁড়িয়ে কেন?"

শীলার নিকটে যাইয়া, শীলাকে নমস্কার করিয়া মিসেস্ দাস বলিলেন, "আপ্‌নার স্বামীর দয়াতেই বেঁচে আছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ থেকে এদেশেই আছেন। আমি এখানেই

হাঁসপাতালে কাজ করতাম। সেই ঘটনার পর আমার কাজ গিয়েছে। আপ্‌নার স্বামী দয়া করে মাসে মাসে যে কুড়িটি টাকা দেন, আর আমি একটু আধ্‌টু যা কাজ পাই, তাতেই কোন রকমে চল্‌ছে। আমার মা চলচ্ছক্তি-রহিত। আমার দু'টি সন্তান; তাদের একটি কালা-বোবা; আর একটী খঞ্জ, চলিতে পারে না। আমি যে কি-ভাবে জীবন কাটাই, তা জগদীশ্বরই জানেন্! আপ্‌নাদের দয়া না হ'লে আমার বাঁচ্‌বার, বোধ হয়, কোনও উপায় ছিল না!"

মিসেস্ দাসের কথা শুনিয়া শীলার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। শীলা তাঁহাকে পুনরায় বসিতে বলিল।

সুপ্রকাশ এইবার শীলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "সকলকার জন্যে চা আন্‌তে বলি? —সুব্রত আজই চলে যাবেন।"

স্বামীর সহিত সুব্রতর এরূপ ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া শীলা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গেল! সুপ্রকাশ বেহারাকে ডাকিলেন ও মিসেস্ দাসকে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শৈলেন নতমুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি চাহিয়া শীলার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটুও ছায়া যেন শীলার ভাল লাগিতেছিল না। স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া বাঁচিয়া থাকা, কি ভীষণ অবস্থা!—তাহা ভাবিতেও তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছিল! সহসা শীলার দৃষ্টির সহিত সুপ্রকাশের দৃষ্টি মিলিত হইল। শীলা সেই দৃষ্টিতে শুধু গভীর অনুরাগ দেখিল! সে-মুখে শুধু উদারতা ও প্রসন্নতা বিরাজিত রহিয়াছে! এই স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস! শীলার আপনাকে কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হইতে লাগিল!

বেহারা চা-পানের দ্রব্যাদি আনিলে, শীলা মিসেস্ দাসকে চা দিতে গেল। তিনি লইলেন না; বলিলেন "আমায় ক্ষমা কোর্কেন; আমি চা খাই না।" তাহার পর নমস্কার করিয়া বিদায় লইয়া তিনি স্বগৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

শৈলেন ও সুব্রত চা পান করিলেন। সুব্রত তখনি যাইবেন। তিনি শীলাকে বলিলেন, "আবার কটকে দেখা হ'বে। আপ্‌নারা ত লক্ষ্ণৌ হয়ে যাবেন্? আমি কটকেই 'প্রাক্‌টিস্' কোর্কো স্থির করিছি। আশা করি, আপ্‌নি আমার অপরাধ সব মাপ্ কোরে আমাকে নিজের ভাই বলেই মনে কোর্কেন।"

যাঁহার প্রতি শীলার মনের ভাব অন্য-প্রকার ছিল, আজ তাঁহারই কথায় তাহার মন আর্দ্র হইয়া গেল! শীলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপ্‌নার মাকে, বৌদিদিকে আমার নমস্কার দেবেন। আপ্‌নার বৌদিদিকে বল্‌বেন যে, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে সুখী হ'ব। তিনি আমাকে বোনের মত ভাল বাসেন, বলেছিলেন। যেন এইবার তা স্মরণ কোরে, আবার সেই-ভাবেই দেখেন্!"

সুব্রত। বৌদিদি নিজেই ব্যস্ত হবেন! আপ্‌নার কথা তিনি বাটীতে প্রায়ই বলেন। আপ্‌নাদের দেখা-সাক্ষাতে আর কোন বাধা থাক্‌বে না। মাসীমারাও সেইখানে আছেন। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে যান।"

শীলা। রমা কোথায়?

সুব্রত। (নতমুখে) তিনিও সেইখানে আছেন।

দুই-একটী কথার পর সুব্রত শীলার নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন। গাড়ীতে দ্রব্যাদি তুলিয়া দেওয়া হইল। শৈলেন ষ্টেসন পর্য্যন্ত যাইবেন; সুতরাং তিনিও গাড়ীতে উঠিলেন। সুব্রত যাইবার সময় সুপ্রকাশের কর-মর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আপ্‌নাকে কত রকমে কষ্ট দিলাম! ক্ষমা কোর্ব্বেন। ছোট ভাই বোলে—!" তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

সুপ্রকাশ তাঁহাকে বলিলেন, "আবার শীগ্‌গিরই দেখা হবে।" সুব্রত ম্লানমুখে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কান্নুর দীঘি।

(ভূমিকা)

এ দীঘি পটীয়া-থানার অন্তঃপাতী হাওলা-গ্রামের উপকণ্ঠে বাগচরা-মাঠের উত্তর-প্রান্তে অবস্থিত। প্রকৃতির বিলাস-ভূমি চট্টলার ইহা এক বিখ্যাত, বিশাল ও অতিপ্রাচীন দীঘি। ইহার আয়ু কত বৎসর তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। আমাদের এ বিস্তীর্ণ জনপদে "কান্নুর দীঘি"-নামেই ইহার সুপ্রকাশ। গ্রামের নবতিপরবয়ঃপ্রাপ্ত স্থবিরতম পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম—এক কৃষ্ণকান্নু ইহার জন্মদাতা। সন্দেহ-ভঞ্জন-মানসে কান্নুবংশীয়া বর্ষীয়সী এক ভদ্রমহিলাকে এ-সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলেন, তাঁহাদের বংশের জনৈক আদিপুরুষ পীতাম্বর কান্নু ইহা খনন করিয়াছেন। পীতাম্বর কান্নুই হউন্, আর কৃষ্ণ কান্নুই হউন, সে কান্নু একটী বই দুইটী ছিলেন না; এবং ইহা কান্নুরই উপযুক্ত বটে। কালিন্দীর মতন ইহারও জল গাঢ় কৃষ্ণ। কালিন্দী হইতে নিমজ্জিত কৃষ্ণকে লইয়া যেমন ব্রজাঙ্গনাগণ পুলকে ব্রজে গিয়াছিলেন, তেমনি কান্নুর দীঘি হইতেও কৃষ্ণ সলিল লইয়া গৃহলক্ষ্মীগণ পরমানন্দে গৃহে যান। সময়ে সময়ে কালিন্দী-তীর কালার মোহন মুরলীতানে মুখরিত হইত; সময় সময় কান্নুর দীঘিও কালার প্রাণ-মাতান কুহুতানে ঝঙ্কৃত হয়। কালিন্দীর আশে পাশে ব্রজের মাঠে মাঠে যেমন গোপাল চরিত ও সঙ্গে সঙ্গে রাখাল বালকেরা বিহার করিত, তেমনি কান্নুর দীঘিরও পার্শ্বস্থিত মাঠে ঘাটে গোপাল চরে এবং তৎসঙ্গে রাখালকুল খেলে। সুতরাং **কান্নুর দীঘি** ইহার উপযুক্ত সংজ্ঞা, **কান্নুর দীঘি** ইহার উচিত নামকরণ।

কালের কোন্ তিমির-গর্ভে ইহার জনকদেব লুকাইয়াছেন, জানি না। মনে হয়, যতদিন তিনি ছিলেন, প্রাণপ্রতিমা দীর্ঘিকা-দুহিতা ততদিন তাঁহারই আদরে গরবিণী ছিলেন। কিন্তু আজ কালের কুটিল আবর্ত্তনে ইহার অনেক পতি হইয়াছে;—একাধিপতি কেহই নাই। অনেকের হইয়া সে কাহারও নয়!—সে আদৃতা নয়; সে পরিত্যক্তা। * * *

* ফতেয়াবাদ চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

শৈল-কিরীটিনী মম জন্মভূমি-অঙ্গে
মনোহর মরকত স্বচ্ছ আভরণ,—
শ্যামলা প্রকৃতি-অঙ্ক উদ্ভাসিত করি
কে তুমি, বিপুল যশ ঘোষিবারে কা'র
লভেছ জনম ? লোকালয় কোলাহল
দূরে তেয়াগিয়া, বিজন প্রান্তরে আসি
রচিয়াছ শ্রী-নিবাস ; পবিত্র আশ্রম
নির্ম্মায় তপস্বী যথা গহন কাননে।
তুঙ্গতীর-চতুষ্টয় পর্ব্বত-প্রমাণ
কত শত শতাব্দীর ঝটিকা হেলিয়া
এখনও গরবে তারা আছে সমুন্নত ;
বিপদে যেমন শূর স্থির অচঞ্চল।
হরিতাভ শস্য-ক্ষেত্র চারিধারে তার
তুলিয়া রজত শির কাঁপিছে হিল্লোলে।
সন্নিকটে অদ্রিমালা আকাশের গায়
ঘনকৃষ্ণ অভ্র-নিভ আছে প্রতিভাত।
অপূর্ব্ব এ সমাবেশ !—সুরম্য বিপিনে
আরামের উপবন, বিশ্রামের স্থান,
কল্পনার লীলাভূমি হয়েছে স্বজিত।
চারি কোণে বনস্পতি আত্মজ তোমার
প্রসারি সহস্র শাখা ছায়া বিস্তারিয়া
করিতেছে আবাহন শ্রান্ত পথিকেরে ;
অথবা প্রহরী-সম আছে দাঁড়াইয়া
দেখাইতে পর্য্যটকে বিচিত্র এ শোভা !
স্মরণ কি হয় সখি ! সকাল বিকাল
কত নিশীথ প্রদোষ যাপিয়াছি আমি
তব সুন্দর বেলায় সাথী সনে ? কত
ভুলিয়াছি দুঃখ ব্যথা, খুলিয়াছি হেথা
অন্তরের উপন্যাস ? কতবার তুমি
উদাস আকুল চিত্ত বিনোদন হেতু
মৃদুল সমীরে ধীরে করেছ ব্যজন ?
না, না, ভ্রান্তি মম ! হেন পরিচর্য্যা তব
সর্ব্বলের প্রতি ! কত পান্থ আসে যায়
এই উপকূলে, জুড়ায় উত্তপ্ত প্রাণ
শীতল সলিল আকণ্ঠ করিয়া পান।
সুচারু এ ছবি হেরি কে না মুগ্ধ হয় ?—
ক্ষুদ্র দীন মোর মত প্রণয়-ভিখারী
কতজন আছে ! কে না ভজে তোমা ?—দৃষ্টি
অসম্ভব তাঁর, নিরখি ভুলেন যিনি।
হীনজনস্থান নয় তব পুণ্য-স্মৃতি।
শরতের পূর্ণশশী জোছনা-ধারায়
সুষুপ্ত ধরণী-বক্ষ করিলে প্লাবিত
একদা আগ্রহে মোরা তিনবন্ধু মিলে
গিয়েছিনু তব কোলে বিরাম আশায় !—
মনে পড়ে সেই দিন—অন্তরীক্ষ হ'তে
উদার প্রশান্ত তব হৃদয়- দর্পণে
নেমেছিল নিশাপতি নক্ষত্র-আসনে।
হেসেছিলে তুমি কেমন মধুর হাসি
কৌমুদীর শুক্লবাস করি পরিধান।
ওই শুভক্ষণে মোরা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
এ-পার ও-পার করি ঘুরি চারিচার,
করিলাম প্রদক্ষিণ শোভন প্রতিমা ;
অনন্তর বসিলাম পশ্চিম তটেতে,
অতৃপ্ত লোচনে সবে করিলাম পান
নিশ্চল সৌন্দর্য্য-সুধা ; বহুক্ষণ পরে
করিনু বন্দনা তাঁর মোহন সঙ্গীতে ;
অন্তরে প্রণমি শেষ লইনু বিদায়।
করেছিলে লক্ষ দেবি ! গুপ্ত হৃদয়ের
ভক্তি-প্রীতি-উপাসনা শর্ব্বরী-আলোকে ?
সুনিশ্চিত—যদি জড়ে সম্ভবে চেতনা।
মৃন্ময় এ স্থূল দেহ মিশিলে ধূলায়,
যদি এই সুখ-স্মৃতি করিয়া ধারণ
উড়য়ে নির্মুক্ত আত্মা অনন্ত গগনে,
বিহগের সাথে আমি তব তীরতরু
করিব আশ্রয়। দিবস-রজনী সদা
বাল্যতীর্থস্থান এই যমুনার তটে
বিহরিব সুখে, আর অর্চ্চনায় তব
মরত জীবন মম করিব সফল
অধোবাস যতদিন না হয় খণ্ডন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র লাল।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৫৫ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

ভাদ্র, ১৩২৪—সেপ্টেম্বর, ১৯১০।

সূচী

১। বর্ষ-প্রবেশ ১৬১
২। গানের স্বরলিপি ... শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ... ১৬২
৩। আমি তোমারই (কবিতা) ... দরবেশ ... ১৬৫
৪। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ... শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল ১৬৫
৫। বঙ্গে কৃষির উন্নতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, বি, এ, বি, এল্,
বিহার-প্রদেশের কৃষিসমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও সভ্য ১৬৮
৬। হুড্রুফল বা সুবর্ণরেখার জল-প্রপাত ... শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে ... ১৭২
৭। অদৃষ্টলিপি (গল্প) ... শ্রীমতী মানকুমারী বসু ... ১৭৪
৮। নমিতা (উপন্যাস) ... শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী ১৭৭
৯। কে তুই আমার ? (কবিতা) ... শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র ... ১৮৩
১০। আলোক (কবিতা) ... শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবী ... ১৮৩
১১। মার্কিন-বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দৃশ্য—শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সিংহ বি-এস্ সি (ইলিনয়),
এম্, এ, ম্নি, এ ... ১৮৪
১২। তপস্যা (উপন্যাস) ... শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র ... ১৯০
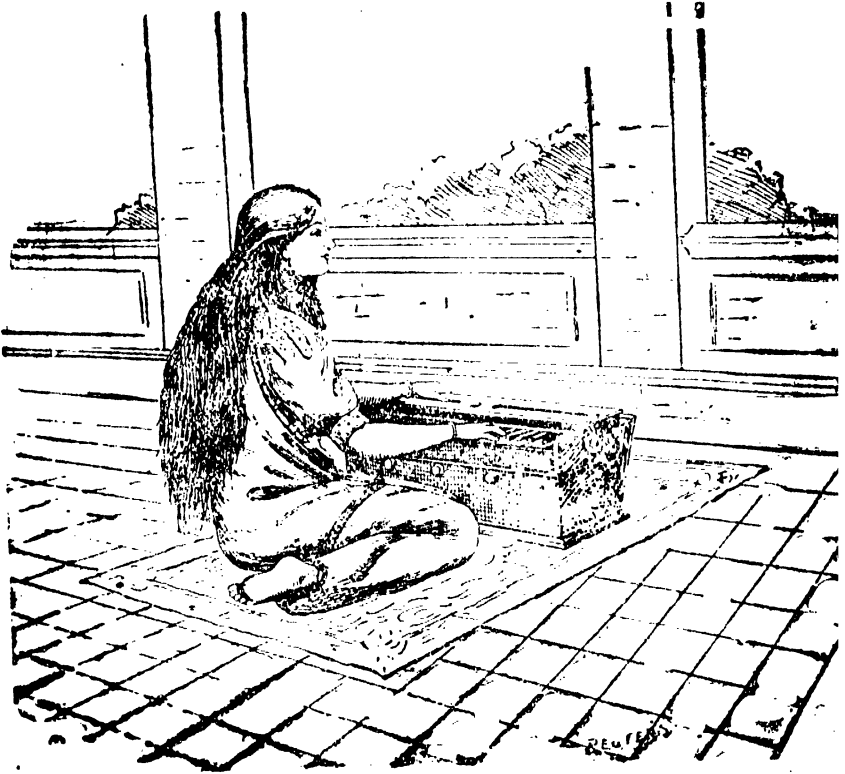
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০ ;

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 649. September, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৪৯ সংখ্যা।	ভাদ্র, ১৩২৪। সেপ্টেম্বর, ১৯১৭।	১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

বর্ষ-প্রবেশ।

ইচ্ছাময় পরমপুরুষের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় বামাহিতব্রতচারিণী বামাবোধিনী অদ্য তাহার জীবনের চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষ পরিপূর্ণ করিয়া পঞ্চপঞ্চাশদ্ বর্ষের প্রবেশদ্বারে উপনীত হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ইহা জ্ঞানের ক্ষুদ্রবর্ত্তিকা হৃদয়ে জ্বালিয়া—নরনারীর পূতহৃদয়বিকসিত ভাবকুসুমরাশি, মানব-জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাঘটনাবলীর বিক্ষিপ্ত বার্ত্তা প্রভৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, সজ্জিত অর্ঘ্যপাত্র লইয়া মানবের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া আসিতেছে! প্রাতঃসূর্য্যের উদয়াস্তের পর পুনর্ব্বার যখন নবভানু পূর্ব্ব অম্বরে উদিত হইয়া পশ্চিম আকাশে বিলীন হইলেন, মানব বুঝিল, একটীর ন্যায় অপর একটী দিবানামধারী খণ্ডকাল বিলুপ্ত হইল! গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতু পর্য্যায়-ক্রমে অতিবাহিত হইলে, যখন গ্রীষ্মের সূচনা হইল, যখন ৩৬৫ দিবসের পরে সূর্য্যদেব পুনর্ব্বার তাঁহার পূর্ব্বকক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন, মানব বলিল, একটী বৎসর পূর্ণ হইল! এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল-পরিমাণ-দ্বারা পার্থিব বস্তুসমূহের পার্থিব অবস্থানকাল পরিমিত হইতেছে। কিন্তু ক্ষুদ্রকালের দ্বারা যদ্রূপ বৃহত্তর কাল সংগঠিত হইতেছে, তদ্রূপ ক্ষুদ্রশক্তির দ্বারা বৃহত্তর শক্তি, ক্ষুদ্র জীবন-দ্বারা বৃহত্তর জীবন, ক্ষুদ্র-সত্তার দ্বারা বৃহত্তর সত্তার সংগঠন হইতেছে!

এক একটী মানবীয়-শক্তির আদি ও অন্ত আমরা তত্তদ্-মানবের আবির্ভাব ও তিরো-ভাবের সহিত বিজড়িত করিয়া পরিমিত করিতে প্রয়াস পাই, কিন্তু যখন দেখি এক একটী শক্তি শতশত শক্তির জন্মদাতা, এক একটী শক্তির প্রভাবে শত শত শক্তি প্রভাবান্বিতা, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল শক্তিই এক মহাশক্তি হইতেই উৎসারিতা, তখন আমাদিগের পৃথক্ পৃথক্-রূপে শক্তিসকলকে ধারণা করিবার বাসনা দূরীভূত হয়। তখন আমরা ক্ষুদ্রবৃহৎ, সম-বিষম, অনুকূল ও প্রতিকূল, সকল শক্তিই

একই সাধনায় প্রবৃত্ত, সকল শক্তিই সেই এক মহাশক্তির মধ্যে অবস্থিত, পরিপুষ্ট, তচ্ছ-শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও তাহারই সহায়তায় বিনিযুক্ত দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই! এই স্থানেই—এই মহাশক্তির ক্রোড়ে ক্ষুদ্রশক্তিকে শায়িত ও কর্ম্মে লিপ্ত দেখিয়া আমরা তাহার সার্থকতা অনুভব করি।

অর্দ্ধ-শতাব্দীর প্রাক্কালে ভয়াবহ প্রতিকূল অবস্থাসমূহের মধ্যে নারী-হিতৈষণায় প্রণোদিত যে-শক্তির মূর্ত্ত অভিব্যক্তিরূপে এই ক্ষীণশক্তি পত্রিকা চিন্ময় পরমপুরুষেরই জ্ঞানদীপিকা ইহার ক্ষীণহস্তে ধারণ করিয়া, তাঁহারই দুরবগাহ সত্তার উপলব্ধিভূমি মানবের হৃদয়-বেদিকার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মহারতির সূচনা করিতেছিল, তখন কে জানিত আজিও ইহার মঙ্গল আরতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে! যাঁহার শাসনে কোটী কোটী গ্রহতারকা সুদূর গগন-পারে মহাপূজায় প্রবৃত্ত থাকিয়া নীরবে পরিভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার অনুশাসনে অনুশাসিত হইয়া সূর্য্যচন্দ্র তাঁহারই মহা আরতিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, যাহারই প্রীতিসম্ভার বক্ষে ধারণ করিয়া প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি তাঁহারই চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে, যাঁহার অনন্তবিধানে বিধৃত থাকিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচর স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, অদ্য ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ইহার কর্ম্মক্ষেত্রের অবিস্তীর্ণ পরিসর দর্শন করিয়া ইহার সার্থক্যের প্রতি সন্দিহান হইলেও, ইহার এই ক্ষুদ্রশক্তির দ্বারা জগতের মহাশক্তির পরিপূর্ণতা দেখিয়া, ইহাকে জগতের সেই এক মহাশক্তিরই অংশ জানিয়া ও প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এই পত্রিকা বিশ্ববিধাতার,—যিনি তাঁহার অনন্ত-শক্তির কণামাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবের হৃদয়ে প্রদান করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে আপনার শুভ ইচ্ছা জাগরিত করিয়া, তাহাদিগের চিত্তে আপনার জ্ঞান ও প্রীতি অহর্নিশ প্রেরণ করিয়া, শত শত শক্তির ধারা একস্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাগ্রে ভিক্ষা করিয়া, তৎপরে ইহার গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা এবং পাঠক-পাঠিকা প্রভৃতি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া, ও তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা প্রার্থনা করিয়া নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক্। ওঁ স্বস্তি ॥—

গানের স্বরলিপি

মিশ্র ইমন্—যৎ।

যদি এসেছো এসেছো এসেছো প্রভু হে—
দয়া করি' কুটীরে আমারি;
আমি কি দিয়ে তুষিব ভুষিব তোমারে
—বুঝিতে না পারি!
আমি যাব কি ও হৃদি'পর ছুটিয়া?
আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া?
হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে
—নয়নের বারি?

যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার,
আশার অতীত গণি;
আজি আঁধারে পথের ধূলার মাঝারে,
কুড়ায়ে পেয়েছি মণি;
যদি এসেছ দিব হৃদয়াসন পাতি';
দিব গলে নিতি নব প্রেমহার গাঁথি';
রহিব পড়িয়া দিবস-রাতি হে
—চরণে তোমারি।

কথা ও সুর—৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

সা ঋা II গা গা গা। পা মা গা ঋা। ঋা গা জ্ঞা। গা জ্ঞা পা -া I
য দি এ সে ছো এ ০ সে ছো এ সে ছো প্র ভু হে ০

২´ ৩ ০ ১
| পা ধা না। না না না না। নধা র্সা র্সা। -া -া র্সা র্সা I
দ য়া ক রি কু টী রে আ০ মা রি ০ ০ আ মি

| র্সা র্ঋা র্গা। র্সা র্ঋা র্গা -া। না র্সা র্সা। না র্ঋা সা -া I
কি দি য়ে তু ষি ব ০ ভু ষি ব তো মা রে ০

[সা ঋা]
২´ ৩ ০ ১ "য দি"
| পা ধা নধা। র্সা না র্ঋা র্সা। র্গা র্ঋা র্সা। -া -া পা পা II
বু ঝি তেনা পা ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

[ধা ধা]
২´ ৩ ০ ১ আ মি
II পা ধা না। না ননা না না। ধা না র্সা। -া -া পা পা I
যা ব কি ও হৃদি প র ছু টি য়া ০ ০ আ মি

| ধা না র্ঋর্সা। র্গা র্গা র্গা র্গা। র্মা র্গা র্ঋা। -া -া ধা ধা I
প ড়ি বকি প দ ত লে লু টি য়া ০ ০ (আ মি)

| র্সা র্ঋা র্ঋা। না র্ঋা র্সা -া। না র্ঋা র্সা। ধা না না -া I
হা সি ব সা ধি ব ০ ঢা লি ব চ র ণে ০

২´ ৩ ০ ১
| মা ধা পপা। র্সা না র্ঋা র্সা। র্গা র্ঋা র্সা। -া -া সা ঋা II
ন য় নের বা ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ "য দি"

২´ ৩ ০ ১
সা ঋা II গা গা গা। গা গা -া গা। ঋা গা মা। গা ঋা -া ঋা I
য দি পে য়ে ছি তো মা ০ য় কু টী রে আ মা ০ র

২´ ৩ ০ ১
| সা র্রা গা। গা হ্মা ধা হ্মপা। -া -া -া। -া -া পা পা I
আ শা র অ তী ত গণি ০ ০ ০ ০ ০ আ জি

২´ ৩ ০ ১
| পা ধা না। পা ধা ধা -া। হ্মা পা পা। হ্মা ধা পা -া I
আঁ ধা রে প থে র ০ ধূ লা র মা ঝা রে ০

২´ ৩ ০ ১
| গা গা গা। গা রা গা মা। গা রা -া। -া -া রা গা I
কু ড়া য়ে পে য়ে ছি ০ ম ণি ০ ০ ০ য দি

২´ ৩ ০ ১
| হ্মা হ্মা হ্মা। হ্মা হ্মা হ্মা হ্মা। হ্মা হ্মা হ্মা। গা হ্মা পা -া।
এ সে ছ দি ব হু দ য়া স ন পা ০ তি ০

২´ ৩ ০ ১
| -া -া -া। গা হ্মা পা ধা। পা ধা -া। না না ধা না।
০ ০ ০ দি ব গ লে নি তি ০ ন ব প্রে ম

২´ ৩ ০ ১
| র্রা র্সা -া। না -া ধা -া। র্সা র্রা র্রা। ধা না না -া।
হা ০ র গাঁ ০ থি ০ র হি ব প ড়ি য়া ০

২´ ৩ ০ ১
| পা ধা ধা। হ্মা ধা পা -া। -া -া -া। -া -া -া -া I
দি ব স রা তি হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
| রা গা হ্মা। গা হ্মা ধা ধা। না ধা পা। হ্মা পা সা রা II II
চ র ণে তো মা ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ "য দি"

আমি তোমারই।

রাখ আর মার, যা' কর তা' কর,
　আমি তো তোমার, তোমার হে!
তাপে পোড়াইয়া ছাই কর হিয়া,
　তবু তো তোমার তোমার হে!
যদি সাধ হয়, শতধা করিয়া
এ দেহ কুকুরে দেহ বিতরিয়া,
তব উপবন করিতে সেচন
　লহ এ রুধির আমার হে!
ধূলি কর আশা, স্বপনের নেশা,
　আমি যে তোমার তোমার হে!

চিত্ত আমার করি চুরমার
　অনলে দেহ গো ফেলিয়া;
তাই বলে' মোর এ প্রণয় ঘোর
　ভেবেছ কি যাবে চলিয়া?
মম মরমের ভালবাসা যত,
তিল-মাত্রা নাহি হবে বিচলিত,
ভয় নাহি পাব, বিমুখ না হব,
　তোমার আদর ঠেলিয়া।

শান্ত উদার বক্ষে তোমার
　রহিব গো আমি জড়ায়ে,
নব-বিকশিত কুসুমের মত
　বিমল সুবাস ছড়ায়ে!
অথবা আমারে দাহ কর তুমি,
দাবানলে যথা দহে বনভূমি,
উঠুক হাসিয়া পাবক নাচিয়া
　তব রৌরব-শিখার হে!
রাখ আর মার, যা' খুসি তা' কর,
　আমি তো তোমার তোমার হে!

দরবেশ

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর) *

বেলা, অনুমান, ৪ ঘটিকার সময় মা অষ্ট-ভুজার দর্শন-মানসে যাত্রা করিলাম। বেণীমাধব-নামক একটী ব্রাহ্মণ বালককে পথ-প্রদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। বালক অধিক পুরস্কারের প্রত্যাশায় স্থানটী যে অধিকতর দুর্গম ও ভয়াবহ, তাহা অনেকবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল;—আমরা তাহার কথা শুনিয়াও শুনিলাম না। একটী সুদীর্ঘ যষ্টি হস্তে গ্রহণ করিয়া বালক আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিল।

সমতল-ক্ষেত্রে একটী প্রশস্ত রাস্তা; দুই পার্শ্বে উন্নতশীর্ষা ঘন-পল্লবিতা শ্যামলা বিটপি-শ্রেণী! পুরোভাগে দিগন্তপ্রসারিণী পর্ব্বতরাজি! ঐ পর্ব্বতের শীর্ষদেশেই মায়ের মন্দির।

একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলাম। বালক এই-স্থানে আসিয়াই দুর্ব্বোধ্য ভাষায় আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতে লাগিল; আমরা বুঝিলাম, অপরিচিতের পক্ষে এ-স্থান বিপৎ-সঙ্কুল। তাহার পর বালক অবলীলাক্রমে

* শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ইংরাজী হইতে।

সিংহ-শিশুর ন্যায় ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিল। প্রস্তরখণ্ডে আমাদের গতি স্খলিত হইতেছিল। উভয়পার্শ্বে নিবিড় নাতিদীর্ঘ পুষ্পিত-বিটপিশ্রেণী মৃদু বায়ু-হিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল! কুসুম-সৌরভে বন-স্থলী আমোদিতা! এই লীলাকুঞ্জে, বুঝি বা, বনদেবীগণ অবসর মত বিশ্রাম-লাভ করেন। স্থানটির মনোহারিত্ব ও পবিত্রতা প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের অবতারণা করে! ভীতিমিশ্রিত চিত্তে এই চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা পর্ব্বত-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম; দেখিলাম, সুবৃহৎ উপকণ্ঠ-সমাকীর্ণ একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর চক্ষুর বিষয় অতিক্রম করিয়া কোন্ দূরদিগন্তে বিলীন হইয়াছে! কোথাও জনমানবের স্বরশব্দ নাই; প্রকৃতি স্তব্ধ এবং গম্ভীর! স্থানে স্থানে দুই একটী খর্ব্বকায় আরণ্যতরু অটল অচল ভাবে বিরাজমান; তাহাদের শোভা নাই, সৌন্দর্য্য নাই, সম্পদ্ নাই; কেবল কর্কশতা এবং কঠোরতায় পরিপূর্ণ! দূর হইতে জটাজুট-সমাবৃত ধ্যানমগ্ন যোগিবরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়! দূরে দূরে বহুদূরে দুই একটী সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমও পরিলক্ষিত হয়।

যাইতে যাইতে আমরা উন্নতাবনতা ভূমির উপর আসিয়া দেখিলাম, পর্ব্বতের সঙ্গে সঙ্গে পূত-সলিলা গঙ্গা সর্প-গতিতে প্রবাহিতা!—এ-স্থান হইতে বহু নিম্নে বলিয়া গঙ্গা একটী শুভ্র রজত-রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়! আবার কিয়দ্দূরে যাইয়া দেখিলাম, অকস্মাৎ যেন কেহ শ্যামল-শষ্পোপরি একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে!—গঙ্গা অতিপ্রশান্ত!

তৎকালে পশ্চিমাকাশ লোহিত-রাগরঞ্জিত হইতেছিল; তপনদেব অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইতেছিলেন। প্রদর্শকের উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গতিও দ্রুততর হইতেছিল; আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য-সন্দর্শন অপেক্ষা প্রদর্শকের অনুগমন সমীচীন মনে করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলাম। দূর হইতেই একটী ক্ষুদ্র মন্দির ও পতাকা দৃষ্ট হইল। এইটীই মা অষ্টভুজার মন্দির। যে মা দীর্ঘকাল নরশোণিত-পানে পুষ্টা,—নিরীহ সন্তানের আর্ত্তনাদ যাঁহার মর্ম্মে আঘাত করে নাই—সেই মা, না জানি কিরূপ!

মন্দির-দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলাম, পাষাণময় পর্ব্বত-গাত্রে একটী গহ্বর ক্ষোদিত হইয়াছে; প্রবেশদ্বারে কোনও শিল্প-নৈপুণ্য নাই, স্থাপত্যের নিদর্শন নাই; গহ্বরাভ্যন্তর চির-তমসাচ্ছন্ন! প্রবেশ করিতে প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়। ক্ষুদ্র দ্বারে বহু আয়াসে একজন লোক প্রবেশ করিতে পারে। পুরোভাগে একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ; তাহাতে একদল সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। কয়েক জন স্ত্রীলোক অন্ধকারময় গহ্বর-মধ্যে আমাদিগকে লইয়া গেল। ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে অতি-ক্ষুদ্রাবয়বা মাতৃমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম; একটু স্থিরভাবে বসিতে পারিলাম না। অমনি স্ত্রীলোকগণ পয়সার জন্য একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। গহ্বরাভ্যন্তরে পর্ব্বত-গাত্রে মা উপবিষ্টা;—উজ্জ্বল নেত্র হইতে জ্যোতির্ম্ময় আভা নির্গত হইতেছে। সম্মুখে একটী প্রস্তর-বেদিকা;—তাহাতে পূজোপকরণ রক্ষিত হইয়া থাকে। মন্দিরাভ্যন্তরে আর কিছুই দৃষ্ট হইল না; কেবল চতুর্দ্দিকেই গাঢ় অন্ধকার। মন্দিরে আলোক- বা বায়ু-প্রবেশের কোনও পথ নাই।

বাহির হইতে মন্দিরটীকে একটী ক্ষুদ্র গিরিকন্দর বলিয়া অনুমিত হয়। এতাদৃশ স্থান ভীষণ নরহত্যার উপযুক্ত বটে। ঠগীগণ নরশোণিতে এই মায়ের পূজা সমাপন করিয়া পাপানুষ্ঠানে বহির্গত হইত। সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজও এস্থানে আসিলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। পূর্ব্বকথিত স্ত্রীলোকগণই মায়ের সেবকা। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে দেখিলাম তাহারা পর্ব্বতের পাদদেশে আবাস-নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ছোট ছোট বালক-বালিকারা দৌড়িয়া আসিয়া পয়সার জন্য যাত্রিগণকে ব্যতিব্যস্ত করে, এবং যৎকিঞ্চিৎ আদায় করিয়া লয়।

গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে রাত্রি ৮ টা বাজিয়া গেল। শ্রমাপনোদনের জন্য একখণ্ড শিলোপরি উপবেশন করিলাম। উর্দ্ধে নক্ষত্র-খচিত উদার নভোমণ্ডল! নিম্নে স্বচ্ছ-সলিলা জাহ্নবী যেন সমস্ত দিনের পর বিশ্রাম লাভ করিতেছিল! আর সেই বিচিত্র চন্দ্রাতপ স্ফটিক-স্বচ্ছ সলিলে প্রতিফলিত হইয়া নৈশ তিমিরে ঝক্‌মক্ করিতেছিল! অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সৌন্দর্য্য দেখিলাম। তাহার পর ক্ষুৎপিপাসা-নিবারণের জন্য পাণ্ডার আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে দীপালোক-পরিশোভিত মা বিন্ধ্যবাসিনীর প্রাঙ্গণ ধীরে ধীরে অতিক্রম করিলাম।

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পাণ্ডাজী-প্রদর্শিত প্রকোষ্ঠে শয্যা বিস্তৃত করিয়া একেবারে দেহ বিস্তার করিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু কোনও মতেই একটু তন্দ্রাও আসিল না; প্রতিমুহূর্ত্তেই আহারাহ্বান প্রতীক্ষা করিয়া নিরাশ হইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, অনেক দিন পরে আজ ভাগ্যে সোপকরণ অন্ন জুটিবে; কিন্তু বহুক্ষণ পরে আহার করিতে যাইয়া সে ভ্রান্তি দূরীভূত হইল। পাণ্ডাজীর অপ্রশস্ত অনাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণের অপরিষ্কৃত নিভৃত কোণে একটী ক্ষীণালোক দীপের সাহায্যে বসিবার ক্ষুদ্র আসনখানি কোনও প্রকারে সনাক্ত করিয়া লইয়াছিলাম। সম্মুখস্থিত পাত্রে মোটা চাউলের ভাতের উপর যৎসামান্য ঢেড়স ভাজা ও এককোণে অড়হর ডাইল। মুখে দিয়া দেখিলাম সকলই লবণাক্ত। বহুকষ্টে যৎকিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করিয়া ভোজন সমাপ্ত করিলাম। পাণ্ডাজী বা তদীয় গৃহিণী (পাচিকা) ভোজন-কালে কোনও প্রকার অভ্যর্থনা করেন নাই। আমার সঙ্গী বন্ধুটি একটু উদরপরায়ণ;—তিনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করতঃ পূর্ব্বোক্ত তিনটী আহারের সামগ্রীই পুনরাহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। তাহার পর এতাদৃশ অতৃপ্ত আহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গে কৃষির উন্নতি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

৬। কৃষির উপযুক্ত যন্ত্র।

কৃষির প্রধান যন্ত্র লাঙ্গল। বাঙ্গালা-দেশে যে লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়, তাহা ধানের চাষের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। কিন্তু রবি-শস্য বা আউসের জমী চাষের জন্য এরূপ লাঙ্গল ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে চাষের সময় ক্ষেত্রের মাটী উল্টাইয়া যায়। কারণ, মাটী উল্টাইয়া না যাইলে তাহাতে রৌদ্র লাগিতে ও তাহার ভিতর বাতাস যাইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে এইরূপ মাটী উল্টাইয়া দিলে, ঘাসের মূল নষ্ট হইয়া যায়। এই কার্য্যের পক্ষে 'মেষ্টন'-লাঙ্গল অত্যন্ত উপযোগী। প্রত্যেক চাষার একখানি করিয়া মেষ্টন লাঙ্গল রাখা প্রয়োজন। হিন্দুস্থান বা পাঞ্জাব-লাঙ্গলে কাজ আরও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সে সকল লাঙ্গল টানিবার উপযুক্ত বলদ নাই। বাঙ্গালা-দেশে 'মেষ্টন' লাঙ্গলে বেশ কাজ হইতে পারে।

আলু ও ইক্ষুর চাষের জন্য 'হ্যাণ্ড-হো' ব্যবহৃত হইলে অনেক সুবিধা হয়। হ্যাণ্ড-হোর দ্বারা ঘাস তুলিয়া দেওয়া, মাটী খুসিয়া দেওয়া, গাছের গোড়ায় মাটী তুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি অনেক কার্য্য হইতে পারে। ইহা ব্যবহার করিতে শিখিলে, কুলির খরচ অনেক কম হইয়া যায়।

গরুতে টানিবার উপযুক্ত বড় বিদের বাঙ্গালা-দেশে এখনও তত প্রচলন নাই। ইহার দ্বারা মাটী নরম হইয়া খুলিয়া যায়, এবং জমীর ঘাস উঠিয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিলে ক্ষেত্র খুব পরিষ্কার হয়।

বীজবপন-যন্ত্র—এই যন্ত্রের ব্যবহারে ক্ষেত্রে সমান ভাবে এবং সমান দূরে দূরে বীজ ফেলা যায়। বীজ-বপন সমান দূরে দূরে হইলে, নিড়ান প্রভৃতির অত্যন্ত সুবিধা হয় এবং তাহাতে গাছ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পুষা কলেজ হইতে এই যন্ত্র ক্রয় করা যাইতে পারে।

জল তুলিবার যন্ত্র :—সাধারণ ব্যবহারের জন্য ডোঙ্গা সুবিধাজনক। কিন্তু একস্থানে জল তুলিবার কল ফেলিতে পারিলে 'ওয়াটার-প্রুফ'-নল'-দ্বারা অনেক দূরের ক্ষেত্রেও জল দেওয়া যাইতে পারে। ছোট ছোট দমকল কৃষি-ব্যবহারের উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। সরকারী কৃষি-বিভাগের সাহায্যে ইহা হইতে পারে। 'চেন-পাম্প'ও সুবিধা-জনক।

আখমাড়া কল। এ যন্ত্র আমাদের দেশে এখন অত্যন্ত প্রচলিত। অনেক স্থানে দেখা যায়, এক ব্যক্তি এই যন্ত্র ক্রয় করিয়া অপর কৃষকদিগকে ভাড়া দিয়া তাহা হইতে দু-পয়সা লাভ করিয়াও থাকে। এই প্রকার অন্যান্য যন্ত্র ভাড়া দিলেও তাহার দ্বারা সুবিধা হইতে পারে।

কুটি কাটিবার কল :—ইহাতে পশু-খাদ্য শীঘ্র শীঘ্র কাটা যায়। ইহার মূল্য বেশী বলিয়া সকলে ক্রয় করিতে পারে না; কিন্তু ইহা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কৃষি-যন্ত্র।

৭। বীজ ও বীজ-সংগ্রহ।

কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট বীজের

আয়োজন করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে-স্থানে যে শস্য ভাল হয়, সেই স্থান হইতে তাহার বীজ আনয়ন করা আবশ্যক। সরকারী কৃষিবিভাগ এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু দেশের লোকও কৃষি-বীজের ব্যবসায় করিলে যথেষ্ট লাভ করিতে পারেন। আমাদের দেশের লোকের সে-বিষয়ে উৎসাহ নাই। সব্‌জী-বীজ বিক্রয়ের কয়েকটী দোকান আছে, কিন্তু সেখান হইতে বীজ আনাইলে প্রায়ই তাহাতে অঙ্কুরোৎপাদন হয় না। আমাদের দেশে যদি ভাল বীজ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কি কেহ 'হিমালয়ান-সিড্ ষ্টোরস্' বা পুনা হইতে বীজ আনাইতেন? বাঙ্গালাদেশে সব্‌জী-বীজ এবং সকল প্রকার কৃষিবীজের দোকান হওয়া আবশ্যক।

উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে অনেক স্থানে কৃষিবীজ ও পশুর মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে লোকে সহজে উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশে হাটে অনেক প্রকার সব্‌জী-বীজ বিক্রয় হয়। কিন্তু সকল প্রকার সব্‌জী-বীজ এবং কৃষিবীজ হাটে বিক্রয় হইলে, কৃষকদিগের অনেক সুবিধা হয়।

এক দেশের বীজ অন্য দেশে আনীত হইলে শস্য ভাল হয়। এক ক্ষেত্রের বীজ ক্রমান্বয়ে সেই ক্ষেত্রে রোপিত হইলে তাহাতে শস্যের ক্রমে অবনতি হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের কৃষকদিগকে বীজ-সংগ্রহ-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক। ক্ষেত্র-মধ্যে যে গাছের শস্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাই বীজের জন্য রাখা কর্ত্তব্য। অনেকগুলি ক্ষেত্রের মধ্যে, হয় ত, একখানি ক্ষেত্রে শস্য ভাল হইয়াছে; তাহার মধ্যে আবার যে গাছের শস্য ভাল হইয়াছে, সেই গাছের শস্যই বীজরূপে রক্ষা করিতে হইবে। সেই বীজ হইতে যে শস্য হইবে, তাহা হইতে আবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শস্য নির্ব্বাচন করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে প্রতিবৎসর বীজ-নির্ব্বাচন করিতে থাকিলে শস্যের ক্রমিক উন্নতিই হইতে থাকে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট মকাই গাছ, যাহাতে ২টি পরিপুষ্ট ফল জন্মিয়াছে, তাহার বীজ বপন করিলে যে গাছ হইবে, তাহাতে অন্যান্য বিষয় অনুকূল থাকিলে দুই বা ততোধিক উৎকৃষ্টতর ফল ফলিবে। ইহাতেই বীজ-নির্ব্বাচনের উপকারিতা বুঝিতে পারা যায়।

৮। নূতন শস্য।

অন্যান্য প্রদেশে যে-সকল উৎকৃষ্ট শস্য জন্মিয়া থাকে, বাঙ্গালা-দেশে তাহা ক্রমে ক্রমে আনীত হওয়া আবশ্যক। পঞ্জাবে 'কাবুলী ছোলা'-নামে একপ্রকার ছোলা হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ ছোলার দানা অপেক্ষা প্রায় ৩।৪ গুণ বড়। এই ছোলার চাষ আমাদের দেশে হওয়া আবশ্যক। ইহা কাঁচা অবস্থায় মটরসুঁটির ন্যায় ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইহার চাষে যথেষ্ট লাভ আছে। খোসাশূন্য একপ্রকার যবও আছে, তাহার আমাদের দেশে চাষ হওয়া আবশ্যক। চিনের বাদামের চাষ অত্যন্ত লাভজনক। যে-সকল জমীতে কোনও প্রকার শস্য জন্মে না, সেখানে চিনের বাদাম যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। চিনের বাদাম ফ্রান্সে রপ্তানি হয়। সেখানে ইহার তৈল 'অলিভ-অয়েলে'র ন্যায় ব্যবহৃত হয়; এবং খইল পশুখাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। পেশোয়ারী-ধান্য অতি উৎকৃষ্ট শস্য; ইহাও

আমাদের দেশে আনাইয়া চাষ করা উচিত। তুলার চাষও আমাদের দেশে হইতে পারে। একপ্রকার তুলা আছে, যাহার গাছ ৩।৪ বৎসর থাকে; তাহাকে গাছতুলা বলে। মধুবনী-অঞ্চলে একপ্রকার তুলা হয়, তাহার রং রেসমের ন্যায়, তাহাকে কোকৃটি কহে। এই সকল নূতন নূতন গাছ আমাদের দেশে আনীত হওয়া প্রয়োজন। এ-সকল কার্য্য কৃষিবিভাগ ও কৃষিসমিতির দ্বারা হইতে পারে।

৯। রোপণ- ও বপন-প্রণালী।

রোপণ ও বপনের নূতন নূতন প্রণালী, যাহা অন্যান্য দেশে প্রচলিত আছে, ক্রমে আমাদের দেশে তাহা গ্রহণ করা উচিত। নীল-কুটীতে 'সিড্‌ড্রিল'-দ্বারা বীজ-বপন করা হয়, তাহাতে বীজ সমানভাবে এবং সমান দূরে দূরে পতিত হয়। অনেক স্থলে দড়ি ধরিয়া খুর্‌পী-দ্বারা বীজ-বপন করা হয়। ধান্য-চাষের পক্ষে, আগাম আবাদ হইলে একটি করিয়া গাছ প্রত্যেক স্থানে রোপণ করিলে, তাহাতে গাছে খুব ঝাড় হয় ও ফলন ভাল হয়। ১০ ইঞ্চি দূরে দূরে ধানগাছ রোপণ করিলে তাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। এইরূপ নানাপ্রকার বপন ও রোপণের নিয়ম নানা স্থানে আছে; তাহার মধ্যে যাহা সুবিধাজনক, তাহা আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া উচিত।

১০। পশুখাদ্য।

আমাদের দেশে ধান্যের খড় প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। তাহাতে গবাদি পশুর আহারের অকুলান হয় না। কিন্তু খড়ে গবাদি পশুর সম্পূর্ণ পরিপুষ্টির উপযুক্ত উপাদান থাকে না। তাহার সঙ্গে তাহাদিগকে সব্জি, ঘাস প্রভৃতি দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে পশুখাদ্যের জন্য 'জনারা'র প্রচলন হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের মাটীতে জনারা ভালরূপ হওয়া সম্ভব। নিম্নভূমি ধানের ক্ষেতে ফাল্গুন-চৈত্রমাসে প্রথম বৃষ্টি হইলে, তাহা চষিয়া জনারা বপন করিলে, ধান্য-রোপণের সময়ের পূর্ব্বে জনারা পশুকে খাওয়াইবার উপযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং, উক্ত ক্ষেত্রে ধান্য এবং জনারা উভয় ফসলই পাওয়া যাইতে পারে। ধানের ক্ষেতে যখন এক ইঞ্চি মাত্র জল থাকে, অর্থাৎ বর্ষার শেষ ভাগে, খেসারী ছড়াইয়া দিলে, ধান-কাটার পরে সেই খেঁসারী গাছ বড় হইয়া যায়। কাঁচা-সুঁটি শুদ্ধ খেসারী কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইলে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। পশুখাদ্যের জন্য প্রত্যেক কৃষকেরই উচিত, কিছু কিছু জমীতে জনারা প্রভৃতি বপন করা। সাইলো (Silo) প্রস্তুতের একপ্রকার প্রথা আছে, তাহাতে বর্ষাকালের কাঁচা ঘাস কয়েকমাস যাবৎ রক্ষা করা যায়। ইহাও আমাদের দেশের কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

১১। কীট

কীট যাহাতে শস্য নষ্ট করিতে না পারে, কৃষকদিগের তাহার উপায় জানা উচিত। "ফসলে-কীট"-নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক বাঙ্গালাতে ছাপা হইয়াছে। তাহা হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কৃষকদিগের জানা উচিত যে, তুতের জল, ফেনিলের জল, কেরোসিন তেল জলে ও ঘোলে মিশান, চূণের জল, সাবানের

জল,ইত্যাদি কীটনাশের পক্ষে বিশেষ-ফলপ্রদ ঔষধ। তামাকের ধোঁয়া, খড়ের ধোঁয়া, গন্ধকের ধোঁয়া, এ-সকলও কীট তাড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

১২। আম্র ও লিচু এবং আওলাত।

বাঙ্গালা-দেশে প্রতিবৎসর আম ও লিচু ও অন্যান্য ফল, বাঙ্গালার বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে আম্‌দানি হয়। কিন্তু বাঙ্গালা-দেশে আম ও লিচু যত্ন করিলে খুব ভাল হয়। ভাল জাতীয় আম ও লিচুর চাষ বাঙ্গালা-দেশে যত হয় ততই ভাল। বাঙ্গালা দেশের জঙ্গল কাটিয়া এ সকল গাছের বাগান করিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। বাঙ্গালা-দেশের এমন মাটী যে, এখানে প্রায় সকল প্রকার গাছই ভালরূপ জন্মিতে পারে। সুতরাং যেখানে যাহা ভাল জিনিস দেখা যাইবে, বাঙ্গালা দেশে তাহা আনিবার বলবতী ইচ্ছা কৃষকদিগের হওয়া উচিত।

১৩। কৃষি-বিদ্যালয় ও কৃষি-পুস্তক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালা-দেশের ৢ অধিবাসী কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত। সুতরাং, কৃষিকার্য্য শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়-স্থাপন বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন। কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য নৈশবিদ্যালয়ই উপযোগী। যে-সকল ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় আছে, তাহাতেও কৃষিবিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষি-সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় যাহাতে নানাপ্রকার পুস্তক প্রচারিত হয়, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। সরকারী বিভাগ হইতে যে-সকল বুলেটিন বা সরকারী তথ্য বাহির হইতেছে, তাহার বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। এই প্রবন্ধ-পাঠে দেখা যায় যে, কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার অনেক বিষয় আছে। সে সকল বিষয় বিদ্যালয়ে বা পুস্তক-প্রচার-দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালা-দেশে উচ্চশ্রেণীর কোনও কৃষি-বিদ্যালয় নাই। এখানে 'সাবর কলেজে'র ন্যায় একটী বিদ্যালয় হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

উপসংহার।

বাঙ্গালা-দেশের কৃষির উন্নতি বাঙ্গালার কৃষকদিগের উপর তত নির্ভর করে না, যতটা শিক্ষিত লোক ও গবর্ণমেণ্টের উপর ইহা নির্ভর করে। পল্লিগ্রামস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, কৃষক-দিগের সঙ্গে মিশিবেন, তাহাদিগকে উপদেশ দিবেন; গ্রামে গ্রামে কৃষি-সমিতি স্থাপন করি-বেন, সমিতিতে কৃষিবিষয়ের উন্নতির চর্চ্চা করিবেন, আপনারা কৃষিবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিবেন এবং কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, বনজঙ্গল কাটা ও পল্লি ও গৃহ পরিষ্কার রাখা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন, বাঙ্গালা সংবাদপত্র এবং কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র আনাইয়া তাহা তাহা-দিগকে লইয়া পাঠ করিবেন, ইহাই কৃষিবিষয়ক উন্নতির প্রথম সোপান।

'কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক' স্থাপিত করিয়া কৃষিকার্য্যের জন্য টাকা, যন্ত্র ও সার যোগান, কৃষি-উন্নতির দ্বিতীয় সোপান।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া কৃষিবিষয়ক পুস্তকের প্রচার ও কৃষি-বিদ্যালয়-স্থাপন, ইহার তৃতীয় সোপান। কৃষিবিষয়ক শিক্ষা যত অধিক হইবে,ততই কৃষির উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে।

ইহার চতুর্থ সোপান, যেরূপ প্রয়োজন দেখিবেন, গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ আইন করিয়া কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

হুড্রুফল বা সুবর্ণ-রেখার জল-প্রপাত।

ভারতের নানাস্থানে কত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, জন-সাধারণ, হয় ত, তাহার বৃত্তান্ত অবগত নহেন। হাজারীবাঘের নানাস্থানে এমন অনেক মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, যাহা পৃথিবীতে অতুলনীয়। অদ্য কেবল একটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াই প্রবন্ধের শেষ করিব।

হাজারিবাঘে যাঁহারা বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই হয় ত, "হুড্রুফল" দেখিয়া থাকিবেন। সুবর্ণরেখা নদী রাঁচি এবং হাজারিবাঘের সীমার পার্ব্বত্য ভাগে প্রবাহিত হইয়া সাগরের দিকে গিয়াছে। হঠাৎ হুড্রু-নামক স্থানে ইহা পর্ব্বত হইতে ৪০০।৫০০ শত ফিট্ নীচে সমভূমিতে পড়িয়াছে। এইস্থান হাজারীবাঘ হইতে ৬০ মাইলের উপর। আমরা হাজারিবাঘ হইতে রওনা হইয়া প্রথমে মাণ্ডুর (Mandu) বাঙ্গালায় বিশ্রাম এবং আহারাদি করিলাম। মাণ্ডু হাজারিবাঘ হইতে ১৭ মাইল। ইহার নিকটে অনেকগুলি কয়লার খাদ আছে। ৩০ মাইলে রামগড়। এখানে দামোদর নদ পার হইতে হয়। দামোদরের দুইপারে দুইটি বাঙ্গালা আছে। বর্ষাকালে ইহা প্রায় সহজে পার হওয়া যায় না। রামগড় এক সময়ে হাজারিবাঘের রাজধানী ছিল। এখনও হাজারিবাঘের লোকেরা জেলা "হাজারিবাঘ-রামগড়" বলে। এখানে পুরাতন কীর্ত্তির অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান। দামোদরের দক্ষিণ-পারের বাঙ্গালা হইতে দামোদরের দৃশ্য অতি-মনোহর। দুইদিকে ১৫।২০ মাইল পর্য্যন্ত দেখা যায়। ছোট ছোট প্রস্তররাশির উপর দিয়া দামোদরের স্রোত বহিয়া আসিতেছে! বন্যার সময় প্রবলবেগে তাহারই উপর দিয়া জলরাশি চলিয়া আসিতেছে, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়!

এক সময়ে রাঁচির ডাক্ এই পথে চলিত। তাই বন্যার সময় ডাক্ পারাপারের জন্য দামোদরের দুইকূলে দুইটি বৃহৎ মাস্তুল এবং তৎসঙ্গে কপি-কল এবং রজ্জু সংযুক্ত আছে। এই প্রকার যন্ত্রদ্বারা ডাক্ পার করা আর, বোধ হয়, বাঙ্গালা-দেশের কোথায়ও হয় না।

রামগড় হইতে গোলা প্রায় কুড়ি মাইল। গোলা একটী জনাকীর্ণ ক্ষুদ্র সহর। এখান-কার লোকেরা বাঙ্গালা এবং হিন্দী উভয় ভাষাতেই কথা বলিতে পারে। গোলা মান-ভূমের সীমার নিকটবর্ত্তী। গোলা হইতে হুড্রু প্রায় দশ মাইল। ৬।৭ মাইল ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তা আছে। গো-যানে তথায় যাওয়া যায়। তারপরে পাহাড়; হাঁটিয়া যাইতে হয়।

আমরা প্রাতে রওনা হইলাম; কিছু দূর গিয়া গো-গাড়ী ছাড়িয়া হাটিয়া চলিলাম। আমাদের তৈজসপত্র এবং খাদ্যাদি বহন করিবার জন্য একজন জেলেকে মুটে ধরিলাম। শুনিয়াছিলাম, হুড্রুতে বড় বড় মাছ পাওয়া যায়, তাই জেলেকে বেশী পয়সা দিয়া জাল-সহ লইয়া চলিলাম। ২।৩ মাইল ব্যবধান থাকিতে একটা ভীষণ শব্দ শুনিতে লাগিলাম এবং বড় বড় কলের 'চিম্‌নি'তে যেমন ধূম উঠে তেমনি ধূমও দেখা গেল। যে-স্থানে জলপ্রপাত, তাহার চতুর্দ্দিকে গভীর জঙ্গল এবং পাহাড়। পথ-

প্রদর্শকের দরকার। কতকগুলি সাঁওতাল কিম্বা কোল-জাতীয় লোক আশুধান্য ঝাড়িতেছিল। তাহাদিগকে পথ দেখাইতে অনেক করিয়া বলা হইল, কিন্তু তাহারা রাজি হইল না। পুরস্কারের কথাও শুনিল না। শেষে মদীয় একজন ভৃত্য বলিল, "আচ্ছা, আগে থানায় যাই, তারপর কাল দেখ্‌তে পাবে।" এই ব্যক্তি যদিও পুলিস নয়, কিন্তু তাহার মাথায় লাল পাগ্‌ড়ী ছিল। তাহার কথায় অদ্ভুত ফল ফলিল। তৎক্ষণাৎ একজন ধান্য ফেলিয়া সঙ্গে চলিল।

ক্রমে আমরা হুড্রুতে পৌছিলাম। জলরাশি পশ্চিমদিক্ হইতে দুইটি পাহাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া হঠাৎ নিম্নভূমিতে পড়িতেছে। বর্ষার জন্য স্রোত অতিপ্রবল। আমরা জীবনে কেহ কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই। বিধাতার অপূর্ব্বলীলা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া একখানি বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়িলাম। বোধ হয়, প্রায় দুইঘণ্টা বসিয়াছিলাম। কাহারও মুখে বাক্য নাই! যেখানে বসিয়াছিলাম, তথা হইতে নীচের দিকে তাকান যায় না। ভীষণবেগে জল পতিত হইয়া বাষ্পাকারে উপরে উঠিতেছে; আবার সেইস্থানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মত সেই জল যেন বৃষ্টি হইয়া পড়িতেছে। এই বাষ্পের উত্থান এবং পতনই 'চিম্‌নি'র ধূমের মত দূর হইতে দেখাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ পতনের শব্দও শ্রুত হইতেছিল।

যাঁহারা হাজারিবাঘের দিক্ হইতে এই জল-প্রপাত দেখিতে যান, তাঁহাদিগকে ভালরূপ দেখিবার জন্য স্রোতের কিছু উপরে পার হইয়া দক্ষিণদিকে যাইয়া, পাহাড়ের নীচে নামিয়া দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু তাহা শীতকালেই সম্ভব। বর্ষাকালে সে ভীষণ স্রোত পার হওয়া অসম্ভব। পদস্খলন হইলে আর নিস্তার নাই। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় হইতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইতে হয়।

আমাদের পথপ্রদর্শক পাহাড়ীয়াও আমাদিগকে নদী পার হইতে নিষেধ করিল। অগত্যা আমরা পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের সীমা অতিক্রম করিয়া নীচে যাইতে মানস করিলাম। পাহাড়ীয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে বন্দুক আছে কি না। কেন না, সে-পথে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। আমাদের সঙ্গে তখন বন্দুক ছিল; সুতরাং সাহস করিয়া সেই পথে চলিলাম। পাহাড় ঘুরিয়া জলপ্রপাতের ঠিক্ পূর্ব্বদিকে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর আস্তে আস্তে সকলে বসিলাম। প্রস্তরখণ্ডের উপরে অনবরত জল-বিন্দুর পতনে, উহা অতিশয় পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, তথায় বসিয়া আমরা সমস্ত ব্যাপার বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

সমস্ত জলরাশি প্রথমে ছয়টী ধারায় পড়িতেছে। সর্ব্বদক্ষিণের ধারাটী খুব প্রবল নয়। তাহার পরেই কয়েকখানি প্রস্তর একত্রিত করা। উহা শিবের স্থান। তারপরের স্রোতটীও বেশী প্রবল নয়। উত্তর-দিকের চারিটি স্রোতের খুব বেগ। পাহাড়ের গায় প্রায় ৫০ ফিট বহিয়া উত্তর দিকের পাঁচটি স্রোত মিলিত হইয়া একটী বিষম বেগবান্ স্রোতের সৃষ্টি করিয়া তথা হইতে ৪০০-৫০০ শত ফিট নীচে লাফাইয়া পড়িতেছে। বোধ হইল, প্রতিসেকেণ্ডে বিশহাজার মণ লাল তুলা পড়িতেছে। বর্ষাকাল বলিয়া জল ঘোলা এবং

লাল তুলার মত বোধ হইল। শুনিয়াছি, শীতকালে স্রোত সাদা তুলার মত দেখায়, কিন্তু তখন ইহা এত প্রবল থাকে না। এই অবস্থা নিস্পন্দভাবে প্রায় দুইঘণ্টা দেখিয়া, ক্ষুধার জ্বালায় ২।৩ টার সময় উঠিয়া বনের কাট সংগ্রহ করিয়া রান্না চাপাইলাম। এ-দিকে শালপাতা তুলিয়া আহার্য্য রাখিবার ব্যবস্থা হইল। কেহ কেহ স্রোতের জলে পাথর শক্ত করিয়া ধরিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। এদিকে কেহবা সেই জলে জাল ফেলিয়া ছোট ছোট মাছ ধরিতে লাগিল। কিন্তু কেহ বড় মাছ পাইল না।

পৃথিবীতে যত উচ্চ জল-প্রপাত আছে তাহার মধ্যে এই জলপ্রপাত একটী; কিন্তু এদেশে কেহ ইহার নামও করেন না। অথচ অতিদূরদেশ হইতে অনেক ভ্রমণকারী সময় সময় আসিয়া ইহা দেখিয়া যান্। শুনিলাম, নায়াগ্রারার জল-প্রপাতও এত উচ্চ নহে। কেবল তাহার স্রোত ইহার অপেক্ষা প্রবল। এই জলের স্রোতের দ্বারা কোনওপ্রকার কল-চালান যায় কি না, তাহা দেখিবার জন্য একজন সাহেব এখানে ঘর বাধিয়া কিছুদিন ছিলেন। আমরা উপর হইতে দেখিতে-ছিলাম, স্রোতের নীচে পাহাড়ের গায় পায়রাগুলি চড়াই পাখীর মত ছোট দেখাইতেছিল।

আমরা সকলে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমাদের উঠিতে ইচ্ছা ছিল না। আহারাদি শেষ করিয়া আবার সেই প্রথমোক্ত প্রস্তরে সকলে বসিলাম, কিন্তু পথ-প্রদর্শক পাহাড়ীয়া, সন্ধ্যা হইতেছে, বন্যজন্তুর ভয় আছে, বলাতে আমরা উঠিয়া পড়িলাম। একজন খড়ি দিয়া "সুজলাং" লিখিয়া রাখিল। দ্রুতপদে চলিয়া কোন প্রকারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাহাড় এবং জঙ্গল অতিক্রম করিলাম।

হুড্রুফলের অপূর্ব্ব শোভা বর্ণনাতীত! জ্ঞানময় বিধাতার এমন লীলা সচরাচর দেখা যায় না। প্রাণ-মন যে কি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না!

শ্রীরজনীকান্ত দে।

অদৃষ্টলিপি।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপায়হীনা বিধবা সুধীরের মা যখন বিষ্ণুপুরের জমিদার ইন্দুভূষণ বসু-মহাশয়ের বাড়ীতে পাচিকা-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রথম প্রবেশ করিল, তখন লজ্জা-সঙ্কোচে তাহার বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা খুব জোরে আছাড় খাইতেছিল। সে শিবিকায় আসিয়াছিল; যখন যান হইতে অবতরণ করিয়া, জমিদার-বাড়ীর বিন্দী-ঝির প্রদর্শিত পথে, ছয় বৎসরের ছেলে সুধীরের হাত ধরিয়া সে চলিতেছিল, তখন সে মনে মনে ডাকিতেছিল, 'ঠাকুর! এখন যদি পৃথিবীটা দুইভাগ হয়, তবে তাহার মধ্যে লুকাইয়া এ দাসীত্ব করিবার লজ্জা হইতে অব্যাহতি পাই!" কিন্তু তাহার প্রার্থনায় মেদিনী বিদীর্ণা হইল না বটে, তবে সে

অন্তঃপুরে পদার্পণ করিতেই, জমিদার-গৃহিণী করুণাময়ী প্রসন্ন-মুখে তাহার সম্মুখীনা হইলেন; অভাগিনীর সর্ব্বস্বধন সুধীরকে বুকে টানিয়া লইলেন, তার পরে সুধীরের মার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এস, বোন্ এস!"

সে রাঁধুনী হইতে আসিয়াছে, গৃহিণী বলিলেন "বোন", বুকটা যেন শীতল হইল। তারপরে করুণাময়ী তাহাদের ঘরে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার কথা সবই আমি শুনেছি। তা তুমি ভেব না বোন্, কপালে যা ছিল সে ত হয়েই গিয়েছে; এখন তোমার যতদিন ইচ্ছা, আমাদের এখানে থাক।— তোমার ছেলেটি যাতে মানুষ হয়, তা' আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কোর্‌বো। আমরা শুনেছি, আমার মাসাশ্‌-ঠাকুরাণী তোমার মায়ের যা' হতেন; সে-সম্পর্কে তুমি আমার নন্দ, আমি তোমার ভাজ; এ-বাড়ী তোমার নিজের বাড়ী বলেই মনে কোরো।"

সুধীরের মা ভুবনেশ্বরী এমন মধুমাখা কথা শুনিবার মত আশা করে নাই। এই গৃহিণীর মত ভাগ্যবতী যে তাহার মত অভাগিনীকে এমন আদরে গ্রহণ করিবেন, এমন অভয় এমন আশ্বাস দিবেন, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। তবে ত সত্য সত্য বড়লোকেরও হৃদয় আছে! এই দেবীর কাছে পাচিকা কেন,—দাসী হইয়া থাকিলেও ক্ষোভ হয় না। ইতঃপূর্ব্বে ভ্রাতৃগৃহে সে যে অনাদর, যে লাঞ্ছনা, যে গঞ্জনা পাইয়াছে, তাহাই তাহার মনে জাগিতেছিল।

ভুবনেশ্বরী প্রণাম করিয়া করুণাময়ীর পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখন করুণাময়ী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। গৃহে প্রবিষ্টা ঝি রামার মা'র কোল হইতে তাঁহার এক বৎসরের শিশুকন্যাজ্যোৎস্নাকে লইয়া গৃহিণী ভুবনেশ্বরীর কোলে দিলেন। সুতরাং, ভুবনেশ্বরী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিতে মুছিতে জ্যোৎস্নাকে সাদরে গ্রহণ করিল।

বালক সুধীর এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ছিল। এত বড় বাড়ী-ঘর, এ রকম কায়দা-কানুন সে তাহার জীবনে কখনও দেখে নাই। চারি-মহলের প্রকাণ্ড বাড়ী। ফটকে লালপাগ্‌ড়ী মাথায় বাঁধিয়া, বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া দরওয়ান-জী টুলের উপরে বসিয়া আছেন। কাছারী-ঘরে দেওয়ান-গোমস্তা পাইক-পেয়াদা লইয়া প্রজাদিগকে পালন ও শাসন করিতেছেন। আবশ্যক মত কাগজপত্র এবং প্রজাদিগকে উপরের বৈঠকখানায় জমিদার-বাবুর কাছে পাঠাইতেছেন। দ্বিতীয় মহলে বিশাল চণ্ডীমণ্ডপ; সেখানে ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরি সকল টাঙ্গানো রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে ঠাকুর-ঘর; গৃহদেবতা সেইখানে পূজিত হইয়া থাকেন। নাচঘর, তোষাখানা, দপ্তর-খানা, ডাক্তারখানা, সকলই সুসজ্জিত। তার-পরে অন্দর-মহল। সেখানও ঝি-চাকর, কুটুম্বিনী, প্রতিবেশিনী সকলে মুখর করিয়াছে। তখন বেলা অপরাহ্ণ। বারান্দায় জলচৌকির উপরে বসিয়া প্রৌঢ় ভট্টাচার্য্য-মহাশয় মহাভারত পাঠ করিতেছেন, জমিদার-বাবুর বিধবা ভগিনী প্রতিবেশিনীদিগের সহিত একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। সেই-খানে খাঁচায় ঝুলানো ময়না-পাখী কত কথা বলিতেছে। শেষ মহল রান্না-বাড়ী হইতে

ফেনভাত খাইয়া গাভীগুলি গোহালে চলিয়া যাইতেছে, বৎস-সকল লাফ দিয়া মায়ের সঙ্গ লইতেছে, রাখাল পাঁচনি হাতে করিয়া তাহাদের গতি সংযত করিতেছে; ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা কৈবর্ত্তজাতীয়া পেঁচোর মা, রোয়াকের উপরে বসিয়া চাউল ঝাড়িতে ঝাড়িতে মা-ঠাকুরাণীর কাছে একখানি কাপড় যাচ্ঞা করিতেছে; নিতাই-বাগ্‌দী বড় একটা রোহিত-মৎস্য লইয়া রান্নাবাড়ীর দিকে চলিতেছে; সেইখানে সে তাহা কুটিবে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সুধীর যেমন বিস্মিত তেমনি সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন এই চাঁদের আলোর মত, নবস্ফুট ফুলের মত, জীবন্ত মোমের পুতুলের মত জ্যোৎস্নাকে মায়ের কোলে দেখিয়া সে বড়ই খুসী হইল, তাহার চাঁদমুখখানিতে হাসির জ্যোৎস্না ফুটিল; সে হাত বাড়াইলে জ্যোৎস্না তাহার কোলে ঝাপাইয়া পড়িল। সে পুলকিত-চিত্তে জ্যোৎস্নাকে কোলে লইল। কিন্তু ঝি, তাহার কোল হইতে জ্যোৎস্না পাছে পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় অগ্রসর হইয়া জ্যোৎস্নাকে ধরিল। সুধীর একটু অপ্রতিভ হইয়া যেখানে মহাভারত পাঠ হইতেছিল, সেইদিকে ধীরে ধীরে গিয়া দাঁড়াইল।

পুরাণ-পাঠক ভট্টাচার্য্য-মহাশয় তখন পঠন ছাড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছিলেন; অকস্মাৎ সুধীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন কি এক অপূর্ব্বদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক পুরাণ-ব্যাখ্যা বন্ধ রাখিলেন এবং অপলকনেত্রে সুধীরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তার-পরে ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "এস খোকা!"

সুধীর বাধ্যস্বভাব বালক; ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের আহ্বানে সে ধীরে ধীরে তাঁহার খুব কাছে গিয়া দাঁড়াইল; তখন তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কাছে বসাইলেন। তার-পরে তিনি তাহার হস্তরেখা, ললাট, মস্তক, চক্ষু, কিছুক্ষণ সোৎসুকভাবে দেখিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল। জমিদারবাবুর ভগিনী ক্ষেমঙ্করীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ছেলেটী কে মা?"

বিনীতভাবে ক্ষেমঙ্করী সুধীরের পরিচয় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। ব্রাহ্মণ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, —"আশ্চর্য্য!"

ফলিত-জ্যোতিষে এই ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র জ্যোতিঃশেখরের লোকবিশ্রুত সুখ্যাতি ছিল। হস্তরেখা প্রভৃতি পরীক্ষা, জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু দুই বৎসর আগে তাঁহার একটী পাঁচবৎসরের পুত্রের বিয়োগে এবং তাহার অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা জ্যোতিষতত্ত্বে জানিতে পারিয়া, এই ধীর, প্রাজ্ঞ ভাগ্যবেত্তা ব্রাহ্মণ শোকাকুল হইয়া এখন জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছেন; তথাপি অভ্যাসে এবং অনুনয়-অনুরোধের জন্য অব্যাহত হইতে পারেন নাই।

কৌতুহলাক্রান্তা ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কি দেখিলেন ঠাকুর-মশাই?"

ঠাকুর বলিলেন, "দেখি নাই মা, কিছুই; তবে যেটুকু সহসা চক্ষে পড়িল, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। দেখিয়া শুনিয়া এর পরে যা হয়, বলিব।"

পূর্ব্ববৎ মহাভারত-পাঠ আরম্ভ হইল।

(ক্রমশঃ)।

লেখিকা—শ্রীমা—

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নমিতা হাসিল ; ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "এই নিন্, আপ্‌নি আমার ওপর বড়ই অবিচার কর্‌ছেন! —আপ্‌নি কি আমায় এতই অধম মনে করেন যে, একটা বাজে কথার ঘায়ে আমি একেবারে মূর্চ্ছা যাব? না না; তা মনে কর্‌বেন না। এ ত তুচ্ছ, নিতান্তই তুচ্ছ কথা; এ শুধু চর্ম্মের ওপর একটু আঘাত দিলে কি না তাও সন্দেহ!—কিন্তু আমাকে—কারুর কাছে সে কথা বল্‌তেও ঘৃণা হয়, দুঃখ হয়,—আমাকে, আমার এই অল্পবয়স্কতার অপরাধে ব্যক্তিবিশেষের নিকট এমন সব সাংঘাতিক মন্তব্য শুন্‌তে হয়, যা মর্ম্মের ভিতর খুব শক্ত ভাবেই বিঁধে যায়! কিন্তু এর জন্যে কা'র ওপর রাগ বা দুঃখ কোর্ব্বো?...এর জন্যে আমার দেশাচার দায়ী, আমার দেশের লোকের শিক্ষা-সংস্কার দায়ী; এরূপস্থলে ব্যক্তিগত দোষ ধর্‌তে যাওয়াই ভুল! আমি কারুর ওপর রাগও করি না, কারুর কথার জবাবও দিই না; চুপ্‌চাপ্ নিজের কাজ করে যাই।—যাক্‌গে, যেতে দিন্; এখন আর সময় নাই। আসি তবে;—নমস্কার!"

ক্লান্তিনিপীড়িতা ডাক্তারপত্নীকে সত্বর শয়ন করিতে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া, নমিতা তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

(১৬)

সময়ের অনাটনের জন্য অসহনীয় ব্যস্ততায় নমিতার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। খুব ব্যগ্রতার সহিত চোখ-কান বুজিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িয়া ত্রস্ত-চরণে চলিতে লাগিল;—কিন্তু ডাক্তার-পত্নীর সেই বিষাদবহ সকরুণ হাসি, তাঁহার সেই যন্ত্রণার্ত্তা মূর্ত্তি, নিজের ভাবনার ভিড়ে সে আজ কিছুতেই চাপা দিতে পারিল না;—কেমন একটা অস্বস্তি-ব্যাকুলতা তাহার বুকের মধ্যে হায় হায় করিয়া নিষ্ফল পরিতাপে ঘূর্ণিপাক খাইতে লাগিল;—তাহার পর নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহার দ্বিগুণ ক্ষোভ হইতে লাগিল। অসুস্থতা-খিন্ন ক্লিষ্ট প্রাণীটির সময়োচিত কিছু সেবা-সাহায্য করা তাহার অবশ্য উচিত ছিল; কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য, কিছুই সে করিতে পারিল না! কর্ত্তব্য-ত্রুটির আক্ষেপে তাহার মনটা—শুধু কুণ্ঠিত নয়, বেশ একটু উগ্র জ্বালাময় অসন্তোষে ছাইয়া গেল। পায়ের পর পা ফেলিয়া সেই বাড়ীখানা হইতে যতই সে দূরে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহার বুকের ভিতর গুম্-গুম্ শব্দে বেদনার মুষ্ট্যাঘাত প্রবল জোরে বাজিয়া উঠিতে লাগিল!—হায় ভাগ্য-বিড়ম্বনা! এমনই দুঃসহ অবস্থা-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া তাহার কর্ম্মসূত্র পরিচালিত হইয়াছে যে, ঠিক উপযুক্ত প্রয়োজনের মুহূর্ত্তেই সে শক্তি-বঞ্চিত নিরুপায় সাজিতে বাধ্য হইল! দাসত্ব!—ঐ বাহিরের বন্ধন-দাসত্ব,—যাহার ভার বহন করিতে এত দিন তাহার তেজস্বী প্রফুল্ল চিত্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও ক্লান্তিবোধ করে নাই, আজ তাহা নমিতার অনিচ্ছুক হাত-পা-গুলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, যে প্রয়োজন-

টুকুর অন্ধভাবে প্রত্যাখানে বাধ্য করাইল, সেটা বড়ই নিষ্ঠুর শাস্তি মনে হইল। বহুদিনের পুরাতন এবং স্বেচ্ছাস্বীকৃত হৃদয়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা-পূত কর্ম্মদায়িত্ব, আজ আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা-বিরোধী, উৎকট বিস্বাদপূর্ণ পরাধীনতা ও গ্লানি বলিয়া নমিতার সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইল!—তেজস্বী হৃদয়বৃত্তি, ক্ষিপ্ত বিদ্রোহিতায় ঝাঁজিয়া, সজোরে মাথা নাড়া দিয়া তীব্রবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া, হৃদয়ের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে উদ্যুক্ত হইল!...ক্ষুব্ধা পরিতপ্তা নমিতা ভাবিল, আহা, বাজে আলাপের ধূয়া ধরিয়া অনর্থক বক্ বক্ করিয়া যে সময়টা সে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, সে সময়টা যদি ঐ কাজটুকু করিবার জন্য এখন ফিরাইয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে,—আঃ, এই অমার্জ্জনীয় মনস্তাপ-পীড়ন হইতে সে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিত!

জমাখরচের হিসাবে যে মোটা অপব্যয়টা নজরে ঠেকিল তাহাকে নমিতা উপেক্ষা-ভরে এড়াইতে পারিল না। অজ্ঞাতে উষ্ণ বিরক্তিভারে তাহার ভ্রূযুগলে রুক্ষ আকুঞ্চন-রেখা ফুটিয়া উঠিল। বাম-হাতের মুঠায় আবদ্ধ সূতা ও ক্রুশের মধ্যে, অন্যমনস্কতা-বশতঃ সজোর মুষ্টির নিষ্পীড়নে সূতার গুলিটার নম্বরি টিকিটখানার সুশ্রী সুগোল আকৃতি যে নিঃশব্দে শোচনীয় অবস্থায় রূপান্তরিতা হইতেছে, তাহাও নমিতা আদৌ টের পায় নাই। ঘাড় গুজিয়া দ্রুত চঞ্চল চরণে সে অত্যন্ত বেগে রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল। তাহার চরণ-গতির সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী সুশীলকে একরূপ ছুটিয়াই চলিতে হইতেছিল।

বাটীর নিকটস্থ শেষ গলির মোড় ফিরিবার সময় সম্মুখে দ্রুত আগমনশীল স্থূর-স্থন্দর তেওয়ারীকে দেখা গেল। সে, বোধ হয়, বাসা হইতে হাঁসপাতাল যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিতেছিল।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে প্রিয়জন সন্দর্শনে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া, সুশীল, 'দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদম্'—উপদেশটা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেল!—'উট-মুখো' হইয়া স্বচ্ছন্দ-বিশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে, হর্ষোজ্জ্বল নয়নে চাহিয়া সে অতিব্যগ্রভাবে যেমন প্রিয়-সম্ভাষণ করিতে যাইবে, অমনি পথের মাঝখানে পতিত একটা মস্ত ইঁটে অকস্মাৎ সজোরে ঠোক্কর খাইয়া, ঠিক্রাইয়া ঘুরিয়া আসিয়া নমিতার উপর সবেগে পড়িল! সেই অতর্কিত সংঘাতটা এমনি বে-কায়দায় বাজিল যে, সুশীলের সুবৃহৎ মাথাটা ত নমিতার বাম পাঁজরে বেশ জোরেই ঠুকিয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে নমিতার হাতের মুঠায় ধরা ক্রুশের সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ মুখটি তৎক্ষণাৎ খচ্ করিয়া বাম করমূলের চর্ম্মশিরা ভেদ করিয়া আড় ভাবে সটান প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যে বিদ্ধ করিল! বেদনার বিদ্যুৎপ্রবাহ-সন্তাড়নে মুহূর্ত্তে নমিতার মগজ শুদ্ধ যেন ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল! যন্ত্রণা-বিকৃত কণ্ঠে ত্রস্ত-ভাবে সে বলিল,—"উঃ! সুশীল, দেখিস্, তোর লাগে নি ত?"

সুশীল আত্ম-সংবরণ করিয়া, সুস্থ হইয়া নিজের বেদনার সংবাদটা ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই, দিদির করতল-প্রান্তে তীরের ফলার মত কঠিনভাবে বিঁধিয়া স্থির নিশ্চলতায়

বিরাজমান ক্রুশটার পানে চাহিয়া, সহসা আতঙ্ক-ব্যাকুলতায় অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ গো, উহু—হু, যাঃ! দিদি!—"

ক্ষণমধ্যে আত্মদমন করিয়া, দৈহিক যন্ত্রণা উপেক্ষা করিবার ক্ষমতায় অভ্যস্তা, চির-সহিষ্ণু নমিতা শান্ত ও আশ্বাসের স্বরে বলিল, "চুপ চুপ্! ভয় কি? বিঁধে গেছে তা কি হবে? বোকার মত হাউ চাউ করিস্ নি;—থাম্।"

"দেখি—দেখি—" এই কথা বলিতে বলিতে ক্ষিপ্র নৈপুণ্যে অন্য দুইখানি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের হাত অগ্রসর হইয়া আসিয়া, কাহারও অনুমতির অপেক্ষামাত্র না করিয়া, বিনা দ্বিধায় তপ্ত কঠিন স্পর্শের চমকে, আহত হাতখানা এক হাতে মুঠাইয়া ধরিয়া, অন্য হাতে কুনুইয়ের প্রান্ত ধরিয়া সন্তর্পণে তুলিয়া, টানিল। নমিতা দেখিল সে সুরসুন্দর তেওয়ারী!—সুরসুন্দর মাথা ঝুঁকাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষত স্থান পরীক্ষা করিতে লাগিল, আরক্তবদনা নমিতা ধীরে ধীরে হাতখানা টানিয়া লইবার চেষ্টায় মৃদুস্বরে বলিল, "ছেড়ে দিন্, সামান্যই বিঁধেছে।—"

উদ্বিগ্ন সুরসুন্দর নমিতার ব্যবহারে কিছু-মাত্র মনোযোগ না দিয়া, অকুণ্ঠিত অথচ সুকোমল আদেশের স্বরে বলিল, "দাঁড়ান, টান্‌বেন না;—একটু সহ্য করুন্, ওটা টেনে বের করে ফেল্‌তে হবে।"

যতই বিপন্ন হওয়া যাক্ না, একটু ধৈর্য্যশীল হইতে অভ্যাস করিলে,—মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধিটা প্রয়োজনের সময় বেশ সদ্ব্যবহারে লাগে। অসহিষ্ণুতাই যন্ত্রণা বেশী বাড়াইয়া তুলে এবং কাণ্ডজ্ঞান-লোপ করে। সুরসুন্দরের প্রস্তাব মত ধৈর্য্য ধরিয়া ক্রুশটা উৎপাটিত করিতে দেওয়ায় নমিতার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না,—কিন্তু সে বুঝিয়া দেখিল তাহাতে সদ্যোযন্ত্রণামুক্তির আশা অপেক্ষা ভবিষ্যৎ আশঙ্কার সম্ভাবনা বেশী।—ইতস্ততঃ করিয়া শান্ত অবিচলিত মুখে নমিতা বলিল, "সেটা পারা যাবে কি? ক্রুশের মুখ যে বঁড়্‌শীর কাঁটার মত বাঁকানো;—টান্‌তে গেলে এখনি শিরায় আট্‌কে ভেঙ্গে যেতে পারে, তাতে আরো মুস্কিল হবে—।"

"তবে?"—এই বলিয়া ক্লিষ্ট উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া সুরসুন্দর পুনরায় বলিল, "তবে? কি করা যায় বলুন্ দেখি?"

স্থিরনয়নে ক্রুশ-বিদ্ধ স্থানটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নমিতা বলিল, "ছুরী ভিন্ন গতি নাই। হাঁস্‌পাতালে এখন এঁদের কাউকে পাওয়া যাবে কি? আমাদের স্মিথ্ কোথায়?"

সুরসুন্দর বলিল, "তিনি এইমাত্র একটা 'কল' থেকে ফিরে কুঠিতে গেছেন।"

ন। আচ্ছা, তা'হলে তাঁকে এখন জ্বালাতন করা টা ত……।

সুরসুন্দর। কিন্তু না হলে উপায় কি? হাঁস্-পাতালে এখন শুধু সত্যবাবুকে দেখে এসেছি; কিন্তু তাঁর চোখ ভাল নয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে ছুরী ধর্‌তে তিনি রাজী হবেন কি?—হয় ত, ডাক্তার মিত্র ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তিনি আপ্‌নাকে অপেক্ষা কর্‌তে বল্‌বেন্। আহা হা, ওখানটা থেকে রক্ত গড়াতে আরম্ভ হোল! দাঁড়ান্; আমার এই রুমালটা দিয়ে—।"

ব্যস্ত উৎকণ্ঠিত সুরসুন্দর, তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ধব্‌ধবে পরিষ্কার অল্পমূল্যের একটি ছোট রুমাল বাহির করিয়া নমিতার ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিতে গেল; কিন্তু নমিতা

কুণ্ঠিতভাবে পিছু হটিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ক্ষমা করুন্।"

সুরসুন্দর থমকিয়া দাঁড়াইল; ক্ষণমধ্যে তাহার বিশাল আয়ত নয়নে ক্ষোভোত্তেজিত ভৎর্সনা-বিদ্যুদ্দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিল। স্থির তেজস্বী কণ্ঠে সে সবেগে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নিও আমায় ক্ষমা করুন্।—কিন্তু মিস্ মিত্র, আজ এখানে চুপ করে থাক্‌বার সাধ্য আমার নাই। আপ্‌নারা কি মনে করেন, জানি না;—কিন্তু অন্তর্য্যামী সাক্ষী, মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, বিশ্বাস করুন্, আমি আপ্‌নাদের নিজের সহোদরা ছাড়া আর কিছুই মনে কর্‌তে পারি না, পা্‌র্‌বো না!—"

শেষকথাটা সুরসুন্দর এমন জোরে উচ্চারণ করিল যে, বোধ হইল, তাহার স্ফীতবক্ষের ফুস্‌ফুস্ ফাটিয়া তাহার মর্ম্মনিহত শক্তি-তেজস্বিতা প্রচণ্ড বেগে ঠেলিয়া উঠিয়া যেন কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া বজ্র-ঝঙ্কারে ব্যক্ত হইয়া পড়িল!

কাহারও চড়া আওয়াজের ঝাঁঝালো কথা কোনও দিন নমিতার কানে শ্রুতিসুখকর বলিয়া ঠেকে নাই; কিন্তু আজ এইখানে, এই তীব্র কঠিন তিরস্কার-শব্দ—ইহা শুধু কাণে নহে,—একেবারে প্রাণের উপর গিয়া গম্ভীর ভৈরব রাগের দৃপ্ত-মূর্চ্ছনায় সজোরে বাজিল! —কাণ বুঝিল, ইহা কৌশলাভ্যস্ত কণ্ঠের প্রবঞ্চনা-বাণী নহে! প্রাণ চিনিল—ইহা প্রাণের নিষ্ঠাপূত আবেগে উৎসারিত—অকপট সত্য!

ধ্বক্ করিয়া হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার চরম আঘাতে পূর্ণমুক্ত করিয়া, পরম পুরস্কারের প্রসাদ আসিয়া নমিতার অন্তরে পৌঁছিল! বিশ্বাসে শ্রদ্ধায়, সম্মানে, আনন্দে তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া গেল। সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত সঙ্কোচ-জড়তা এক ঝাপ্টায় অন্ধকারে দূর করিয়া দিয়া, গভীর আশ্বাসে শান্তোজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া নমিতা বলিল, "দিন্ রুমাল;—না না, আপ্‌নিই বেঁধে দিন্।"

নমিতা সাবধানতার চেষ্টা ভুলিয়া, যন্ত্রণার আশঙ্কা ভুলিয়া, ত্রস্তে বামহাতখানা সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া, আস্তিনের বোতাম খুলিয়া জামা গুটাইয়া লইল। সুরসুন্দর প্রসন্ন-বদনে, মর্ম্মস্পর্শী স্থিরদৃষ্টিতে একবার নমিতার সেই দৃঢ়, প্রশান্ত, মহত্ত্ব ও গরিমায় উজ্জ্বল, তরুণ, সুন্দর মুখের পানে চাহিল; তারপর কোনও কথা না বলিয়া, দৃষ্টি নামাইয়া, নতশিরে তাহার হাতের রক্ত মুছাইয়া রুমাল বাঁধিতে মনোযোগী হইল।

সুশীল এতক্ষণ ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া নির্ব্বাক্ ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়াছিল। এইবার রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, এক ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া, সাগ্রহে আশান্বিত মুখে বলিল, "ঐ যে,—ডাক্তারবাবু, প্রমথবাবু আস্‌ছেন!"

নমিতা দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল;—সুরসুন্দরও হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া ঘাড় ফিরাইয়া পিছন দিকে চাহিয়া দেখিল,—হাঁ, ডাক্তার মিত্রই বটে। তিনি শব-ব্যবচ্ছেদাগার হইতে ফিরিতেছেন; হাতে পেন্সিল ও 'নোট-বুক' রহিয়াছে। তিনি অশোভনীয় গর্ব্বোদ্ধত ভঙ্গীতে অতি-মাত্রায় ছাতি ফুলাইয়া, ক্রূর-কঠোর তাচ্ছীল্য-ব্যঞ্জক ভাবে, আকর্ণ-ভ্রূকুঞ্চিত-ললাটে, দৃষ্টিতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের হিংস্র জ্বালাময় ঈর্ষা জ্বলাইয়া,

প্রখর কটাক্ষে নমিতার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছেন ;—বেশ ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া !—বোধ হয়, জুতার শব্দ হইবার ভয়ে! তিনি ও-দিকের মোড় হইতে এইরূপভাবে সন্তর্পণে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে, বোধ হয়, পঁয়তাল্লিশ হাত রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন ; এবং এখন রহিয়াছেন মাত্র দশহস্ত-ব্যবধানে !—কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার চলিবার কৌশল! রাস্তার এ মোড়ে দণ্ডায়মান এই তিনটি প্রাণীর কেহই এতক্ষণ তাঁহার আগমন-সংবাদটুকু আদৌ জানিতে পারে নাই !—এবং বোধ হয়, তিনি ঐ রূপে চলিতে চলিতে পাশে আসিয়া না উপস্থিত হইলে কেহ তাহা জানিতেও পারিত না, যদি সুশীলের দৃষ্টি-চাঞ্চল্য-ব্যাধিটুকু মাঝখানে না জুটিত!

নমিতার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র ক্ষণমধ্যে ডাক্তার জুতার 'ডগে' ভর দিয়া চলা ছাড়িয়া বেশ সহজ ভাবে গোড়ালিটা-শুদ্ধ মাটিতে পাতিলেন। তারপর ও-পক্ষের শিরোনমন শিষ্টাচারটুকুর উত্তরে পরিপূর্ণ অবজ্ঞার সহিত নোটবুকের কোণ-দ্বারা ডান চোখের উপরস্থ টুপীর প্রান্তটুকু ঈষৎ ঠেলিয়া উঁচু করিয়া শিষ্টাচার জানাইলেন। মুখখানা আসন্ন-বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত অন্ধকার করিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, ব্যস্ত ও গম্ভীরভাবে টক্ টক্ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। নমিতার হাতের অবস্থাটা যে তিনি দূর হইতে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী না থাকিলেও, তিনি কিন্তু সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া, অম্লান-বদনে, ঘাড় ফিরাইয়া—না দেখিতে পাওয়ার ভানে—যখন স্বচ্ছন্দে বিপন্নকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন অতিবড় নির্লজ্জও তাঁহার কাছে সাহায্য-প্রার্থনায় কুণ্ঠা-কাতর হইতে বাধ্য !......নির্ব্বাক্ নমিতা অধোবদনে ক্ষত-মুখের শোণিত-নিঃসারণ দেখিতে লাগিল। পাছে সুশীল কি সুরসুন্দরের সহিত তাহার চোখোচোখী হইয়া যায়,—পাছে তাহাদের কোনরূপ অপ্রসন্ন মুখভাব চোখে ঠেকিয়া চক্ষুকে পীড়া দেয়, সেই ভয়ে নমিতা চোখ তুলিল না।

সুশীলের বাঙ্‌নির্গম হইল না; কতকটা বিস্ময়ে—আর কতকটা ভয়ে! পাছে সত্যের খাতিরে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করার ফলে, দিদির কাছে ভৎর্সিত হইতে হয়, সেইটুকু শঙ্কা ছিল!

শুধু চুপ্ রহিল না, সুর সুন্দর।—ডাক্তারকে আসিতে দেখিয়া, সে সাহায্য-সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হইয়া বিনা বাক্যে তাড়াতাড়ি রুমালটি খুলিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছিল!—এখন ডাক্তারকে ততোধিক নিঃশব্দে নিশ্চিন্তভাবে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া, সে প্রথমটা সত্যই স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল! বাহিরের লোক নহে, অন্য কেহ নহে।—নমিতা মিত্র উঁহাদেরই অব্যবহিত-নিম্নস্থানীয়া শুশ্রূষাকারিণী, সহকারিণী।—তাহার সহিত ব্যবহারেও কি ডাক্তার-বাবু, ব্যবসাদারী চালে চলিবেন?—দুর্ব্বোধ্য-বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া সুরসুন্দর বলিল, "এ কি! উনি চলে গেলেন! কেন?...... কই! না, আপনার সঙ্গে ত ওঁর কিছু মনোমালিন্য ঘটে নাই! পাচকের কথা?—না না, তাতো জানেন না! তবে?......ওহো-হো, তবে বুঝি—?"

সহসা সংশয়ান্বিত তথ্য মনের মধ্যে তীব্র সত্যে নিষ্কাশিত হইয়া গেল। ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ ভাবে সুরসুন্দর বলিল, "তবে বুঝি, আমার জন্যে?—হাঁ, ঠিক, আমিই ত!—উনি যে আমার সঙ্গে কথা-পর্য্যন্ত ক'ন্ না।"

নমিতা নতশিরে চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া, সুরসুন্দর ম্লান হাসি হাসিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল ও আপন মনেই বলিল, "এমন দরকারী সাহায্যের সময়ও উনি বিমুখ হ'লেন, শুধু ছেলে-মানুষী রাগটুকু বড় করে? বড় পরিতাপের বিষয়! ছিঃ!"

এবার নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল। কণ্ঠস্বরে তীব্র জোর ঢালিয়া দৃঢ় পরিষ্কার স্বরে বলিল, "না 'ছি' বল্‌বেন না। এ যা হোল, 'ছি' বল্‌বার বাইরে! মূর্খের বুদ্ধিদোষ ক্ষমার্হ, কিন্তু শিক্ষিতের নয়। আমার এই তুচ্ছ সাহায্যটুকু না করার জন্য ওঁর ওপর আমি কিছুমাত্র রাগ রাখ্‌তে চাই নে; বরং ওঁর কাছে যে সাহায্য নিতে হোল না, এর জন্যে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু ওঁর জন্যে দুঃখ হচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর-প্রকৃতি বলুন্ দেখি! আমার সঙ্গে কিছুমাত্র শত্রুতা না থাকাতেও উনি যখন এ-রকম ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হলেন না, তখন যার সঙ্গে বাস্তবিকই কিছু মনান্তর ঘটেছে, সে যদি কোনও সময় সঙ্কটাপন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়ায়,—তা হ'লে? তা হ'লে তখনও উনি এমনি ভাবে নিজের শিক্ষার মর্য্যাদা ভুলে, মানুষের কর্ত্তব্য ভুলে তার সম্বন্ধেও এমনি ব্যবহার করবেন!...... একে কি বল্‌বো? আত্মসম্মান-রক্ষা? না, দম্ভ অভিমানের অন্ধপূজা?"

জ্বলন্ত লৌহের উপর হাতুড়ীর সজোর আঘাত বাজিলে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রাইয়া উঠে, নমিতার ভিতর হইতেও কথাগুলা ঠিক্ তেমনই ভাবে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইল!—এবং যাহার উদ্দেশ্যে বলা হইল, তাহাকে না পাইয়া সেগুলা যেন লক্ষ্য ডিঙ্গাইয়া, সবেগে ছুটিয়া আসিয়া সুরসুন্দরের মাথায় আঘাত করিল। সুরসুন্দর ঘাড় হেঁট করিয়া নির্ব্বাক্ রহিল।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নমিতা সজোরে বলিল, "না, আমি স্মিথের কাছেই চল্‌লুম। আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে না; আপ্‌নি হাঁস্‌পাতালে যান্। সুশীলকে নিয়ে আমি যাচ্ছি।"

ঈষৎ হাসিয়া মুখ তুলিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপনি কি আমার ওপরেও অবিচার কর্‌তে চান্? করেন করুন; কিন্তু আমার 'ডিউটী'র সীমা 'হাঁস্‌পাতাল গ্রাউণ্ডে'র মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা আমি জানি। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন কোর্‌বো, বাধা দেবেন না।"

সুশীলের দিকে চাহিয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে সুরসুন্দর বলিল, "দাদা বাড়ী যাও, কিছু ভাব্‌না নেই; আমি এখনি দিদিকে সঙ্গে করে এনে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাব—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "না না, ও সঙ্গে আসুক্; না হলে বাড়ী গিয়ে গোলমাল করে এখনি সবাইকে ভাবিয়ে অস্থির কর্ব্বে। সঙ্গে থাকলে, সে দায়ে নিশ্চিন্ত থাকবো—।"

সুরসুন্দর বলিল, "তবে এস সুশীল—।"

তিনজনে স্মিথের কুঠির দিকে দ্রুতপদে চলিলেন। (ক্রমশঃ)।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

কে তুই আমার ?

১

কে তুই আমার ?
কেমনে প্রকাশি ক'ব,
তুই যে আমার সব,
তুই যে আমার যাদু, কত সাধনার !
তুই সে দেবের স্মৃতি,
তুই মোর সুখ-প্রীতি,
স্বর্গ-মোক্ষ-ফল তুই কত তপস্যার !

২

কে তুই আমার ?
তুই যে সর্ব্বস্ব ধন,
তুই মোর প্রাণ মন,
সংসার-মরুভূ-মাঝে সুরভি মন্দার !
ক্ষণে না হেরিলে তোরে,
মরমেতে যাই মরে,
আঁধার নিরখি যাদু, এ বিশ্ব-সংসার !

৩

কে তুই আমার ?
অন্ধের নয়ন-মণি,
কাঙ্গালের রত্নখনি
নন্দনের পারিজাত, তুই রে আমার !
তুই হৃদয়ের যন্ত্র,
তুই মোর মূল মন্ত্র,
হৃদয়ী বীণায় তুই রাগিণী-মল্লার।

৪

কে তুই আমার ?
আঁধারে আলোক-ধারা,
তুই মোর ধ্রুবতারা,
তাপিত হৃদয়ে তুই শান্তি-সুধাধার।
বিধি যেন দয়া করে,
চিরায়ু করেন তোরে
সদা এই ভিক্ষা যাচি পদে বিধাতার।

৫

শুভ জন্ম দিনে তোর কি দিবরে আর ?
ধর শুভ আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক্ মন-সাধ
হৃদয়ে বহুক্ সদা শান্তি-পারাবার।
হে বিভো ! মঙ্গলময়,
অভাগী কাতরে কয়,
শুভাশিস্ শিরে সদা ঢাল বিরজার।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

আলোক—

এ ভগ্ন বীণায় কাহার রাগিণী
বাজিল মধুর তানে !
স্বরগের সুধা বরষা-ধারায়
জুড়ায়ে তাপিত প্রাণে !
আঁধার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ
আশার আলোক হেরি !
করুণার দান দিয়েছে এ দীনে
ওহে দয়াময় হরি !
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে লুটাই চরণে
নয়নে প্রেমাশ্রু-ধার !
আকিঞ্চনে দয়া বিতরিছ প্রভু,
করুণা তব অপার !
ভগন কুটিরে নবীন আলোক
এনেছ হৃদয়-মণি !
মায়ের বাছনি, বাপের দুলাল,
ও মুখ মণির খনি !

মধুমাখা মুখে একটি চুম্বনে
হরিল প্রাণের ক্ষুধা,
অতৃপ্ত নয়নে মেটে না যে আশ
হেরিয়ে আলোক-সুধা !
মুনি-মনোনীত নন্দন-শোভিত
মোর হৃদয় আগার,
স্বরগ হইতে এল আচম্বিতে
নির্ম্মাল্য এ দেবতার !
থেক চিরদিন মায়ের অঙ্কেতে
উজল করিয়ে জ্যোতি,
তোরে জগদীশ মঙ্গল ধারায়
আশিস্ করুন্ নিতি।

শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবী।

মার্কিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক দৃশ্য।

ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমরা খুব কমই নিজেদের দেশের মেয়েদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহার প্রথম কারণ এই যে, আমেরিকাতে যত স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, এদেশে তাহা তত নাই। যখন আমরা সেই স্বাধীন রাজ্যের "ডানা-কাটা" পরীদের সহিত "At home", "Ball-dancing", "Peanut Banquet", "Epworth league" প্রভৃতিতে মিশিতাম, তখন সেই দেশের নারীরা অত্যন্ত মেশা-মিশি সত্ত্বেও তাঁহাদের সরলতা ও পবিত্রতাকে কিরূপে রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহাই আমাদের নিকট প্রথম আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমি সে দেশের বিশ্ববিদ্যা-লয়ের, কতকগুলি সামাজিক দৃশ্য পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট অগ্রে বর্ণনা করিয়া দেখাইতেছি।

আমেরিকার State University গুলি Co-educational অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় নহে। সেখানে যুবক-যুবতী সকলেই সমান শিক্ষালাভ করেন, সকলেই একত্রে Lecture শুনিয়া থাকেন, একত্রে Laboratoryতে কাজ করেন, Oratorical বা debating contestতে পক্ষ গ্রহণ করেন। যখনই কোনও একটী "At-home of social night" হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাত্রদের অপেক্ষা কার্য্যে বেশী উদ্যোগিনী হ'ন্।

ক্যানেডায় থাকিতে (Toronto) টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের "At-home"এ কয়েকবার গিয়াছিলাম। ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুইটী dormitory (অর্থাৎ ছাত্র ও ছাত্রীদের বাসগৃহ) আছে;—একটী ছাত্র-দের জন্য, আর একটী ছাত্রীদের জন্য। ছাত্রীদের dormitoryতে একটি প্রকাণ্ড Reception room (অর্থাৎ অভ্যর্থনা-গৃহ) আছে এবং কতকগুলি cosy corners (অর্থাৎ নির্জ্জনে বসিয়া গল্প করিবার স্থান) আছে। প্রত্যেক পাক্ষিক শুক্রবারে ছাত্রীরা ছাত্রদের "at-home"তে নিমন্ত্রণ করেন।

সে দিবস আমরা প্রায় ৩০০ছাত্র ঠিক রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে মেয়েদের dormitoryতে পৌঁছিয়া দেখি যে, আমাদের কতিপয় ছাত্র বন্ধুরা সেখানে 'Introducing Committee' নামে এক একটী চিহ্ন বুকের উপর আঁটিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিতেছেন। আমরা কতিপয় ছাত্রীদিগকেও ঐরূপ চিহ্ন বুকে লাগাইতে দেখিয়াছি। সকলকে পরস্পরের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়াই ইঁহাদের কার্য্য।

আমরা Dormitoryর আর একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে, আমাদিগকে একখানি করিয়া ছোট খাতা ও পেন্সিল বিতরণ করা হইল। নিম্নে একখানি ছোট খাতার অবিকল নকল দেওয়া হইল :—

'AT-HOME.

	Names	Rendezvous
1. Orchestra Waltz—Take me out to the ball game.		
2. "Tell her" Barry.		
3. Orchestra Intermezzo—Red-wings.		
4. "It was a lover and his lass."		
5. Orchestra Two-step-society swing.		
6. "When the heart is young"—Bnck		
7. Orchestra Waltz—My lady daughter.		
8. "Since first time I met thee" Rubenstead.		
9. Orchestra selection—Apple Blossom.		
10. "Oh, hush thee my baby" Sullivan.		
11. Orchestra selection —Egyptian waltzes.		
12. 'The Battle Eve"—Bonheur.		

Information.

For concert numbers kindly assemble in the Gymnasium as promptly as possible, as the door will be closed five minutes after close of preceding promenade.

Refreshment in Dining Hall from 10 P.M.

Promenades 10 minutes.

Cars will be in waiting at close."

(অর্থাৎ সম্মিলিত সঙ্গীতের সময় কুস্তির আখ্‌ড়াতে যত শীঘ্র পারেন সকলে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সমবেত হইবেন, যে-হেতু দরজা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বচ্ছন্দভ্রমণের পাঁচ মিনিট পরে বন্ধ করা হইবে। রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে আহারের ঘরে জলযোগের আয়োজন করা থাকিবে। একটী মহিলাকে লইয়া দশ মিনিটের বেশী কেহ স্বচ্ছন্দ-ভ্রমণাদি করিতে পারিবেন না। "At home"এর পরে ট্রাম-গাড়ী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে।)

যে সমস্ত ছাত্রীরা ছাত্রদের সহিত "অল্প-ক্ষণের জন্য বেড়াইতে ও গল্প করিতে চান," তাঁহাদের নাম খাতায় সহি করান হয় ও নির্দ্দিষ্ট মিলন-স্থানের কথাও লিখিতে হয়। ছাত্রেরাও তাঁহাদের নিজেদের খাতায় ছাত্রী-দের নামও সহি করাইয়া লন। এইরূপে ঐ খাতা সকলকে বিতরণ করা হইলে, একটী অধিকবয়স্কা মহিলা একটী শৃঙ্গ বাজান এবং তৎক্ষণাৎ প্রায় ৬০০ যুবক ও যুবতী পরস্পরের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য "হলে"র চারিদিকে ছুটাছুটী করেন। প্রত্যেক খাতায় অন্ততঃ ১২ জনের নাম সহি করা যাইতে পারে।

আমরা এমনও দেখিয়াছি যে, যে সমস্ত যুবক ও যুবতী অত্যন্ত লাজুক ও লজ্জাশীলা,

তাঁহারা তাঁহাদের খাতায়, হয়ত, দুই-তিন জন partner বা অংশীর নাম মাত্র সহি করাইয়া রাখিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ সে রাত্রে সে সময়ে থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তাগুলি শুনিতে পাইতেন :—"মহিলাগণ একস্থানে দাঁড়াইয়া ভিড় করিবেন না;" "সরে চলুন, লজ্জা করিবেন না;" "আপনি যাহার সহিত স্বচ্ছন্দে বেড়াইবেন ও আলাপ করিবেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন?" "মিস্! আপনার কি বারটা নামই সহি হইয়াছে?" "না; আমার ৩নংটা এখনও খালি আছে।" ইত্যাদি।

দশ মিনিট অন্তর ঘণ্টা বাজান হইত, এবং তদনুসারে আমরা আমাদের partner বা অংশীর পরিবর্ত্তন করিতাম। এইরূপে যে যুবক ও যুবতী লাজুক নহে, তাহারা অনায়াসে বার জনের সহিত স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ ও আলাপ-পরিচয়ের আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা লাজুক তাঁহাদের সময়টা ভাল-রূপে কাটে না।

আমি যে রাত্রে প্রথম "at-home" এতে যাই, সে-রাত্রের গল্পটা একটু বলি। প্রথম রাত্রে আমি আমার স্বভাবানুসারে বড়ই লাজুক ছিলাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঘন ঘন যাওয়া আসা করাতে আমার সে লজ্জা দূর হইয়াছিল। প্রথম "at-home"এর রাত্রে আমি কোনও ছাত্রীকেই আমার সহিত ভ্রমণ ও আলাপ করিতে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। আমার সমকক্ষবাসী (room-mate) দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, আমি লাজুক বালকদিগের ন্যায় একস্থানে দাঁড়াইয়া আছি। তখন তিনি তাঁহার সঙ্গিনীকে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন :—"সিংহ! ব্যাপারটা কি? তুমি কি একটিও মেয়ের সহিত আলাপ করিতে পারিলে না?" আমি তদুত্তরে বলিলাম, "না; তোমাকে ধন্যবাদ! কিন্তু এরূপ সমাজিক জীবন আমার কাছে নূতন লাগিতেছে। আমি কখনও আমাদের দেশে এভাবে মেয়েদের সহিত মিশিতে শিক্ষা পাই নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র আমার বন্ধুটি তাঁহার সঙ্গিনীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিয়া আমাকে বলিলেন :—"You take care of my lady, Sinha! I am going. If you don't treat her all right, I shall dump your bed to-night." (অর্থাৎ, "সিংহ! তুমি এই মহিলার যত্ন কর, আমি এখন যাইতেছি। যদি তুমি তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার না কর, আজ রাত্রে তোমাকে বিছানা হইতে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিব।) এই কথাতে আমরা আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন সেই নিম্নগণ্ড ও ক্ষীণমধ্যা যুবতী আর কোনওরূপ দ্বিধা না করিয়া তাঁহাদের প্রথানুসারে আমার হস্ত ধারণ করিয়া আমার সহিত বেড়াইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমার অন্যান্য বন্ধুরা আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "সিংহ! তুমি আমাদের মেয়েদের সহিত বেড়াও, ইহা আমরা পছন্দ করি না। আমরা যখন ভারতবর্ষে যাইব, তখন কি তোমাদের দেশের মেয়েরা আমাদের সহিত ঐরূপে বেড়াইবেন?"

তারপর ঠিক্ যখন রাত্রি দশটা বাজে, তখন প্রত্যেক যুবক তাঁহার Partnerকে

সঙ্গে লইয়া খাইবার ঘরে কিঞ্চিৎ জলযোগের জন্য আসেন। সেই সময় ক্যানেডার চাকরাণীরা পরিবেশনের জন্য খুব ব্যস্ত থাকে। জলযোগের পর সব ছাত্র ও ছাত্রী, অধ্যাপক এবং তাঁহাদের পত্নী,—সকলে, একজন পুরুষ ও আর একজন নারী, পরস্পরের হাত ধরিয়া কতিপয় circle বা বৃত্ত রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত গান গাহিয়া সে রাত্রের "at home"এর কাজ শেষ করেন :—

"Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind ?
Should auld acquaintance be forgot,
And days of auld lang Syne ?"

* * *

এইবার পাঠকপাঠিকাগণকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দৃশ্য দেখাইতে লইয়া চলি। আমরা ইলিনয় কৃষি-সমিতির সভ্য। আমরা বৎসরে চারিবার মাত্র Social nightএর আয়োজন করিতাম। আমরা ঐ চারি রাত্রে "House hold Science Club"এর সমস্ত মহিলা-দের নিমন্ত্রণ করিতাম। উক্ত ক্লাবের সমস্ত মহিলাদের নামের তালিকা ও তাঁহাদের বাড়ীর ঠিকানা-লেখা কাগজ "Ag-club" (অর্থাৎ আমাদের ক্লাব) এর Social-night যেদিন হইবে সেই নির্দ্দিষ্ট দিনের ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতে আমাদের ক্লাবের সভ্যদের নিকট পাঠান হইত। ঐ তালিকা হইতে প্রত্যেক সভ্য যে কোন একটি মহিলাকে বাছিয়া লইবেন ; তাঁহার সহিত তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বে থাকুক্ বা না থাকুক্। যিনি যাঁহাকে বাছিয়া লইবেন, সেই মহিলা সেই সভ্যের জন্য "reserved" বা নির্দ্দিষ্ট থাকিবেন। তারপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক সভ্যকে নিজের নিজের নির্ব্বাচিতা মহিলাকে ক্লাবে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে হইবে।

একদিন সন্ধ্যায় আমাকে একটী ঐরূপ অচেনা যুবতীকে ক্লাবের নিমন্ত্রণে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইতে হইয়াছিল। তিনি বেশ নিঃসঙ্কোচে একাকী আমার সহিত বাটী হ'তে বাহির হইলেন। আমি তাঁহাকে ক্লাবে অতিযত্নের সহিত আহার করাইয়াছিলাম। আমরা ভারতবর্ষে কোনও মহিলাকে কি ঐরূপ করিয়া ক্লাবের নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ তাঁহার বাটী হইতে আনিতে সাহস করিতে পারি !

একবার আমি আমেরিকার একটী ধর্ম্মপ্রচারকের স্ত্রীকে গল্পচ্ছলে বলিয়া-ছিলাম :—"আমি আমেরিকাকে ভালবাসি। তাহার স্বাধীনতা অতিচমৎকার। কিন্তু আপনার মেয়েরা প্রত্যেক রাত্রে একাকী "অপেরা হাউসে," "কাফে" এবং অন্যান্য আমোদের স্থানে যান, আমি ইহা পছন্দ করি না। আপনি কেন ঐরূপ প্রশ্রয় দেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "যে-হেতু আমরা আমাদিগের কন্যাদিগকে বিশ্বাস করিয়া থাকি, সেইজন্য। যদি আমরা তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি, তাহা হইলে তাহারা কখনও রক্ষকের সঙ্গ ছাড়া বাটীর বাহির হইবে না।' এই বিষয়টী দুইদিক দিয়া দেখিতে হইবে। মিঃ সিংহ, মার্কিন মেয়ে মানুষ করিবার দুইটী উপায় আছে। আমরা আমেরিকান্ honour-systemকে বিশ্বাস করি ; এবং কার্য্যতঃ দেখিয়াছি যে, অধিকাংশ স্থলে ইহাতে ভাল

ফল ফলিয়াছে। আমি আশা করি, আপনি ভারতবর্ষে ফিরিলে এই প্রথা সেখানে প্রচলিত করাইতে চেষ্টা করিবেন। উক্ত মহিলাটীর উত্তর যুক্তিসঙ্গত কি?

Household Science ক্লাবের মহিলাগণও "ag-club"এর সমস্ত সভ্যগণকে চারিটী সান্ধ্য-সম্মিলনে" নিমন্ত্রণ করেন। এই নিমন্ত্রণ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Women's Buildingএ হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা ভালরূপ তালিকা প্রস্তুত করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Women's Buildingএ প্রবেশ করিলে মহিলারা ছোট ছোট কাগজ আমাদের সকলকে বিতরণ করিলেন। ঐ সমস্ত কাগজে দেশের ও রাজ্যের নাম লেখা আছে। মহিলাগণও ঐরূপ ছোট ছোট কাগজ লইয়া থাকেন। তবে, তাঁহাদের কাগজে দেশের ও রাজ্যের রাজধানীর নাম লেখা থাকে। মনে করুন, আমি পুরুষ মানুষ সেইজন্য আমি "New York" লেখা এক টুকরা কাগজ পাইলাম। আমার যিনি Partner বা সঙ্গিনী হইবেন সেই মহিলাটির কাগজে New Yorkএর রাজধানী Albanyর নাম লেখা থাকিবে। ভূগোল পড়া না থাকিলে এইরূপ সান্ধ্য-সম্মিলনে আনন্দ উপভোগ করায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

এক্ষণে যে মহিলাটি "Albany"-লেখা কাগজ হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার অন্বেষণে আমাকে ভিড়ের মধ্যে ফিরিতে হইবে। ঐ মহিলাটীও ইতোমধ্যে "New York" লেখা কাগজ হাতে করিয়া যে পুরুষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার অন্বেষণে ফিরিবেন। তারপরে আমি যখন আমার সঙ্গিনীকে খুঁজিয়া পাইব, তখন তিনি আমাকে 'laboratory of Kitchen', মেয়েদের ব্যায়ামের আকড়া প্রভৃতি স্থানে লইয়া ভ্রমণ করিবেন। ইতোমধ্যে 'হলে' Vocal Solo, Piano Solo বা কিছুর আবৃত্তি হইতে থাকিবে। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগের পর প্রত্যেক অভ্যাগত ব্যক্তি নিজের নিজের সঙ্গিনীকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে যাইবেন।

আমার আর একটি রাত্রের সামাজিক নিমন্ত্রণের কথা মনে আছে। ইহা ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Graduate School Club' এর সভ্যরা করিয়াছিলেন এবং ইহার সভ্য আমিও কিছুকাল ছিলাম। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের President (অর্থাৎ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের মত ব্যক্তি), Graduate Schoolএর সকল ছাত্র ও ছাত্রী এবং Graduate Schoolএর সমস্ত অধ্যাপক উহাতে নিমন্ত্রিত হ'ন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Women's Buildingতে প্রবেশ করিবামাত্র আমরা দেখি যে, আট-দশটী মহিলা 'পিন্' ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Official blank cardগুলি লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রত্যেক অভ্যাগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক একটি কার্ড ও একটি পিন্ লইবেন এবং কার্ডের নিম্নলিখিত স্থানগুলি পূর্ণ করিবেন :—

"Name...

Name of your Alma Mater...

Name of your local College..."

এই সকল পূর্ণ করা হইলে কার্ডখানিকে কোটের বা জ্যাকেটের সামনের দিকে পিন্ দিয়া আটকাইয়া রাখিতে হইবে। এরূপ

করার উদ্দেশ্য যে, আপনি বা আমি কে, তাহা কার্ড পড়িয়া বুঝিতে পারা যইবে। এখানে কেহ কাহাকেও পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য নাই। এখানে নিজে নিজেই আলাপ-পরিচয় করিয়া লইতে হইবে।

আমরা ভিড়ের মধ্যে যাই এবং নিজ নিজ নাম বলি :—"Sinha is my name ; let me read your name.—Miss Mc Taggart. Is that the way you pronounce your name ?" তিনি বলিলেন, "Yes, sir ; glad to meet you." এইরূপে ছাত্র-ছাত্রী পরস্পর পরস্পরের নিকট পরিচিত হইয়া থাকেন।

তারপর Graduate School Clubএর কোনও না কোনও সভা কোনও না কোনও বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। সর্ব্বশেষে জনতা নাচের ঘরের দিকে যাইবে। সেখানে একটি পুরুষ অধ্যাপক এবং তাঁহার একটি ছাত্রী, একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী, একটি স্ত্রীলোক ও অন্য স্ত্রীলোকের স্বামী যুগলনর্ত্তন আরম্ভ করিবেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক নাচের পর আনন্দ-ধ্বনি হইয়া থাকে, তাহার পর নিম্নলিখিত গানটি করিয়া সে রাত্রের কার্য্য শেষ করা হয় :—

"You meet her on the campus,
You meet her in the hall,
You meet her in the class-room,
At a lecture or a ball.
"She's numerous as to number,
She's varied as to name,
And yet where'er she may appear,
You know her just the same.

Chorous,
"O College Girl—the Girl of Illinois,
O College Girl, she's loyal and true to the Orange and Blue.
O College, College Girl—the Girl of Illinois,
The witching spell she wields so well,
There's nothing can destroy.
O College, College, Girl, chockfull-of-knowledge Girl,
The fascinating, captivating Girl of Illinois.'

এক্ষণে আমি আমার পাঠকপাঠিকাগণকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?—এইরূপ সামাজিক দৃশ্য-সম্বন্ধে আপনারা কি মনে করেন ? এইগুলি কি শিক্ষার অংশ নয় ? আপনারা কি মনে করেন যে, আমরা আমাদের চরিত্র কলুষিত করিয়াছি, যেহেতু ঐ সমস্ত মেয়েদের সহিত ঐরূপভাবে মিশিয়াছিলাম ? শেষ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি—"না, তাহা আদৌ নয়।" আমরা যে St. Petersburg, Gottingen, Cambridge, Tokyo, Peking, Harvard, Boston, Wisconson, Leland ও Standford প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, এইজন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে নানাবিধ ভাবোদ্দীপক যুবক ও যুবতীদের সহিত মিশিয়া ও নানাবিষয়ে আদান-প্রদান করিয়া, আমার মনে হয়, আমরা একটু উদার হইয়া ও হৃদয়টীকে একটু বিস্তৃত করিয়া দেশে ফিরিয়াছি। এইরূপ মিলন শিক্ষাদায়ক এবং আনন্দজনক, ইহা আমার বিশ্বাস। অবশ্য, লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কেহ কেহ হয় তো বলিবেন যে, আমাদের মতগুলি শিষ্টজনোচিত নহে, কিন্তু আমি তাহা মনে করি না।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

তপস্যা।

(উপন্যাস)

(১)

কলিকাতার চোর-বাগানে একটী সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য হর্ম্ম্যের দ্বিতলস্থ কক্ষে বসিয়া অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ একখানি সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিলেন। কক্ষটী সুন্দর, সুপ্রশস্ত এবং আধুনিক প্রথায় সজ্জিত। কক্ষটী দর্শন করিলে গৃহস্বামীর রুচি ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কক্ষতল বহুমূল্য 'কার্পেটে' মণ্ডিত, কক্ষগাত্র নানাবিধ সুন্দর ও সুবৃহৎ চিত্র-ফলকে শোভমান এবং মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য বৈদ্যুতিক আলোকাধার কক্ষের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি মর্ম্মর-প্রস্তরের বৃহৎ টেবিল। টেবিলের উপরে বিস্তর পুস্তক, 'অ্যালবাম্', মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি অসুবিন্যস্তভাবে পড়িয়া ছিল। টেবিলের চতুঃপার্শ্বে স্প্রীংয়ের গদীযুক্ত কতকগুলি মূল্যবান্ কেদারা। অবিনাশবাবু একখানি কেদারায় বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। কতকগুলি ছোট ছোট বালক-বালিকা সেই কক্ষ-মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময় একজন অনিন্দ্য-সুন্দর-কান্তি যুবা কক্ষের দ্বারদেশে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একটী ক্ষুদ্র বালক সহাস্য আস্যে একটী বালিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওলে লাবি, দামাই-বাবু এতে তে লে, দামাই-বাবু!"

বালিকা বলিল, "ধেৎ! দামাইবাবু বুঝি? জামাই বাবু!"

বালককে এইরূপ শিক্ষা দিয়া, একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা, একরাশি কাল কোঁকড়া কেশের গুচ্ছ দুলাইয়া, গাল-ভরা হাসি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া যুবকের হস্তধারণ করিয়া বলিল, "দেখুন জামাইবাবু! খোকা জামাইবাবু-বল্‌তে পারে না;—দামাই বাবু বলে! ছেলে মানুষ কিনা!" সে এই বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া আসিল। অবিনাশবাবুকে সম্বোধন করিয়া বালিকা বলিল, "বাবা! জামাইবাবু এসেচেন।"

অবিনাশবাবু পাঠে নিযুক্ত চক্ষু না তুলিয়াই বলিলেন, "বোস।" যুবক সে আদেশ পালন করিলেন না; তিনি নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুবকের বদনমণ্ডল উদ্বেগপূর্ণ;—যেন কিছু ক্রোধব্যঞ্জক; এবং তাহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব প্রতীয়মান হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অবিনাশবাবু সংবাদ-পত্রখানি সরাইয়া রাখিয়া, চক্ষু হইতে চশ্‌মা-যোড়াটী খুলিয়া তাহা বস্ত্রাগ্রভাগ-দ্বারা মুছিতে মুছিতে যুবককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "কবে কল্‌কাতায় এলে?"

যুবক। আজই এসেছি।

অবিনাশবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হুঁ!" তাহার পর তিনি টেবিলের উপর হইতে একখানি পুস্তক লইয়া ক্রমান্বয়ে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। যুবক তদ্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন কি বলি বলি করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবিনাশবাবু এইরূপ

পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে "বাবুলাল" বলিয়া ডাকিবামাত্র, "জী" বলিয়া উত্তর দিয়া একজন হিন্দুস্থানী বালক ভৃত্য আসিয়া দর্শন দিল। অবিনাশবাবু বলিলেন, "যা বাড়ীতে বল্‌গে যা, জামাই বাবু এসেছেন।" "বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া ভৃত্য সেলাম ঠুকিয়া আদব্‌-কায়্‌দা জানাইয়া প্রস্থান করিল।

যুবকের দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি দ্বারা এক-খানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া অবিনাশবাবু বলিলেন, "বোস না।"

এবারে যুবক বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করিলেন। বালক-বালিকাগণ তাহাদের ইচ্ছামত প্রশ্ন করিয়া যুবককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। যুবক তাহাদের কথার যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া তাহাদের কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন ও তাহার পর অবিনাশবাবুর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বিনয়-নম্র বচনে বলিলেন, "আমি ওদের আজ নিয়ে যেতে এসেছি।"

অবিনাশবাবু কাগজ পড়িতেছিলেন; মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "কা'দের?"

যুবক কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ বিনীতভাবে বলিলেন, "ওদের।"

অবিনাশবাবু এবার যুবকের দিকে চাহি-লেন; চাহিয়া অবজ্ঞাভরে তিনি বলিলেন, "কা'কে?—লিলীকে?—সে দিন ত তোমার বাপ্‌ এসেছিলেন—। আমি ত বলে দিয়েছি এখন পাঠান হবে না!"

ক্রোধে যুবকের বদনমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া উঠিল; তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন, "যখনই নিয়ে যাবার কথা হয়, তখনই আপনি বলেন, এখন পাঠান হবে না।' এটা আপনার উচিত নয়।"

অবিনাশবাবু একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার কি উচিত কি অনুচিত, তা তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি! আমার মেয়ে, আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন পাঠাব। কারোও হুকুম তামিল কর্‌তে আমি বাধ্য নই।"

যুবক আর ক্রোধ-সংবরণ করিতে সক্ষম হইলেন না; উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "হাঁ, মেয়ে আপ্‌নার বটে; কিন্তু মেয়ের যখন বিয়ে দিয়েছেন, তখন আর মেয়েতে আপ্‌নার কোনো অধিকার নেই। যখন আমরা নিতে আস্‌বো, তখন অবশ্যই আপ্‌নি পাঠাতে বাধ্য।"

শ্বশুর-জামাতায় কথাটা অবশ্য ধীরে ধীরে হইতেছিল না। বহির্দ্দেশ হইতে গৃহিণী তাহার কতকটা শুনিতে পাইয়াছিলেন। দোক্তা-সংযুক্ত তাম্বুলের রাগে অধর রঞ্জিত করিয়া অঞ্চলপ্রান্তে ওষ্ঠদ্বয় মুছিতে মুছিতে হেলিতে দুলিতে গৃহিণী তথায় উপস্থিত হইলেন। আসিয়া তিনি অবিনাশ-বাবুকে বলিলেন, "কি, হয়েছে কি? অত চেঁচামেচি কিসের?"

অবিনাশবাবু শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "জামাই-বাবাজী লীলীকে নিয়ে যাবেন বলে আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর্‌তে এসেছেন!"

যুবক বলিলেন, "ঝগ্‌ড়া কর্‌তে আসি নি। আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। নিয়ে যাব।"

অবিনাশবাবু সদর্পে টেবিলে এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমি কিছুতেই পাঠাব না।"

যুবকও ততোধিক উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাঠাতেই হবে ; নইলে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন ?"

অ। ঝকমারি করেছিলুম্। তখন মনে করেছিলুম, তুমি একজন মানুষের মত হবে, তাই বিয়ে দিয়েছিলুম। তুমি যে এমন 'ফেল' মার্‌বে,—ষাঁড়ের গোবর হবে,তা জান্‌লে কখনও তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতুম না! আগে আমার মেয়ে নিয়ে যাবার উপযুক্ত হও, তারপর তা'কে নিয়ে যাবার কথা ও মুখে এনো!

গৃহিণীও কর্ত্তার স্বরে স্বর মিলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার মেয়ে সে পাড়াগাঁয়ে দেশে গিয়ে ঘর নিকুতে, বাসন মাজ্‌তে পার্‌বে না।"

যুবক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন,—"হাঁ, আমি পাড়াগাঁর লোক বটে ; কিন্তু একদিন এরই পায়ে ধরে কন্যাদান করেছিলেন ; পাঁড়াগাঁর লোকের ঘর কর্‌তে হবে জেনেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।"

অবিনাশবাবুও তদ্রূপ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "অন্যায় করেছিলুম। বিয়ে যদি ফিরিয়ে নেবার হ'ত, ত এখন ফিরিয়ে নিতুম। কি আর বল্‌ব ?—যাও, আর মেলা বোকো না। এখন আমি লীলীকে কিছুতেই পাঠাবো না! তুমি যা কর্‌তে পার, কোরো।

"আচ্ছা বেশ! কিন্তু জান্‌বেন আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত! মেয়েকে সুখী কর্‌তে চেষ্টা কর্ব্বেন।" এই বলিয়া যুবক রাগে ফুলিয়া তিনটা হইয়া হন্ হন্ করিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যুবকের শেষ কথার উত্তরে অবিনাশবাবু বলিলেন, "সে ভাব্‌না, তোমায় ভাব্‌তে হবে না।" কিন্তু সে কথা যুবকের কর্ণগোচর হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। যুবক তখন কক্ষের বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

যুবক চলিয়া যাইলে গৃহিণী বলিলেন, "ছোঁড়ার তেজ দেখ্‌লে একবার! তোমার ওপর রাগ করে গোঁ ভরে ঠক্ ঠকিয়ে চলে গেল!"

অবিনাশবাবু চশ্‌মাটি চক্ষে পরিতে পরিতে বলিলেন, "ও তেজ কতক্ষণের জন্যে!"

যুবক যখন রাগে গন্‌গন্ করিয়া মস্‌মস্ করিয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন সোপানের পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে একটি চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া বালিকা একখানি কচি হাত বাড়াইয়া হাত-ছানি দিয়া ডাকিয়া বলিল, "শোন!"

যুবক মুহূর্ত্তমাত্র চাহিয়া দেখিলেন ; দেখিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া যাইতে লাগিলেন। অবিনাশবাবু ও গৃহিণীর রূঢ় বাক্যে তখন যুবকের অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। তিনি তখন হিতাহিত-বিবেচনায় শক্তিশূন্য। দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে তাঁহাকে জ্ঞান-বুদ্ধি-রহিত করিয়াছিল। যুবক চলিয়া যান দেখিয়া বালিকা দ্রুত বাহির হইয়া যুবকের উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া বলিল, "আমার মাথা খাও, যেও না ; শোন।" যুবক কিন্তু ফিরিয়াও চাহিলেন না। যুবকের উত্তরীয়খানি বালিকার হস্তেই রহিয়া গেল। তিনি অতি-দ্রুতভাবে সোপান অতিক্রম করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

আশ্বিন, ১৩২৪—অক্টোবর, ১৯১৭

প্রতি

বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য কাগজাদি কিরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত। শারদীয়া পূজাও আগত প্রায়। এই সময় আমাদিগকে সকলের প্রাপ্যাংশ প্রদান করিতে হয়। গ্রাহক গ্রাহিকাগণ এই সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগের বার্ষিক সাহায্য প্রদান করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করেন, ইহাই সানুনয় নিবেদন

কার্য্যাধ্যক্ষ

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৴০ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।০ (চারি আনা) মাত্র।
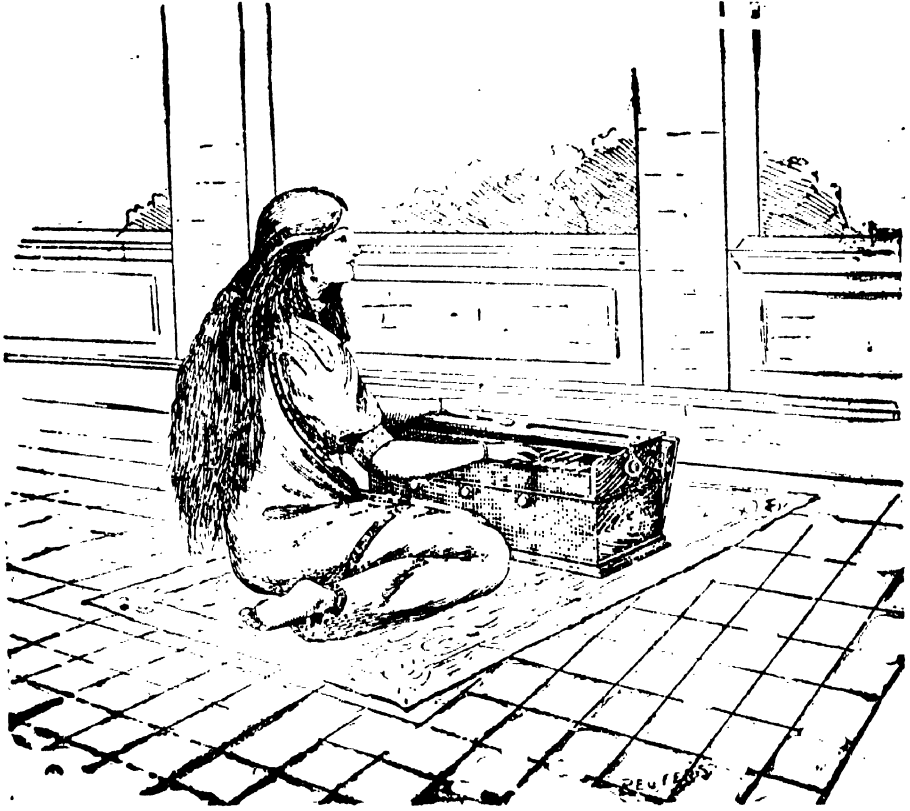
বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 650. October, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫০ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩২৪। অক্টোবর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

লুকিয়ে কেন পাগল কর

ওগো! আমার পাগল-করা!

ধর্‌লে কেন পালিয়ে যাও,

ওগো আমার সকল-ধরা!

এই যে ছিলে, কোথায় গেলে,

এই যে আছ, এই যে নাই;

এই যে থামে বাঁশীর ধ্বনি,

এই যে আবার শুন্‌তে পাই।

এবার এলে ছাড়্‌ব না হে,

ধর্‌ব প্রাণে প্রাণের ধরা;

আবার গেলে সঙ্গ নিব,

ওগো আমার সকল-হরা।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আড়াঠেকা-তালের বোল্।

					৩			
I	ধা	কেটে	তাগ্‌	দিন্।	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্
	এ	ছ •	• •	ন্দ •	আ	০	ড়া •	• ০
	০				২			
	তা	কেটে	তাগ্‌	দিন্।	ধা	ধা	তিন্	তিন্ II
	নি	তা •	• •	স্ব •	বে	যা	ড়া •	• ০

স্বরলিপি।

১ ২´ ৩ ০
{ সা ‖ রা মা মা -া ❘ পমা পা -া মা। জ্ঞা । জ্ঞা পা। মজ্ঞা -া -া রা।
লু কি য়ে কে ০ ন ০ পা ০ গ ০ ০ ল ক র ০ ০ ও

❘ মা পধা ণা ধা ❘ পা মা -া জ্ঞা। -া পা মজ্ঞা -া। রাঃ জ্ঞঃ সা } সা।
গো আ ০ ০ মা র পা ০ ০ ০ গ ল ০ ক রা ০ ধ

১ ২´ ৩ ০
❘ রা রা রা রা ❘ সরা -সমা -া জ্ঞা। -া রা সণ্ -া। ধ্ -া প্ সা।
র্ লে কে ন পা০ ০০ ০ ০ ০ লি ০য়ে ০ যা ০ ও ও

১ ২´ ৩ ০
❘ রা মা মা মা ❘ পা -ধা -ধা -ণা। ণা -র্সা ণর্সর্রা র্সণা। ধপা -মজ্ঞা রসা সা ‖
গো আ মা র স ০ ০ ০ ০ ০ ক০০ ০ল ধ ০ রা ০ ০০ "লু"

১ ২´ ৩ ০
{ মা ‖ মা ণা ধা ণা ❘ ণা র্সা -া ণা। -র্সা র্সা র্সা -া। -া -া -া র্সা।
এ ই যে ছি লে কো থা ০ ০ য় গে লে ০ ০ ০ ০ এ
এ বা র এ লে ছা ড় ০ ০ ব না হে ০ ০ ০ ০ ধ

ণা র্সা র্রা র্সা ❘ র্সা র্সা -া ণা। । র্রা র্সণা -া। ধা পা -া } মা
ই যে আ ছ এ ই ০ যে ০ না ০ই ০ ০ ০ ০ এ
র্ ব প্রা ণে প্রা ণে ০ র ০ ধ ০রা ০ ০ ০ ০ আ

মা মা -া মা ❘ পা মা -া জ্ঞা। জ্ঞা পা মজ্ঞা -া। রা সা -া সা।
ঐ যে ০ ধা মে বাঁ ০ শী র ধ্ব নি ০ ০ ০ ০ এ
বা র ০ গে লে স ০ ড় গ নি ব ০ ০ ০ ০ ও

১ ২´ ৩ ০
রা মা মা মা ❘ পা -ধা -ধা -ণা। ণা -র্সা ণর্সর্রা র্সণা। -ধপা -মজ্ঞা -রসা সা ‖
ই যে আ বা র ০ ০ ০ ত স্তে ০ পা ০ ০ ই ০ ০ ০০ ০০ "লু"
গো আ মা র স ০ ০ ০ ক ল ০ হ ০ ০রা ০ ০ ০০ ০০ "লু"

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাতে গঙ্গাস্নানান্তে পূজোপকরণ-হস্তে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। যাত্রিগণের অশ্রান্ত কোলাহল, ঘণ্টাধ্বনি, পাণ্ডাগণের আশ্বাস-বাণী, দোকানীর সোৎসুক আহ্বান, সাধুগণের মন্ত্রোচ্চারণের সমবেত স্বর চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিতেছিল।

মন্দিরে প্রবেশ-কালে দ্বারে প্রচলিত প্রথানুসারে যৎকিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মা যেন কারাবন্দিনী। লৌহবেষ্টনীর মধ্য হইতে এক একজন মায়ের পবিত্র চরণ-যুগলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ক্ষুদ্রদ্বার-পথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, আবার একজন তাহার স্থল পূর্ণ করিতেছে! অভ্যন্তরে তাড়াহুড়া ও ব্যস্ততা! নিরিবিলি বসিয়া একটু ভাবিবার সুযোগ ঘটে না। পাণ্ডার তাড়নায় হিন্দুতীর্থে কাহারও অবাধগতি নাই। যে উৎকোচ প্রদানে সমর্থ, তাহার ভাগ্যই সুপ্রসন্ন! ভীমদর্শন প্রহরিগণ আবার এই বেষ্টনীর দ্বারদেশেও বেশ দুই পয়সা আদায় করিয়া লইতেছে।

দেখিলাম, মায়ের মূর্ত্তি অত্যন্ত সুন্দর;—আয়তনেও সুবৃহৎ। একটী কর্পূরের প্রদীপ জ্বালিয়া মায়ের সৌন্দর্য্য দেখিলাম। লাবণ্যময়ী মায়ের পদযুগলে সর্ব্বক্ষণ পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। দিব্যালঙ্কার-ভূষিতা জ্যোতির্ম্ময়ী মায়ের নয়ন-যুগল হইতে করুণার ধারা প্রবাহিত হইতেছিল! পাণ্ডাজীর উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করিয়া মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম এবং চরণযুগল স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। আহা, পূজান্তে প্রাণে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম! পাণ্ডাজীকে পূজার মূল্যাদি ও যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদানে সন্তুষ্ট করিলাম। ইহাও ভাল। পাণ্ডার পরিতুষ্টি একটী অপূর্ব্ব ব্যাপার! তাহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে চাহে না; কিন্তু এস্থানে অন্যরূপ প্রত্যক্ষ করিলাম।

পূর্ব্ব রজনীর আহার স্মরণ করিয়া তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া 'ষ্টেসনা'ভিমুখে রওনা হইলাম। রাস্তায় সব অপরিচিত দৃশ্য! শরৎকালের সেই শুভ্র-নীরদখণ্ড-পরিশোভিত সুনীল আকাশ, কুমুদ-কহ্লার-শোভিত সেই সরোবর, হংস-কারণ্ডব-শোভিতা সেই দীর্ঘিকা, বিহগকূজিত ও পুষ্পিত সেই কুঞ্জ, অথবা প্রাবৃড্-জল-প্লাবনে তরঙ্গায়িত শ্যামল প্রান্তর কিছুই নয়ন-গোচর হইল না। বঙ্গ-জননীর সেই স্নিগ্ধমধুর ভাব যেন এ-প্রদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ষ্টেশনের বিস্তীর্ণ বিশ্রামাগারে বহুসংখ্যক লোক বিশ্রাম করিতেছিল;—একটিও ভদ্রলোক বা বাঙ্গালী তথায় দেখিতে পাইলাম না; কেবল জীর্ণবস্ত্র পরিহিত বহুসংখ্যক অশিক্ষিত নরনারী। সকলের সঙ্গেই পথের সম্বল এক একটী বোচ্‌কা।

বেলা ১॥ টার সময় আমরা বিন্ধ্যাচল ছাড়িয়া এলাহাবাদে রওনা হইলাম। আমাদের প্রকোষ্ঠে দুইজন রেল-কর্ম্মচারী ছিলেন; তাঁহারা বেশ শিষ্ট ও বিনয়ী। ইংরেজী ভাষায় আমাদের সঙ্গে তাঁহারা কথোপকথন আরম্ভ

করিলেন। গাড়ী দ্রুতগতিতে চলিল। প্রখর-সৌরকর-তপ্ত বালুকারাশি গতিশীল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধে ঘূর্ণিত হইতেছিল, আর ক্ষণে ক্ষণে উন্মুক্ত গবাক্ষ-দ্বারে সঞ্চিত হইয়া দৃষ্টি প্রতিহত করিতেছিল। অগত্যা স্থান-পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্যের একটী 'বেঞ্চে' গিয়া বসিলাম। চলন্ত গাড়ী হইতে বিন্ধ্যাগিরির দৃশ্য অতিশয় মনোরম! যেন কোনও মহাপুরুষের অভ্যর্থনার জন্য বহুব্যয় ও বহু-পরিশ্রমে পত্র ও পুষ্প-স্তবকাচ্ছাদিত বহুসংখ্যক অত্যুচ্চ বৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে! সৌরকর প্রতিফলিত হওয়ায় পর্ব্বতগাত্র অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! অপর পার্শ্বে স্নিগ্ধ মধুর ছায়া বিরাজমানা; যেন দিবস-রজনী পাশাপাশি যুগপৎ বিদ্যমান। তাহার পর আবার সেই বৃক্ষলতাশূন্য বালুকাময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

আমরা প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যেই এলাহাবাদ-ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। ষ্টেশনে বিচিত্র কোলাহল, আরোহিগণের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ গমনাগমন, অনাবশ্যক ব্যস্ততা, বাক্স-প্যাট্‌রার ছড়াছড়ি, ময়রার দোকানে ক্রেতার ভিড়, ঘোড়ার গাড়ী ও একা গাড়ী ইত্যাদি দেখিয়া হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল! কি এক গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ শান্তিময় রাজ্য অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি! তথায় ব্যস্ততা নাই; গা ঢালিয়া বসিয়া থাক,—কোনও উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার কারণ নাই!

তিন দিবস পূর্ব্বে এলাহাবাদের এক বন্ধুর নিকট আমার সম্ভাবিত আগমন জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়াই আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এলাহাবাদে অবস্থান-কালে বন্ধুবরের সংসর্গে যে কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার আন্তরিক সৌজন্য ও উদারতার কথা মনে হইলে প্রাণ-মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া যায়!

এলাহাবাদ।

গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এলাহাবাদ-সহরটী অতিমনোহর। এ-স্থানের রাজপথে জনতা নাই, কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই;—যেন এস্থানে চিরশান্তি বিরাজমান। দূরে দূরে বৃহৎ অট্টালিকারাজি স্ব স্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! পুরোভাগে তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল প্রাঙ্গণ! মধ্যে মধ্যে পল্লবিত-শাখা-সমলঙ্কৃতা বিটপিশ্রেণী পুষ্প-ভারাবনম্রা হইয়া সৌন্দর্য্যসম্পদ্‌ বিকাশ করিতেছে। রাজ-পথের দুইপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ নিম্ব-বৃক্ষ নিবিড়-পত্ররাশি-বিভূষিতা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সুশীতল-ছায়াদানে ক্লান্ত পথিকের শ্রমাপনোদন করিতেছে। এ স্থানের সরকারী বিদ্যালয় (কলেজ), বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, বিচারালয়, সকলই সুন্দর ও অতিসুকৌশলে নির্ম্মিত; যেন এক একটী রাজ-প্রাসাদ! চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত ময়দান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! স্থানের অভাব নাই; বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব নাই। সাধারণের ভ্রমণোদ্যান অতিবিস্তীর্ণ; মধ্যভাগে ভারতেশ্বরী স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রস্তরমূর্ত্তি; চারিদিকে পুষ্পিত কুসুমোদ্যান। এ-স্থানে বসিয়া থাকিলে প্রাণের সমস্ত বেদনা, দেহের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয়। সুপ্রশস্ত রাস্তা উদ্যানের মধ্য দিয়া সর্প-গতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একটি কুঞ্জ;—

কোথাও বা সারি সারি উন্নতশীর্ষ বৃক্ষরাজি ঘনসন্নিবিষ্ট।

পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইয়াছিলাম; এতাদৃশ বিচিত্র সঙ্গম কল্পনায়ও সম্ভবে না: গঙ্গা বেগবতী ও উদ্দাম এবং যমুনা ধীর, গম্ভীর ও প্রশান্ত। খরস্রোতাঃ গঙ্গার জল পঙ্কিল, আর উদার যমুনা স্বচ্ছ-সলিলা ও ঊর্ম্মিমালা-বিভূষিতা। তাহাতে সুনীল আকাশ প্রতিফলিত হওয়ায় পরমরমণীয়া শোভা! এ স্থানেও সেই পাণ্ডার উপদ্রব। দোকান সাজাইয়া তাহারা বসিয়া আছে; পরস্পরে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঘাটে যাইবামাত্রই সকলে ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া একেবারে আগন্তুককে ব্যতিব্যস্ত করে। একখানি নৌকা-যোগে সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলাম। স্নানার্থীর সংখ্যা সর্ব্বদাই খুব বেশী। দরিদ্রবালকগণ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া গঙ্গায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটি পয়সা নিক্ষেপ করিবামাত্র স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তাহারা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতেছে। তাহাদের অধ্যবসায় সমধিক প্রশংসনীয়। সঙ্গমস্থলের উপকণ্ঠে একটী বালুকাময় বিস্তীর্ণ সমভূমি; তথায় কুম্ভমেলার অধিবেশন হইয়া থাকে।

গঙ্গার তীরে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম। জটাজূটধারী একজন সন্ন্যাসী কণ্টক-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, তিনি বহুকাল ধরিয়া এ-স্থানে কঠোর-তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত।

অদূরে মহাত্মা আকবরের নির্ম্মিত সুদৃঢ় এলাহাবাদ-দুর্গ। স্নানান্তে দুর্গাভ্যন্তরস্থ অক্ষয়বট দেখিতে গিয়াছিলাম। দুর্গদ্বারের অনতিদূরবর্ত্তিনী সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া একটী অন্ধকারময় গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। পুনঃ পুনঃ দীপ-শলাকা প্রজ্জ্বলিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। গন্তব্য-পথের উভয় পার্শ্বে অগণিত প্রস্তরময় দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। বহুনিম্নে অক্ষয়বট। গহ্বরাভ্যন্তরে কদাপি সৌরকর বা বায়ু প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। এই অক্ষয়বট দর্শনের জন্য বহুদূর হইতে প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী দুর্গদ্বারে সমবেত হইতেছে! কিংবদন্তী আছে, এই অক্ষয়বট-প্রদক্ষিণান্তে তন্নিকটবর্ত্তী কাম্যকূপে যে যে-কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, পরজন্মে তাহার সেই কাম্যবস্তু লাভ হইবে। বনগমন-সময়ে সীতাদেবী এই অক্ষয়বট প্রদক্ষিণ করিয়া রাজ্ঞী কৌশল্যার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন। কাম্যকূপের কোনও-রূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। অক্ষয়বট জীর্ণ শীর্ণ বহুপ্রাচীন শাখা-সমন্বিত বটবৃক্ষ নহে। ইহা নাতিদীর্ঘ নাতিবৃহৎ দুইটী কাণ্ডমাত্র; কাণ্ডের শাখা নাই, উপশাখা নাই, পল্লব নাই। কাণ্ড-দুইটী সম্পূর্ণ সজীব ও তাহাদের গাত্রের ত্বক্ কোমল ও মসৃণ। পাণ্ডাগণ স্বার্থ লাভের আশায় কাণ্ডগাত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখে। গহ্বরাভ্যন্তরে সর্ব্বদা অন্ধকার; দেখিবার সুবিধার জন্য কোনও প্রকার আলোকের বন্দোবস্ত নাই। কাণ্ডদ্বয়ের অগ্রভাগ যেন কর্ত্তিত। প্রত্যেক কাণ্ডের পরিধি অনুমান তিন ফিটের অধিক হইবে না; এবং উচ্চতা আট ফিটের অধিক হইবে না। এ ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না। জানি না,

এই সার্থকনামা পবিত্র বৃক্ষ কোন্ অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে অতীতের পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া এতাদৃশ অভিনব মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যধামে বিরাজ করিতেছেন।

গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অদূরেই সুরক্ষিত অশোকস্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। অত্যুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের গাত্রে অদ্যাপি পালি-ভাষায় লিখিত অনুশাসনপত্র সুস্পষ্ট রহিয়াছে। মসৃণ স্তম্ভটী সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছিল; যেন বহুমূল্য-মণিমুক্তা-খচিত একটী আধুনিক মন্দির। মগধরাজ অশোক দুই-সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই স্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; তাহার পর কালচক্রে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু এই সুদৃঢ় স্তম্ভ অক্ষুণ্ণভাবে স্থাপয়িতার কীর্ত্তি-গরিমা গাহিয়া আসিতেছে! ইহা প্রাচীন-ভারতের স্থপতি-বিদ্যার একটী উজ্জ্বল নিদর্শন।

বিস্তীর্ণ স্থানটী বহির্জ্জগতের সঙ্গে সমুদয় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নিতান্ত সংযতভাবে আত্ম-গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। মহাত্মা জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের স্মৃতি-রক্ষার্থ যে অনুপম সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, বহু অর্থ ব্যয়ে স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে শ্রম ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন রাখিয়াছেন, তাহা কল্পনাতীত!—সমাধি-মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য্য-মহিমা বিস্ময়কর। খসরুর সমাধির অদূরেই তাঁহার মাতৃদেবীর সমাধিস্থান। স্নেহময়ী জননী অপত্য-স্নেহ বিস্মৃত হইতে অক্ষম হইয়াই, বুঝি, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া চির-নিদ্রায় অভিভূতা! কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু এ নিদ্রার আর অবসান নাই! স্থানটীর গাম্ভীর্য্য এবং মন্দির-দ্বয়ের বিশাল অবয়ব পরোক্ষে মহাত্মা সেলিমের হৃদয়ের গভীরতার

খসরু বাগ্।

রেলষ্টেশনের সমীপে সহরের প্রান্তভাগে খসরুবাগ্। দুর্ভেদ্য-প্রস্তরপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত পরিচয় দিতেছিল। বিস্তীর্ণ বাগের মধ্যে মধ্যে তাৎকালীন স্থবির জীর্ণ-শীর্ণ বিটপি-

শ্রেণী দর্শকের মনে অতীতের পুণ্যস্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে! আর স্থানে স্থানে আধুনিক-রুচিসম্পৃক্ত সযত্ন-পোষিত অর্কেড, ক্রোটন প্রভৃতি তরুরাজি অতীতের সহিত বর্ত্তমানের অলঙ্ঘ্য সীমান্ত-রেখা স্পষ্টতর করিয়া দিতেছে! অতীত ম্লান হইয়া চলিয়া পড়িতেছে, আর বর্ত্তমান খুব সুস্পষ্ট কিন্তু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। বহুদিন হয়, মোগল-গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। কালের অবিশ্রান্ত গতিতে কীর্ত্তি-কাহিনী সব লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, মহাত্মা জাহাঙ্গীর পত্নীপ্রেম ও অপত্য-স্নেহের জলন্ত আদর্শকে অতিসযত্নে দুর্ভেদ্য প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালের মাহাত্ম্যে ইহাদের ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী।

এলাহাবাদে যে কয়দিন অবস্থান করিয়াছিলাম তাহা বড়ই সুখের প্রবাস। নিত্য নূতন ভোজনের আড়ম্বর; ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত; গল্প তামাসায় সঙ্গীর অভাব নাই; সবই যেন আপন! হঠাৎ মনে হইল, এত আরামে তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কঠোরতার মধ্য দিয়া যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহাই স্থায়ী।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উপাসনা।

নিশান্তে দিনান্তে শুধু নহে ভগবান্!
আমি চাহি প্রতিক্ষণে মোর সারা প্রাণ
তোমারি চরণপ্রান্তে একান্তে বসিয়া
পীযূষ-সাগর মাঝে রহুক্ ডুবিয়া,
নিরখি তোমার ওই করুণা-কোমল
প্রশান্ত আনন পানে! হৃদি-শতদল
ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে মধু-গন্ধ-রূপে
তোমারি মাধুরী শুধু প্রতি-মর্ম্মকূপে
অতর্কিতে লভি নাথ, তোমারি ধরায়
আনন্দে গৌরবে কিবা অর্চ্চিতে তোমায়
উঠিবে গো বিকশিয়া! প্রতিক্ষণ মম
এমনি করিয়া নিত্য সত্য প্রিয়তম!
পূর্ণ হবে ধন্য হবে তোমারি সত্তায়
জন্ম-জন্মান্তের লাগি ভুলি আপনায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৭)

নমিতা দ্রুতপদে সকলের আগে চলিতে লাগিল। যন্ত্রণায় উৎকণ্ঠায় তাহার সমস্ত মুখখানা ক্লিষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তার উপর অত্যন্ত বেগে চলার জন্য চর্ম্মবিদ্ধ কুশটা নাড়াচাড়া পাইয়া ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল। কিন্তু সহিষ্ণু নমিতার ধৈর্য্যের মাত্রাটা চিরদিনই সাধারণ সীমার ঊর্দ্ধে।—সুদৃঢ়-কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের কঠিন ও বক্র রেখায় নীরব আত্মদমন-চেষ্টার

উৎকট আবেগ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু তাহার আচরণে এতটুকুও ক্লান্তি বা কাতরতার চিহ্ন ছিল না। সে যেন নিতান্তই অবহেলার সহিত আপনাকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল! রাস্তার লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার হাতের দিকে ও মুখের পানে চাহিতেছিল, কিন্তু নমিতার কোন দিকেই দৃক্‌পাত ছিল না।

নমিতার চরণগতি অত্যন্তই প্রখর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, পিছন হইতে অগ্রসর হইয়া সুরসুন্দর নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আস্তে ম্যাডাম্‌, আস্তে ;—অত তাড়াতাড়ি চল্‌বেন না ; বেশী রক্ত পড়্‌বে, আপ্‌নার আরো কষ্ট হবে !—"

"কষ্ট !—" বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ নমিতা ব্যাকুলভাবে বলিল, "বাস্তবিকই বড় কষ্ট হচ্ছে ! এক ত নিজের সময় নষ্ট হোল, তার উপর আপ্‌নাকে শুদ্ধ নিতান্ত অন্যায় ভাবে জব্দ কর্‌ছি।...শুনুন্ ; কিছু মনে কর্‌বেন না ; আমার অনুরোধটি রাখুন ; আপনি হাঁসপাতাল যান। সবাই মিলে কামাই কর্‌লে সেখানেও যে কাজের গোলযোগ হবে।...... না না, আপনি যান।"

সুরসুন্দর হাসিল। সুপ্তোত্থিত মানুষ যেমন করিয়া ঘুম চোখ্ রগ্‌ড়াইয়া দৃষ্টি পরিষ্কার করে, সুরসুন্দরও তেমনি ভাবে চোখ্ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে শান্ত হাস্যরঞ্জিত বদনে বলিল, "নিতান্ত ছেলেমানুষের কথা : লোকের অভাবে সেখানকার কাজ অচল হবে না, তবে কিছু অসুবিধে......। তা আর কি করা যাবে ? ওরা যা হোক্ করে চালিয়ে নেবে। কম্পাউণ্ডাররা তেমন লোক নয়। বিশেষ আমার জন্যে......।"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "কিন্তু উপর-ওয়ালারা ?—না না, কেন আর আমার জন্যে অনর্থক মিছে অপমানিত হবেন ? আপ্‌নি জান্‌ছেন না, সে আমার বড় মনস্তাপ হবে ! —আপনাকে অনুনয় করি—।"

ধীর গম্ভীর ভাবে সুরসুন্দর বলিল, "আপনাকে স্মিথের কুঠিতে না পৌঁছে দিয়ে আমি কোথাও যেতে পার্ব্বো না। ক্ষমা কর্‌বেন্।"

সে স্বর তর্কের নয়, প্রতিবাদের নয়, শুধু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ! নমিতা ফাঁফরে পড়িল ! অন্য দিন হইলে, সে এইখানেই থামিয়া যাইত, কিন্তু আজ তাহার সেই স্বাভাবিক শান্ত গাম্ভীর্য্যটুকু আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। উৎক্ষিপ্ত মনের তিক্তবিস্বাদ জ্বালা সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সহসা অস্বাভাবিক ঝাঁঝের সহিত সে কলহের সুরে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নার সাহায্য কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে সাহায্য গ্রহণের অধিকার আমার আছে কি না...।" কথাটা নমিতা শেষ করিতে পারিল না ; নিজের কণ্ঠের স্বর নিজের কানেই অত্যন্ত বিকট উগ্র ঠেকিল ; থতমত খাইয়া হঠাৎ থামিয়া মূঢ়ের মত নিরর্থক দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষণেক নীরব রহিল, এবং তারপর নম্রভাবে বলিল, "সাহায্যের যা দরকার ছিল, তা পেয়েছি ; আর কেন কষ্ট কর্‌বেন ?"

সুরসুন্দর কিছু বলিল না ; নিঃশব্দে আহত করুণ দৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে ক্ষুব্ধ মনস্তাপব্যঞ্জক ক্ষীণ

হাসি হাসিয়া, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপ্‌নিও তাই মনে করেন?—শুধু ছিব্‌লেমী করে বাহাদুরী দেখাতেই আমি সুযোগ খুঁজে বেড়াই? ভাল, আমি অকাতরে সব সয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, আপনারা যে যা পারেন, মনে করুন্। এখন, কেন আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট কর্‌ছেন? চলুন্ স্মিথের কুঠিতে—।"

নমিতার মতামত জানিবার জন্য এতটুকুও অপেক্ষা না করিয়া সুরসুন্দর এবার নিজেই অগ্রসর হইল। হতবুদ্ধি নমিতা তীব্রলজ্জার সহিত একটা নিষ্ঠুর বেদনা অনুভব করিল; নিজের উপর রাগের চেয়ে ঘৃণাটাই বেশী জাগিয়া উঠিল। ছিঃ! যেখানে আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় সসম্মানে মাথা নোয়াইয়া চলা উচিত, সেখানে সে কি না নির্দ্দয় ঔদ্ধত্যে দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়াছে? কি বুদ্ধির ভুল!..

অনুতপ্তা নমিতা অস্ফুট স্বরে হেঁট-মুখে বলিল, "দেখুন্, আমি বড় অন্যায় করেছি; কিছু মনে কর্‌বেন না। সংসারে নানা-রকম লোকের নানা অসদ্ব্যবহারে অনেক সময় শান্তসহিষ্ণু মানুষের মনের মধ্যে বিক্ষিপ্তির গোলমাল বেধে যায়। আমারও তাই সেই দুরবস্থা হয়েছে......। আপ্‌নার কাছে ক্ষমা চাইছি; কি বল্‌তে কি বলেছি!"

সুরসুন্দর চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া চাহিল; বিস্মিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কই? আপনি ত এমন কিছু বলেন নি। না না, ওতে মনে কর্‌বার কিছু নাই। তবে আমার একটু আশ্চর্য্য ঠেকেছিল। বোধ হোল, আপনি একটু বিরক্ত হয়েছেন। তাই জন্যে?...না, ম্যাডাম না, সে আমারই বোঝ্‌বার ভুল। আপ্‌নি কিছু মনে কর্‌বেন না—দেখুন—।"

দৃঢ়স্বরে পুনরায় সুরসুন্দর বলিল," দেখুন আপ্‌নাকে আর কেউ চিনুক্ আর না চিনুক্, আমি চিনেছি। আপনার সম্বন্ধে কোন দ্বিধা আমি মনে স্থান দিতে পার্‌ব না, এটা নিশ্চয় জান্‌বেন।" এই বলিয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল।

একমুহূর্ত্তে নমিতার মনের সমস্ত জটিলতা পরিষ্কার হইয়া গেল। পিছন পানে চাহিয়া ডান হাত বাড়াইয়া দিয়া প্রসন্নমুখে সে বলিল, "ওরে সুশীল, পাশে আয়।"

সুশীল তখন বিস্ময়ে উৎসুক দৃষ্টিতে বাঁ-দিকের গলির দিকে চাহিতে চাহিতে অত্যন্ত মন্থর গমনে আসিতেছিল। নমিতার আহ্বান শুনিয়া সে ভীতভাবে গলির দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলিল, "ঐ যে উনি ওখানে—।"

চকিত নয়নে গলির দিকে চাহিয়া বিস্ময়-মিশ্রিত বিরক্তি-ঘৃণার সহিত নমিতা বলিল, "ডাক্তার মিত্র?"

সুরসুন্দর কথা কহিতে কহিতে সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে গলির সীমা এড়াইয়া গিয়াছিল; এইবার নমিতার কথায় চমকিয়া পিছু হটিয়া ঝুঁকিয়া গলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, একটা বাড়ীর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঁচু চৌকাটের উপর পা তুলিয়া, জানুর উপর হাতের ভর রাখিয়া, সাম্‌নে ঝুঁকিয়া ডাক্তার মিত্র গভীর মনোযোগের সহিত 'নোট বুকে'র পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে আড়্‌চোখে

তাহাদের দিকে চাহিতেছেন। গলির মধ্যে দ্বিতীয় প্রাণী কেহ নাই।

তিনি কি উদ্দেশ্যে এমন সময় এখানে ওরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া 'নোটবুক' লইয়া খেলা করিতে করিতে কোন্ বস্তুর উপর যে গুপ্ত লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎবেগে নমিতা ও সুরসুন্দরের মনের উপর ঝলসিয়া গেল। সুরসুন্দর সরিয়া দাঁড়াইল; অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সযত্নে একটা উচ্ছ্বসিত বেদনা-ভরা নিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া, শুষ্ক ম্লান মুখে বলিল, "আসুন! আর কেন?—"

নমিতা কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না। কে যেন সুদৃঢ় নিষ্পেষণে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়াছিল। আরক্ত মুখে আত্মদমন করিয়া নিঃশব্দে পা বাড়াইয়া সে অগ্রসর হইল। খানিক পরে তীব্র আক্ষেপ-সূচক কণ্ঠে সে বলিল, "মানুষের মাথার গড়ন যতই প্রশস্ত-বুদ্ধির পরিচায়ক, সুশ্রী ও সুন্দর হোক্, কিন্তু তার হৃদয়ের গঠন যদি সঙ্কীর্ণতা ও নীচতার পরিচায়ক কুৎসিত হয়, তবে সে হাত-পায়ের খাটুনীর জোরে যত বড়ই 'বীর' হোক্, আসলে কিন্তু মনুষ্য-নামের যোগ্য কখনই নয়;-তা হ'তেই পারে না!"

দুঃশীল পুত্রের আচরণে মর্ম্মাহত পিতার ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে যেরূপ বিষণ্ণ করুণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠে, সুরসুন্দরের নয়নেও ঠিক্ সেই ভাব ফুটিয়া উঠিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "একটা পাগলের পাগ্লামীর দিকে হর্দম চোখ রেখে বসে থাক্লে, অতি-বড় সুস্থ মানুষেরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। কেন ও-সব তুচ্ছ ব্যাপারে চোখ্ দিয়ে মানসিক অশান্তির সৃষ্টি কর্‌ছেন?......যার যা খুসী বলুন বা করুন; আমি আমার লক্ষ্য ভুল্‌ব না; এইটেই মানুষের উচিত দৃঢ়তা, এইটের উপর নির্ভর রেখে আমরা নীরব সংযমে কর্ত্তব্য পালন করে যাব। ফলাফলের মালিক তিনি! হোঁচোট ধাক্কা সে চলবার পথে অপরিহার্য্য। কিন্তু তাই বলে ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে নিরাপদ্ হতে পারি নে, কিংবা স্পর্শ-ভীরু 'কেন্নো'র মত আপনাকে গুটিয়ে, আড়ষ্ট নির্জ্জীবভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে একপাশে শুয়ে থাক্‌তে পারি নে!—আমরা মানুষ, আমাদের সংসারে ঢের কাজ আছে; আপদ্-বিপদের সঙ্গে আক্‌সার যুঝে চলা'র নামই আমাদের জীবন-গতি। এর মধ্যে আলস্যের স্থান নেই, অবসন্নতার স্থান নেই। তা হ'লেই দুনিয়ার মধ্যে টেকে থাকা দায়।......চলুন।" সুরসুন্দর পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে নমিতাকে অগ্রবর্ত্তিনী হইতে ইঙ্গিত করিল।-

সঙ্কেত-চালিত কলের পুতুলের মত নমিতা নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। সুশীল তাহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। সমস্ত পথ কেহ কোনও কথা কহিল না। সুশীল ব্যাপার কিছু ভাল না বুঝিতে পারিলেও, কোন একটা অপ্রীতিকর-রহস্য-সংসৃষ্ট গূঢ় অপমানের আঘাত স্পষ্টই বুঝিল; ভ্যাবাচাকা খাইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। দিদিকে সহজে ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় না; সুতরাং, আজিকার এই উত্তেজনাটা তাহার কাছে অত্যন্তই ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতেছিল।

শীঘ্রই তাহারা স্মিথের কুঠিতে আসিয়া পৌঁছিল। স্মিথ্ সেইমাত্র একটা 'কল' হইতে আসিয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাহাদের সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে আসিয়া তিনি তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নমিতার হাতের অবস্থা দেখিয়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে ক্রুশ-বিভ্রাটের সব বিবরণ জানিয়া লইয়া, অসাবধানতার জন্য একটু স্নেহ-কোমল ভৎ র্সনা করিয়া, তখনই মিসেস্ স্মিথ্ বেহারাকে ডাকিয়া, তাহাকে গরম জল আনিতে বলিলেন। তিনি সুরসুন্দরকে বলিলেন, "তেওয়ারী, ভাগ্যিশ, রাস্তায় তোমায় পাওয়া গিয়েছিল! বুদ্ধি করে এখান পর্য্যন্ত এসে তুমি ভালই করেছ; বুঝ্‌তেই পারছ, একটু সাহায্যের দরকার হবে। তোমরা বস, আমি 'পকেট কেস'টা নিয়ে আসি।....হাঁ, ছোট মিত্রও এসে পড়েছ, বটে! এস এস, আমার কুকুরছানাগুলোর খবরটা একবার জেনে আস্‌বে চল।"

সুশীল দুশ্চিন্তা-গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আগে দিদির হাতটা—!"

স্মিথ্ নমিতার মুখপানে অর্থসূচক কটাক্ষপাত করিয়া হাসিলেন। নমিতা বুঝিল, তাহার 'হাতটার' জন্যই স্নেহময়ী স্মিথ্ বালক সুশীলকে এখান হইতে সরাইতে ইচ্ছুক। তৎক্ষণাৎ নমিতা আদর করিয়া সুশীলের পিঠে হাত দিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিল, "যা না, ভাই! কুকুরগুলো দেখে আয়। উনি বলছেন......।"

স্মিথ্ ব্যগ্রতার সহিত সুশীলের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন, এবং খুব আগ্রহের সহিত বুঝাইয়া দিলেন যে, সুশীলের হাতে কয়দিন বিস্কুট খাইতে না পাইয়া, তাহার কুকুরগুলা অত্যন্ত মনমরা হইয়া রহিয়াছে। সকলের চেয়ে ছোট বাচ্চাটি প্রতিদিন বৈকালে সুশীলের জন্য কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিয়া হাট বসায়। অন্যান্য সকলেও তাহার বিরহে অত্যন্ত কাতর।......সুতরাং, আজ সুশীলকে দেখিতে পাইলে তাহারা নিশ্চয়ই খুব স্ফূর্ত্তি-প্রফুল্ল হইবে। ইত্যাদি।

ছেলে ভুলাইবার জন্য ছেলেমানুষের মত স্মিথ্-মহোদয়াকে এমন সরস-বাক্য-বিন্যাস-কৌশল প্রায়ই ব্যবহার করিতে হয়। এত দুঃখেও নমিতার বেশ একটু স্নিগ্ধ কৌতুক বোধ হইল। সে মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সুরসুন্দর চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে গম্ভীরমুখে তাঁহাদের গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে, গরম জল লইয়া বেহারার সহিত স্মিথ্ ঘরে ঢুকিলেন। এবার তাহার মুখভাব অত্যন্ত বিরক্তি-গম্ভীর। নমিতা আশ্চর্য্যান্বিতা হইল: কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

ছুরির ফলা খুলিয়া আলোর কাছে পরীক্ষা করিতে করিতে স্মিথ্ যেন জোর করিয়া মুখে একটু প্রসন্ন হাসি ফুটাইয়া পরিহাস-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "আঃ, আমার এই স্নেহাস্পদ চঞ্চল শিশুগুলির হাত-পা কি দুরন্ত দেখ ত! সুন্দর, আমার মাথা খুঁড়তে ইচ্ছা হয়! সে-দিন সমুদ্র প্রসাদ কম্পাউণ্ডার হাঁসপাতালে কোনও সহযোগীর সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে স্ফূর্ত্তির ঝোঁকে একটা বার আউন্স শিশি ভেঙ্গে, প্রকাণ্ড কাঁচ হাতের তালুতে বিঁধে এসে হাজির! রক্তারক্তি

কাণ্ড! আবার আজ এঁর দেখ! সূঁচালো লোহার ক্রুশটার ওপর এমন উৎকট মমতা যে, ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যে সেটাকে হাতের মধ্যে ফুঁড়ে, তবে নিশ্চিন্দি। ......নমি, মনটা একটু শক্ত কর। সুন্দর, হাতটা চেপে ধর, যেন নড়ে না, দেখো—।"

স্মিথ্ ছুরি হাতে লইয়া অগ্রসর হইলেন। নমিতা ডান কাঁধের উপর মুখ ফিরাইয়া চক্ষু বুজিল। সুরসুন্দর পাশে দাঁড়াইয়া স্মিথের নির্দ্দেশ অনুসারে হাতটা শক্ত করিয়া জোরে চাপিয়া ধরিল। স্মিথ কর্ কর্-শব্দে কাঁচা মাংস কাটিয়া ক্রুশটা তুলিয়া ফেলিয়া, ক্ষিপ্র ও লঘু হস্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। নমিতার সর্ব্বাঙ্গে যেন কালঘাম ছুটিতেছিল। যন্ত্রণায় আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; অতিকষ্টে সে সংযত হইয়া রহিল।

স্মিথ্ ক্রুশটা পরিষ্কার করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার অসাবধানতার দণ্ডস্বরূপ এই ক্রুশটি তোমার হাত থেকে চিরদিনের জন্য কেড়ে নেওয়া আমার উচিত। কি বল নমি?"

নমিতা একটু হাসিল। সুরসুন্দর হা ধুইয়া আসিয়া স্মিথ্‌কে বলিল, "আমি তা হ'লে এবার যেতে পারি? হাঁসপাতালে অনেক কাজ রয়েছে।"

নমিতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকেও যেতে হবে—

ভ্রূভঙ্গী করিয়া স্মিথ্ বলিলেন, "তুমি—? তুমি যাবে কি? তোমার হাতে ক্ষত।"

নমিতা সবিনয়ে বলিল, "আমার ডিউটীর ভার—।"

স্মিথ্ বলিলেন, "সে অপরে বুঝ্‌বে; আমি বুঝ্‌বো!—তুমি স্মরণ রেখো, তুমি এখন আমার চিকিৎসাধীন রোগী! আমার অনুমতি অনুসারে তোমায় চল্‌তে হবে। তোমার হাতের এমন ক্ষত নিয়ে, আমি এখন সাত দিন তোমায় রোগিনিবাসের কাজে যেতে দিতে পার্ব্বো না!—"

নমিতা বিপন্নভাবে বলিল, "তবু একবার নিজে গিয়ে জানিয়ে আসা উচিত নয় কি?"

স্মিথ্ বলিলেন, "তুমি এই সোফায় চুপ করে শুয়ে থাক। আমি হাঁসপাতাল যাচ্ছি; সব ব্যবস্থা ঠিক্ করে আস্‌বো। আর সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা বল্‌ছ? আমি আছি, সুন্দর কম্পাউণ্ডার আছে;.........আর তা ছাড়া ডাক্তার মিত্রও ত রাস্তা থেকে বিশেষ রকমে দেখে গেছেন; সেটুকু ত অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না!"

নমিতা চমকিয়া উঠিল; বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে একবার সুরসুন্দরের পানে ও একবার স্মিথের পানে তাকাইল। ইহার মধ্যে স্মিথের নিকট এ সংবাদটি যে কে পৌঁছাইয়া দিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে নমিতার বড় গোলমাল ঠেকিল! সুরসুন্দর ত আসিয়া অবধি চুপ্-চাপ্ কাজ করিতেছে! সে ত বলিবার সময় পায় নাই। তবে? তবে বুঝি বাঁদর সুশীলই চক্ষুর অন্তরালে গিয়া এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছে? নিশ্চয়ই তাই!......কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে নমিতা বলিল, "আপনাকে সুশীল বল্‌লে, বুঝি?"

চক্ষু হইতে চশ্‌মা খুলিয়া কাঁচ পরিষ্কার করিতে করিতে স্মিথ্ বলিলেন, "হাঁ, তুমি আমার কাছ থেকে অনেক কথা এড়িয়ে যেতে চাও, নমি, কিন্তু আমি প্রায়ই সব খবর

পাই। সুশীল ছেলেমানুষ, অত শত বোঝে না; দুঃখের উচ্ছ্বাসে এমনই সকরুণভাবে কথাগুলি আমায় বল্লে, যে বাস্তবিকই আমার মনে বড় আঘাত লাগ্‌ল! ছিঃ, রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষ হয়ে, মানুষের উপর কি এমনই নির্দ্দয় আচরণ করতে হয়? ....আজ এই স্থলে এমন জঘন্য বিদ্বেষপরায়ণ যারা, তারা লোকালয়ে বাস কর্‌বার উপযুক্ত নয়! হিংস্র বাঘ-ভাল্লুকের আড্ডায় বন-জঙ্গলে বিচরণ করাই তাঁদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা!"

স্মিথের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের শ্লেষতীব্র ভৎসনা কক্ষ-গাত্রে সজোরে আহত হইয়া দৃপ্ত-প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিল। নমিতা নির্ব্বাক্! সুরসুন্দর অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া মৌন ম্লান মুখে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতেও নমিতার ভয় হইল! এই তুচ্ছ ঘটনার সহিত তাহার সংস্রবটা কিরূপ অশোভন ভাবে জড়াইয়া, একটা লজ্জাদায়ক ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা মনে করিতেও নমিতার আক্ষেপ বোধ হইল! কুক্ষণে সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার মুহূর্ত্তে সুরসুন্দর আসিয়াই তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল। সেই অপরাধে ডাক্তার মিত্রের নিকট হইতে অবশ্যপ্রাপ্য সাহায্য-লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব ত হইলই; তাহা উপর, তাঁহার সেই ভদ্রজনবিগর্হিত অশিষ্ট ব্যবহার, সেই গুপ্ত বিদ্রূপপূর্ণ ক্রূর কটাক্ষ, সেই ছলনাময় অপমান, তাহাও নমিতাকে অকারণে সহিতে হইল! আর নিজের দিক্ হইতে ছাড়িয়া দিয়া, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেও, ইহা সে অবশ্য বলিতে বাধ্য যে, ভদ্রসন্তানের ঐ অভদ্রতাটুকু—ভদ্রপদবাচ্য প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটই মর্ম্মদাহী ও অপমানজনক। অন্ততঃ যাঁহাদের হৃদয়-মনে এতটুকুও চেতনার সাড়া আছে, তাঁহারা নিশ্চতই ইহা মানিতে বাধ্য

স্মিথ্ চোখে চশ্‌মা পরিয়া নিকটস্থ চেয়ারটার উপর বসিলেন। দুইহাতের মধ্যে চিবুক রাখিয়া গম্ভীরভাবে ক্ষণেক কি ভাবিলেন; তারপর উত্তেজিতভাবে মুখ তুলিয়া সুরসুন্দরের পানে চাহিয়া দৃপ্ততেজস্বীস্বরে বলিলেন, "দ্যাখো সুন্দর, তোমায় একটি কথা বলে রাখ্‌ছি বাবা! জীবনে আর যাই হও, তাই হও,—মনুষ্যত্বটুকু হারিও না! সংসারে ধনবান্ সবাই হয় না, বিদ্বান্ সবাই হয় না, বুদ্ধিও সকলের সমান প্রখর হয় না,- কিন্তু প্রাণ যার আছে, সে যেন প্রাণবত্তা না ভুলে যায়, এইটুকু আমার অনুরোধ! এখানে যার যেমন খুসী, সে সেই রাস্তায় মনোবৃত্তি চালিয়ে নিজের ইচ্ছায় বাঁদর সাজুক, কুকুর সাজুক, উল্লুক সাজুক, ভাল্লুক সাজুক, কিন্তু তোমরা—অন্ততঃ তুমি একজনও, বাইরে যে অবস্থায়ই থাক, এ পশু-রাজত্বের মধ্যে নিজের অন্তরে সিংহ হয়ে দাঁড়াবার শক্তিটুকু হারিও না!"

এইবার স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান সুরসুন্দরের দুই চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু খসিয়া পড়িল! সে কোনও কথা কহিতে পারিল না; হেঁট হইয়া স্মিথের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল। স্মিথ্ হাঁটুর উপর হইতে তাঁহার দুই হস্ত তুলিয়া সুন্দরের মস্তকের উপর রাখিলেন। সুরসুন্দর উদ্বেলিত চিত্তোচ্ছ্বাসে সবেগে উদ্গত অশ্রুস্রোত নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টায় দুই হাতে সজোরে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এই সুমহান্ আশীর্ব্বাদ আজ জীবনে প্রথম আপ্নার কাছে পেলুম্; এর আগে আর কখনো একথা কারো মুখে শুনি নি!"

স্মিথ্ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন; অশ্রুসিক্ত নয়নে মুগ্ধ অভিভূত ভাবে কয় মুহূর্ত্ত স্তব্ধ নিস্পন্দ থাকিয়া, তারপর ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লইলেন। গভীর স্নেহের সহিত সুরসুন্দরের চিবুক স্পর্শ করিয়া নিঃশব্দে অঙ্গুলে চুমা খাইলেন; কোনও কথা বলিতে পারিলেন না।

সুরসুন্দর মাথা তুলিল; তাহার চোখে তখনও অশ্রু টল্‌টল্ করিতেছিল। সে আর দাঁড়াইল না; শ্রদ্ধানম্র নমস্কারের সহিত নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্মিথ্ রুমালের খুঁটে, চক্ষুর কোণ মার্জ্জনা করিতে করিতে সস্মিতবদনে স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "সংসারে শোক আর দুঃখ, এই দু'টো জিনিষ মানুষের প্রাণকে যত বড় তেজঃপূর্ণ সত্য শিক্ষা দিতে পারে, এমন আর কেউ দিতে পারে না; ধৈর্য্য ধরে খুঁজে দেখ, প্রত্যেক অমঙ্গলে, প্রত্যেক অন্যায়ে, প্রত্যেক অত্যাচারে তোমার জন্যে কিছু না কিছু শিক্ষা আছেই আছে! তবে যেখানেই ধাক্কা খেয়ে অধীর অভিভূত হয়ে পড়্‌বে, সেইখানেই তোমার সব মাটি।......হাঁ, এখন তবে আমি উঠি, একবার হাঁস্‌পাতাল থেকে ঘুরে আসি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবো। তুমি ততক্ষণ এইখানে একটু বিশ্রাম করে নাও; বই টই আছে; খুসী হয়, পড়ে দেখ্‌তে পার। আর হাঁ,—ফের যেন বল্‌তে না হয়; মনে রেখো। সাতদিনের মধ্যে যদি হাস্‌পাতাল-গ্রাউণ্ডের মধ্যে তোমায় দেখি,—(হাসিমুখে বামহস্তের তর্জ্জনী উঠাইয়া সস্নেহে ও রহস্য-স্নিগ্ধকণ্ঠে) তা হ'লে আমার কাছে 'ঠ্যাঙানি' খাবে!"

নমিতা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসিতে পারিল না। চারিদিক্ হইতে অপ্রত্যাশিত ঘটনারাশি যেন পার্ব্বত্য জল-প্রপাতের মত হুড়াহুড়ি করিয়া একযোগে তাহার সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত ও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল; কোন বিষয় সে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইতেছিল না। তবুও স্মিথের শেষ কথায় হাঁসপাতালের সীমায় একেবারে প্রবেশ-নিষেধের কড়া আদেশে তাহাকে বিচলিত হইতে হইল। ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন ভাবে সে বলিল, "কিন্তু -কিন্তু ম্যাডাম্. কাল সকালেই হাতটা ড্রেস্ করাবার জন্যে একবার না গেলেই নয় যে!"

চিন্তিতভাবে স্মিথ্ বলিলেন, "তাই ত! আবার হাতটা ড্রেস্ করাবার জন্যে তোমায় ওখানে যেতে হবে? আচ্ছা, থাক্, তেওয়ারীকে পাঠিয়ে দেব; তোমার বাড়ীতে গিয়ে সে ড্রেস্ করে দিয়ে আস্‌বে।"

আবার তেওয়ারী! নমিতার কপালে ঘাম ছুটিল! বিব্রতভাবে সে বলিল, "না না, তাঁকে আর কষ্ট দেবেন না; তাঁর ঢের কাজ—!"

স্মিথ্ ক্ষণেক নীরবে ভাবিলেন; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা দেখি, যদি ওর সুবিধে না হয়, আমি নিজেই সকালে হাঁসপাতালের কাজ সেরে গিয়ে ড্রেস করে দিয়ে আস্‌বো।"

অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া নমিতা প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু স্মিথ তাহাকে সে

সুযোগ দিলেন না। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "সুশীলকে বেহারার সঙ্গে বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি ; তার জন্যে ভেবো না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরোও, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরবো।"

স্মিথ্ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

প্রার্থনা

আমার সকল গর্ব্ব দূর করি দিয়া
তোমার গর্ব্ব মুখেতে ল'ব,
আমার সকল বিভব ছাড়িয়া, আমি
তোমার চরণ-তলেতে র'ব।
ঐ চরণ-যুগল পাব বলে তাই
সকল আশারে ত্যজিবারে চাই ;
যেন কামনা বাসনা ঘুচাইয়ে দিয়ে
তোমারে স্মরিতে পাই।
তোমারই নামে আসিয়াছি হেথা,
সাথে সেই সুখ-দুখ-তরী।
তোমারই নাম গাহিয়া গাহিয়া
পরলোকে যাব ইহরে ছাড়ি !
জানি আমি ওগো করুণাসিন্ধু,
পাইব তোমার করুণাবিন্দু ;
জানি তুমি মোরে ভুলিবে না কভু ;
জীবনে না হয় মরণে,
কোন একদিন তুমি হে আমারে
স্থান দিবে তব চরণে।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

নিবেদন

তোমারি মন্ত্রে উঠিছে হৃদয়ে নব নব
ভাবে নূতন সুর।
আশিস্ তোমারি বরষিছে শিরে,
হৃদি-দাবানল করিতে দূর।
মনোমলিনতা ঘুচাতে আমার
সুধা-ধারা হৃদে ঢাল অনিবার ;
তোমার মহিমা বুঝে সাধ্য কা'র !
ওগো প্রভু তুমি ত্রিজগত-শূর !
কি-ভাবে হৃদয়ে রাখিব তোমায়,
কানে কানে যেন বলিছ আমায় !
ডাকিতে জানি না, তবু প্রেমরায় !
কাছে এসে হাস সুমধুর !
রাজে সদা হৃদে অমিয় মূরতি
সুখময় শান্ত সুশীতল অতি ;
তবুও তৃষিত এ হিয়া সম্প্রতি
ভেঙ্গে-চুরে যেন হয় চুর !
কেন যেন তা' কিছু জানি না দয়াল,
কর্ম্মফল কিংবা মম মন্দ ভাল !
আসিবে কি সেই শুভ সুক্ষ্ম কাল
হেরিব নিকটে, রবে না দূর !
(নাচিয়া উঠিবে হৃদয়-পুর ॥)

শ্রীবিমলাবালা বসু।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

বিংশ অধ্যায়।—পশুপক্ষি-প্রতিপালন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পারাবত—ইহাদিগকে পালন করিতে কোনরূপ কষ্ট নাই। এক এক জোড়া হইতে ৩ বা ৪ জোড়া শাবক প্রতিবৎসর পাওয়া যাইতে পারে। পারাবত রাখিতে হইলে টোং তৈয়ার করা উচিত। যদি পোকার আধিক্য হয় তবে টোংএ ছাই ছড়াইয়া দেওয়াই বিধি। ডিম্ব প্রসব করার আঠার দিন পরে শাবক নিষ্ক্রান্ত হয়। শাবক যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে পুং-পারাবতের সন্তানস্নেহও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পারাবতের মধ্যে গোলা ও সিরাজি রাখিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইহাদিগের শাবক যেমন অধিক হয়, তেমনই ইহারা সন্তান পালনে সুনিপুণ। ইহারা অতিশীঘ্র পুষ্টও হয়।

আহারের মধ্যে গম যত অল্প দেওয়া যায়, ততই ভাল। অন্যান্য শস্য ইচ্ছানুসারে দেওয়া যাইতে পারে। পারাবতেরা বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত জীব এবং তাহারা অত্যন্ত স্নানপ্রিয়। সুতরাং ইহাদিগের জন্য অগভীর পাত্রে জল রাখিয়া দিবে। কখনও কখনও চূণের জলও ব্যবহার করা উচিত। পারাবতেরা যদি সেই জল পানও করে তবে কোনও ক্ষতি নাই। চুণের জলের দ্বারা তাহাদিগের অঙ্গের পোকা মরিয়া যায়।

পারাবত একবার পীড়িত হইলে তাহাকে আরোগ্য করা দুঃসাধ্য। এরূপ স্থলে তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই উচিত।

পারাবতের টোংএ ইন্দুরের বড়ই দৌরাত্ম্য হয়; সুতরাং, ইন্দুর-কল পাতিয়া তাহাদিগকে ধৃত করা অথবা বিষ-প্রয়োগে নষ্ট করা উচিত। বিষ-প্রয়োগ করিতে হইলে অতিসাবধানে তাহা করা উচিত; যেন অন্য কোন প্রাণী তাহা না ভক্ষণ করে। শেঁকো বিষ খাদ্যের সহিত অথবা চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিলে ইন্দুরেরা তাহা ভক্ষণ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীব-হিংসা মহাপাপ।

হংসী—ইহাদিগের জন্য জলাশয়ের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু যথেষ্ঠ পরিমাণে জল ইহাদিগের সমক্ষে সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। একটী হংস ছয়টী হংসীর জন্য যথেষ্ঠ। পুরাতন হংসী শাবকের জন্য রাখিতে পারা যায়; কিন্তু হংস দুই বা তিন বৎসরের অধিক রাখা উচিত নহে। হংসীগণ প্রাতঃকালে ডিম্ব প্রসব করে। সুতরাং বেলা ৮টা বা ৯টা না হইলে তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে দিবে না। উক্ত সময়ের মধ্যে তাহাদিগের ডিম্ব প্রসব করা শেষ হয়। যদি হংস-শিশু চাহ, তবে ডিম্বের উপর মুর্গীকে তা দিবার জন্য বসাইতে হইবে। চার সপ্তাহে ডিম্ব ফুটিয়া যায়। হংস-শাবক অতিশয় শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। যখন তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে শুষ্ক ও উষ্ণ রাখিতে হইবে। তাহারা দুই মাসের না হইলে তাহাদিগকে জলে চরিতে দেওয়া উচিত

নহে; কারণ, তাহাতে তাহারা পীড়িত হইবে। জল-পান করিতে দিলে পাত্রে আন্দাজ করিয়া এতটা জল দিবে, যেন তাহাদিগের চঞ্চুমাত্র নিমজ্জিত হইতে পারে। হংস-শাবকের পক্ষে আর্দ্রতা বা শৈত্য প্রাণনাশক জানিবে। ডিম্ব হইতে নিঃসৃত হইয়া ২৪ ঘণ্টা অতীত হইলে হংস-শিশুকে দিনে চারিবার খাইতে দিবে। এই সময়ে ডাল রন্ধন করিয়া শাবকদিগকে খাওয়ানই বিধি; কিন্তু প্রথম দুই বা তিন সপ্তাহ উষ্ণ হওয়া উচিত। চোকরের (ভুষি) সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে হংস-শাবকেরা যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। ডিম্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন সপ্তাহ অতীত হইলে হংস-শিশুকে তিন বার এবং ছয় সপ্তাহ গত হইলে, দুইবার খাইতে দিবে। কাঁচা শস্য, ঘাস এবং শাক ইহাদিগের উত্তম খাদ্য। কেবল মাত্র শস্য খাইতে দিলে তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়াই উচিত। জলের পরিমাণ এক ইঞ্চ হওয়া চাই। হংস-শাবকেরা সময়ে সময়ে চলচ্ছক্তিহীন হয়। এরূপ সময়ে তাহাদিগের ল্যাজ কাঁচি দ্বারা কাটিয়া দিলে তাহারা আশু রোগমুক্ত হয়। বড় বড় হংসীদিগেরও উক্ত রোগ হইয়া থাকে। শাকাদি খাইতে না দিয়া অধিক শস্য খাওয়াইলে এইরূপ দশা সংঘটিত হয়। সুতরাং, আহারের জন্য শস্যের সঙ্গে শাকাদি দেওয়াই প্রশস্ত।

রাজহংসী—ইহাদিগের রোগ কম হয় বটে; কিন্তু জলাশয় না থাকিলে ইহাদিগের প্রতিপালনে কোনও লাভ নাই। ইহারা উদ্যানের অত্যন্ত ক্ষতিকারক। চারিটা রাজ-হংসীর জন্য একটা রাজহংস যথেষ্ট। রাজ-হংসীরা কেবলমাত্র একবার ডিম্ব প্রসব করে। ত্রিশ দিনে অণ্ড ফুটিয়া যায়। মুর্গী-দ্বারা ডিম্ব ফুটানই প্রশস্ত। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ-মাস পর্য্যন্ত ডিম্ব ফুটানর সময়। শাবকগুলিকে প্রথম দুই সপ্তাহ জলে যাইতে দিবে না এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথায় হংস-শাবকের ন্যায় খাওয়াইবে। অতঃপর তাহাদিগকে রাজ-হংসীর নিকট দিবে। তখন তাহারা স্বয়ং আগাছা, ঘাস প্রভৃতি খাইয়া জীবন-ধারণ করিবে।

শালগম টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কর্ত্তন করিয়া জলে ভিজাইয়া খাইতে দিলে, রাজ-হংসগণ অত্যন্ত পুষ্ট হয়।

বটের পক্ষী—মাটীতে গর্ত্ত করিয়া বটের পক্ষীদিগকে থাকিতে দিবে। কিন্তু সাবধান; যেন বর্ষাকালে তাহাদিগের গর্ত্তে জল প্রবেশ না করে। শৈত্যই ইহাদিগের প্রাণহা জানিবে; কিন্তু জমিতে সামান্য জলের ছিটা দিলে কোনও দোষ নাই। বাজরা-নামক শস্যই ইহাদিগের প্রধান খাদ্য; কিন্তু তাহার সহিত আটাও (যেমন মোটা ময়দা) মিলাইয়া দেওয়া চলে। ইহারা ফ্রেস অতি-আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে। ইহাদিগের পান করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল দেওয়া চাই। বটের পক্ষী ধৃত হওয়ার পর অনেকই গর্ত্তে মরিয়া যায়। তাহাদিগকে অধীনতায় আনিতে হইলে ক্রমে ক্রমে আনিতে হয়। ইহারা বৈশাখ এবং আশ্বিন মাসে ডিম্ব প্রসব করে।

ঔষধি।

পোকা—পক্ষীদিগের গাত্রে পোকা হইলে

দুই তিন দিন কেরোসিন তৈল তাহাদের গা মালিস করিলে পোকাগুলি মরিয়া যায়।

অজীর্ণ—অজীর্ণ হইলে মটর-ভর কর্পূর দিনে তিনবার সেবন করাইতে হইবে। আহার, কাঁচা শস্য দেওয়াই বিধি।

কাশী—কাশী হইলে কর্পূর খাওয়ানই উচিত।

জ্বর—জ্বরে অর্দ্ধগ্রেণ কুইনাইন এবং তিন গ্রেণ কর্পূরই ব্যবস্থা।

ডিম্ব রক্ষা।

ডিম্ব রক্ষা করিতে হইলে, পাত্‌লা গঁদে ডিম্বগুলি নিমজ্জিত করিয়া প্যাক (pack) করিয়া রাখা উচিত। ডিম্বের ক্ষুদ্র দিকটা নিম্ন দিকে কয়লার গুঁড়ায় থাকিবে। খুব তাজা ডিম্বই রক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

১। ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর। তিনিই তোমার সকল অভাব পূর্ণ করিবেন।

২। Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee :

৩। Examine all things, and hold fast to that which is good.

সকল জিনিষই পরীক্ষা কর এবং যাহা ভাল তাহাকে ধরিয়া থাক।

৪। মুক্তি যদি চাও ভক্তি-ভরে গাও,
নামে প্রাণ মাতাও দিবা-বিভাবরী।
কর্ম্মসূত্রে এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসে,
কর্ম্ম কর সদা স্মরি হৃষিকেশে।
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
আনন্দ-বদনে বল হরি হরি।
শুদ্ধ মনে সদা শ্রীহরি-প্রসঙ্গে,
কর আলাপন সাধুজন সঙ্গে।
এ জীবন-তরী ভাসাও তরঙ্গে,
ভাসাও দেখি মন ধর্ম্মহাল ধরি॥

৫। যে গ্রন্থ মানব-জীবনের গৌরবময় পরিণাম ও নিয়তি শিক্ষা দেয় না, তাহা তৃণবৎ ত্যজ্য।

৬। ধৈর্য্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায় জীবন-গঠনের একমাত্র সম্বল।

৭। মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা নিরোধনম্।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনম্
সা এব মুদ্রা বিচরন্তী খেচরী॥

যাহার মন অবলম্বন ব্যতিরেকে স্থির থাকে, যাহার বায়ু নিরোধ ব্যতিরেকে স্থির আছে এবং যাহার দৃষ্টি অবলোকন ব্যতীত স্থির, সেই ব্যক্তিই সিদ্ধ।

৮। সেই ব্যক্তিই ধন্য যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে।

৯। যাত্রার জন্য চারিটী বাহন রাখিয়াছি। যখন সম্পদ্ আসে তখন কৃতজ্ঞতার বাহনে আরোহণ করি, পূজার্চ্চনা-কালে প্রেমের বাহনে আরোহণ করি, বিপদ্ উপস্থিত হইলে সহিষ্ণুতার বাহনে আরোহণ করি, আর পাপ করিলে অনুতাপের বাহনে আরোহণ করি। (তাপস এব্রাহিম)।

১০। নির্জীবতাকে ভয়ানক পাপ এবং নিরাশাকে সাংঘাতিক গরল জানিয়া দূর করিয়া দাও।

১১। কর্ত্তব্য-সম্পাদনই ভগবানের আরাধনা, কর্ত্তব্য-সাধনই মুক্তির উপায় এবং ইহাই পরলোকের একমাত্র বিশ্রামস্থল।

১২। ইস্ দুনিয়ামে আইক্যেয়, ছোঁরি দেও তোম আয়েট্। লেনা হোয় সো লেইলে, উঠি যাতু হায় পায়েট্।

এই দুনিয়াতে এক মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়াছ, অহঙ্কার করিও না। যাহা লইবার আছে এই বেলা লইয়া লও; কারণ, তোমার জীবনায়ু ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে।

১৩। কুরু বন্দে তু বন্দেগি, যো পাওয়ে পাক দিদার। আঁওসব মানুখ জন্মকা, হোয় না বারম্বার।

কবির বলিতেছেন, যদি তুমি ভগবান্‌কে পাইয়া থাক, তাহা হইলে বন্দনা করিয়া লও; কারণ, এরূপ মনুষ্য-জন্ম, বারংবার হইবে না।

১৪। যোহি মারগ্ সাঁই মিলে তাঁহি চলো করি হোস্। ফেরি পাছে পছতাওগে।

যে রাস্তায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তাহাতে খুব সাবধান হইয়া চলিবে; কারণ, তাহা না হইলে পশ্চাতে অনুতাপ করিতে হইবে।

রেবা

(গল্প)

১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। অশনি বি-এ পরীক্ষা দিয়া কাশীধামে মাতৃ-দর্শনে আসিল।

অশনিকান্ত ঘোষালের আদিবাস হালি-সহরে; কলিকাতায় জ্যেঠা-মহাশয়ের নিকটে থাকিয়া সে রিপণ কলেজে পড়িত। তাহার পিতা জগদীশচন্দ্র ঘোষাল বহুকাল কাশী-রাজার 'প্রাইভেট সেক্রেটারী'র কাজ করিয়া তিন বৎসর হইল কাশী-প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদীশবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা ভার্য্যা তাঁহারই অনুসৃত পন্থার আকাঙ্ক্ষায় কাশীতেই রহিয়া গেলেন। ছুটির পর অশনি যখন কলিকাতায় ফিরিয়া যায়, কখনও মা তাহার সঙ্গে যান, দুই-একমাস ভাসুরের বাড়ীতে থাকিয়া পুনরায় কাশীতে চলিয়া আসেন। অশনি ছুটির সময় কাশী আসে এবং ছুটীর শেষ দিনটি পর্য্যন্ত পরম নিরুদ্‌বেগে কাটাইয়া, পুনরায় কলিকাতায় ফেরে।

কাশীতে শুধু যে অশনির মা-ই ছিলেন এমন নয়;—আরও একটি প্রবল আকর্ষণ অশনিকে তীর্থবাসী করিয়া তুলিয়াছিল। সে আকর্ষণটী 'রেভারেণ্ড' বঙ্কবিহারী গুহের কন্যা রেবা।

রেবা মাতাপিতৃহীনা। অভিভাবিকা এক খুড়ীর তত্ত্বাবধানে সে বাস করিত এবং 'শিগ্‌রা মিশন স্কুলে' বিদ্যা-শিক্ষা করিত। রেবাদের বাড়ী অশনিদের বাড়ীর কাছেই। সর্ব্বদা দেখা-শোনা এবং যাতায়াতে বন্ধুত্ব ক্রমে আত্মীয়তায় দাঁড়াইয়াছিল। মাতৃহীনা রেবা অশনির মাকে মাতৃ-সম্বোধনে তাঁহার মনের মধ্যেও অনেকখানি স্থান করিয়া

লইয়াছিল। অশনি তাহার ছেলেবেলার বন্ধু, শিক্ষক, খেলার সাথি। বয়সের সহিত শৈশবের অনাবিল স্নেহ যে ভিন্নভাব ধারণ করিতেছিল, তাহা সমবয়ষী এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর নিজেদের মনের গোচর না হইলেও বাহিরের লোকে কাণাঘুসা করিতেছিল। অশনির মা-ও ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন।

অশনি আশৈশব রেবার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আসিলেও নিষ্ঠাচারপরায়ণ মাতা-পিতার শিক্ষা, সাহচর্য্য ও দৃষ্টান্তে মনের মধ্যে যথেষ্ট জাত্যাভিমান পোষণ করিত। কিন্তু কিছু দিন হইতে তাহার ভাব-ভঙ্গী চাল-চলনে অত্যন্ত পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছিল। সে এখন জোর করিয়া রেবার স্বহস্তে প্রস্তুত লুচি-মোহনভোগে উদর তৃপ্ত করে, রেবার জলের কুঁজা হইতে জল লইয়া খায়, এবং আরো ছোট-বড় অনেকগুলি আপত্তিজনক কার্য্যে মাতার মনে যথেষ্ট বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া থাকে।

এবার বাড়ী আসিয়াই অশনি শুনিল তাহার বিবাহ। বৈশাখের প্রথমেই যে-দিনটা শুভলগ্ন লইয়া উপস্থিত হইবে, সেই দিনেই কার্য্য সুসম্পন্ন করা হইবে। ইহা শুনিয়া অশনি প্রথমে রাগ করিয়া মুখভার করিল, ভাল করিয়া খাইল না; মাতার সহিত কথা কহিল না। কিন্তু যখন এ মুষ্টিযোগে মায়ের উৎসাহের হ্রাস হইতে দেখা গেল না, তখন সে মায়ের কাছে গিয়া স্পষ্ট করিয়া কহিল, "এ-সব কি শুন্‌চি?—এ রকম ত কোন কথা ছিল না।"

মা তখন স্নানের পর উঠানে রোদে বসিয়া পিঠের উপর ভিজা চুলগুলি মেলিয়া দিয়া, চটের উপর ছেঁড়া কাপড় বিছাইয়া কলাইয়ের দালের বড়ি দিতেছিলেন। ছেলের কথায় মুখ তুলিয়া চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া তিনি কহিলেন, "কি রকম কথা ছিল তবে, শুনি?"

অশনি মুখ ভার করিয়া কহিল, "আমি ত তোমায় বরাবর বলে আস্‌চি, পড়া শেষ না হলে, বিয়ে টিয়ে কোর্ব্বো না।"

পুঁটির মা এতক্ষণ কাঁশী-ভরা পিষ্ট দালে সঘন কর-তাড়নায় রীতিমত ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিতে করিতে দাদাবাবুর বিবাহে সোনার তাগা ও তসরের সাটী ফরমাইস দিয়া হস্ত-বেদনার উপশম করিতেছিল। দাদাবাবুর গম্ভীর মুখ ও কণ্ঠস্বরে তাহার আশার প্রদীপ অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িল। ছেলের কথায় মা ততোধিক গম্ভীর মুখে কহিলেন, "কিন্তু আমি ত তোমায় বরাবরই বলে আস্‌চি যে, ও-সব বিদকুটে আব্‌দার চল্‌বে না। বি-এ-পরীক্ষা দিয়েই তোমায় বিয়ে কর্‌তে হবে।"

অশনি শ্লেষের স্বরে কহিল, "তার চেয়ে সোজা কথায় বল না, অতীন্দ্র চৌধুরীর ট্যাক-শালকে ধরে আন্‌বে; বৌ আন্‌বে না!"

মা হাতের কাজ বন্ধ না করিয়া, মুখ না তুলিয়া কহিলেন, "সে তোর যা খুসী মনে করিস্। বিয়ে কর্‌তেই হবে। সে কি কথা? ভদ্রলোককে কথা দিয়েচি! আর মেয়ে, খাসা মেয়ে! ইচ্ছে হয়, নিজের চোখে দেখে আসিস্। তোর যাতে মন্দ হবে, তেমন কাজ আমি কোর্‌বো না, এ বিশ্বাস তুই আমার ও পরে রাখ্‌তে পারিস্।"

এ কথার পর আর তর্ক করা চলে না। অশনিও তাহা করিল না। সে চলিয়া

যাইবার সময় কেবল নিজের অসম্মতিসূচক অস্ফুট-বিরক্তি প্রকাশ করিতে করিতে গেল। মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, এ ঝড় যে উঠ্‌বে তা আমি আগে থেকেই জানি। ভালয় ভালয় এখন দু'হাত এক কর্ত্তে পাল্যে, বাবা শিবনাথ, তোমায় সোনার বেলপাতা দিয়ে ষোড়শোপচারে পূজো দেব ; ছেলের আমার সুবুদ্ধি দাও।"

তাহার পর অশনি বাহিরে বৈঠকখানা-ঘরে জাজিম-মোড়া তক্তাপোযের উপর পড়িয়া, খানিক গড়াইয়া, খানিক খবরের কাগজের অনাবশ্যক বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে চোখ্ বুলাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল রেবা, হয়ত, এতক্ষণ তাহারই প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। চিঠিতে সে রেবাকে আশা দিয়া রাখিয়াছে, এবার তাহার কবিতার খাতা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে সে-গুলি দুই জনে মিলিয়া বাছাই করিয়া লইবে। উৎসর্গ করিবে কাহাকে তাহাও স্থির হইয়া আছে। কেবল বইখানির নাম লইয়াই মতদ্বৈধ চলিতেছিল।

এবার কাশী আসিয়া অশনি রেবার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে যায় নাই, সেই আসিয়াছিল। অশনির মনে হইল, এই কয় মাসের অদর্শনে রেবা যেন অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহার সে অকারণ হাসি-আব্দার নাই! তাহার চালচলন এত গম্ভীর যে, অশনির মনে হইতেছিল, সে যেন হাত বাড়াইয়া আর তাহার নাগাল পাইতেছে না। হয়ত, মায়ের এই সব পাগ্‌লামীর খেয়ালও সে শুনিয়াছে,—এই কথাটা মনে হইতেই অশনি মনে মনে লজ্জানুভব করিল।

২

রেবা তাহার পড়িবার ছোট ঘরখানিতে একখানা ইংরাজী নভেল হাতে লইয়া পড়িবার ভানে বসিয়াছিল। পাঠের ইচ্ছা তাহার এতটুকুও ছিল না। সে বসিয়াছিল ভাবিবার জন্য। কিছুদিন হইতেই সে অশনির বিবাহের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আসিতেছে ; উদ্‌যোগ আয়োজন চলিতেছে, তাহাও দেখিতেছে। যতক্ষণ সেখানে থাকে সেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু এখন বাড়ী আসিয়া তাহার আর এতটুকুও আনন্দোৎসাহ অবশিষ্ট ছিল না। সে কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল! দেশালাইয়ের কাঠিটা যেমন প্রথম-ঘর্ষণেই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই নিঃশেষে ভস্ম হইয়া যায়, রেবার সচেষ্টিত আনন্দের আলোটুকুও তেমনি জ্বলিয়া একেবারেই নিভিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, অশনির এইবার বিবাহ হইবে। একটি নোলক্-পরা কিশোরী বধূ তাহার বিচিত্র ছাঁদের কবরী ঢাকিয়া, ঘোম্‌টা টানিয়া, আল্‌তা-পরা দু-খানি কোমল চরণে জলতরঙ্গ মলের ঝুণুঝুণু বাজাইয়া অশনির অন্তরেও তাহার অনুরণন তুলিবে। সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কিশোরী মেয়েটির ঝাপ্‌টা-কাটা মুখের পানে চাহিয়া অশনির কবিতার উৎস এইবার ভিন্ন-পথাশ্রয়ে বহিবে। বিশ্বের সৌন্দর্য্য সেইখানেই সে দেখিতে পাইবে ;—ক্ষুদ্র বাল্য বন্ধুত্বের কথা তাহার আর মনেও পড়িবে না। রেবা কল্পনা-নেত্রে দেখিল, অশনির মুখে আনন্দের দীপ্তি! পত্নী-প্রেমে সে পরিতৃপ্ত!

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাংশু

আকাশে রেবা তাহার উদাস-নেত্র ফিরাইল। জ্বালাময় তেজ ম্লান করিয়া অপরাহ্নের সূর্য্য ডুবিয়া আসিয়াছে। রৌদ্রের তেজ কমিলেও ধরণীর তপ্তবক্ষের সমস্ত সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাসগুলা এইবার ঊর্দ্ধপথে উত্থিত হইয়া বাতাসটাকে অসহনীয়রূপে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

পিছন হইতে মৃদুহাসির শব্দ শুনা গেল। রেবা চমকিয়া মুখ ফিরাইল; সঙ্গে সঙ্গে মধুর হাসিতে তাহারও মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কখন এলে, অশনি?"

অশনি কহিল, "অনেকক্ষণ,—যতক্ষণ থেকে তুমি খুব মন দিয়ে পড়া কচ্ছিলে। এবার পরীক্ষায় তুমি নিশ্চয়ই ফার্ষ্ট হবে।"

রেবা সলজ্জ হাস্যে কহিল, "ঠাট্টা হচ্চে! কেন? কি অমনোযোগটা দেখ্‌লে শুনি?"

অশনি রেবার হাতের পাতা-খোলা বই-খানা কাড়িয়া প্রসারিত ভাবে ধরিল; হাসিয়া কহিল, "কিছু না। কেবল বইখানা কি রকম করে ধল্লে পড়া এগোয়, তাই শিখে নিচ্ছিলুম্?"

রেবা চাহিয়া দেখিল, সে পুস্তকখানা সম্পূর্ণ উল্টাভাবে ধরিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! এমন আত্মবিস্মৃত সে! হারিয়া হার স্বীকার করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নয়। রেবাও তাহার জাতীয় ধর্ম্ম বিস্মৃত হইল না। অকারণ কোলাহলে এক রকম করিয়া প্রতি-পক্ষকে স্বীকার করাইয়া লইল যে, পাঠে তাহার মনোযোগের অন্ত নাই এবং বই-খানা উল্টাভাবে ধরিলেও পাঠকের পাঠে ব্যাঘাত হয় না।

অশনি আসন গ্রহণ করিলে রেবা কহিল, "তারপর মহাশয়ের দেশে গমন হচ্চে কবে?"

অশনির মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল; কহিল, "যার ইচ্ছে এবার শীঘ্রই দেশে যাওয়া হয়—।"

রেবা বাধা দিয়া কহিল, "আপ্‌নার তাতে অনিচ্ছে না কি?"

অ। আমার তুমি ত জান, রেবা, ছুটির একটা দিনও আমি বাইরে নষ্ট করি কি না? কেন তাও জানো। আর এবারকার এই লম্বা ছুটিটা—।

"তোমার অনেক দয়া অশনি, কিন্তু সংসারে ঢুকে হয়ত এ গরীব বন্ধুটির কথা আর মনেও থাকবে না।" রেবা এই কথাটা হাসি দিয়া আরম্ভ করিলেও হাসি দিয়া শেষ করিতে পারিল না। অকারণে চোখে জল আসিয়া তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে কম্পিত করিতে-ছিল। অশনি বিস্মিত চোখে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া লইল। তারপর সরহস্যে কহিল, "বাঃ! বিনয়-প্রকাশও যে ঢের শেখা হয়ে গেছে! মহাশয়া, বুঝি, সম্প্রতি সংসারে ঢোক্‌বার মৎলবে আছেন; তাই ভূমিকায় জানান্ দেওয়া হচ্ছে?"

রেবা মৃদু হাসিয়া কহিল, "আর লুকো-চুরীতে কাজ কি? আমি ত কিছু জানি না?"

অশনি মনোযোগীর ভাবে কহিল, "কি জান শুনি?"

রে। যা জান্‌বার। আগামী ১৭ই বৈশাখ অতীন্দ্রবাবুর কন্যা শ্রীমতী কনকলতার সহিত শ্রীযুক্ত অশনিকান্ত ঘোষালের শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইবে। অতএব মহাশয় সবান্ধবে—"

অশনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "থামুন মহাশয়া! আর জেঠামো দরকার নেই।"

রেবা মৃদুমৃদু হাসিতেছিল। সে কহিল "জেঠাম কিসের? সত্যি কথা বল্‌ব তাতে বন্ধু বেগড়ান্ বিগ্‌ড়বেন; যদিও জানি, বন্ধু ঐ সত্যি কথাটা শোন্‌বার জন্যে সহস্রকর্ণ হ'তেও প্রস্তুত; মুখে যতই তর্জ্জন করুন্!"

অশনি শান্তভাবে কহিল, "বন্ধুর আর যা অপরাধ ইচ্ছে দাও; ঐটে দিও না। বিয়ে আমি কোর্‌বো না।"

রে। কেন? মা ত বল্লেন কর্‌বে?

অ। মা জানেন না। অনর্থক ভ লোককে আশা দিয়ে ভোগাবেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট কথাই বলেচি, এখানে বিয়ে আমি কোন মতেই কোর্‌বো না—।

রেবা মুখ তুলিয়া কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু সহসা কাশী আশায় কথাটা আর বলা হইল না। অসহ্য গ্রীষ্মে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এখনি নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ দুই জনেই চুপ করিয়া রহিল। এক সময় মৌন ভঙ্গ করিয়া অশনিই প্রথমে কহিল, "জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে—কেন কর্‌ব না।—শুন্‌বে কি?" অশনির কণ্ঠস্বরে ও দৃষ্টিতে এমন কোন ভাব ব্যক্ত হইতেছিল যাহাতে তাহার অব্যক্ত উত্তর শুনিতে রেবার সাহস হইল না। ঘরের বাতাসটাও যেন ভাবাবেগে স্পন্দিত হইতেছিল; না জানি, এখনি সে কি অপ্রকাশ্য গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া দিবে! হয়ত, চিরপ্রার্থিত চিরদুর্ল্লভ উত্তর এখনি সুলভ হইয়া প্রকাশ পাইবে। ওগো সে কথা, সে গোপনীয় কথা গোপনীয় থাক্। সে ত প্রকাশের যোগ্য নয়। তবে আর কেন? রেবা মাথা নাড়িয়া অশনির উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে জানাইল, না, সে শুনিতে চাহে না।

"কেন না?" অশনি দমিল না। উৎসাহে সোজা হইয়া কহিল, "না" বোল না। তোমায় শুন্‌তেই হবে। তুমি কি আমার মনের কথা জান না? নিজেকে এত বোকা সাজিও না, রেবা! তুমি সবই বোঝ। আমার ভালবাসা আমায় ভুল বোঝায় নি। বল, আমার মনের কথা তুমি জান?"

রেবা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বিপন্নভাবে কহিল, "এ সব কথা তুমি কাকে বল্‌চ? অশনি, বুঝ্‌তে পাচ্ছ কি?"

"ঠিক্ পাচ্চি। যাকে ছাড়া জীবনে আর কাকেও এমন করে ভালবাস্‌তে পার্‌ব না; যে নইলে সংসার আমার শ্মশান হয়ে যাবে, যে আমার শৈশবের খেলার সাথী, কৈশোরের বন্ধু, যৌবনের প্রিয় সখী—সেই রেবাকেই আমি আমার মনের কথা খুলে বল্‌চি।"

রেবা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া আরক্তমুখে স্খলিতবাক্যে বাধা দিল, "থাম অশনি! এমন করে তুমি আমায় অপমান কোর না।—আমি জান্‌তুম্ না, তুমি নেশা কর্‌তে শিখেচ! জান্‌লে—।" জানিলে সে যে কি করিত, সে-সম্বন্ধে কোনও উপস্থিত যুক্তি খুঁজিয়া না পাওয়ায় সে চুপ করিল। অশনি কিন্তু বাধা মানিল না। সে রেবার গমন-পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরস্বরে কহিল, "মিছে কথা বলে আমায় হাসিও না রেবা! তুমি জান, তোমার অপমান কর্‌বার সাধ্য আমার নেই। আমার কথার জবাব দাও। বল, আমার স্ত্রী হ'তে তুমি অসম্মত নও।"

রেবা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া

দাঁড়াইল; নতমুখে কহিল "ও-সব পাগ্‌লামীর কথা ছেড়ে দাও। তুমি হিন্দু, আমি খৃষ্টান। কেবল এই প্রভেদটা ভুলে যেও না।"

অশনিও এ-কথা ভুলিয়া যায় নাই। ভুলে নাই বলিয়াই এতদিন ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া চুপ করিয়াছিল। তাহা না হইলে মনের কথা প্রকাশের সুযোগ আরও অনেক আগেই সে লইত। ভাবিতে গেলে ভাবনার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী রেবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহাকে লাঞ্ছনা এবং ততোধিক ক্ষতিও যে সহিতে হইবে, এ কথা সে ভালই জানে। বিষয়ে বঞ্চিত হইতে না হউক, আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ, এমনকি জগতে একমাত্র স্নেহের স্থান মাতৃকোলের অধিকারেও সে বঞ্চিত হইবে। তা হউক্; রেবাকে ছাড়িয়া সংসারে তাহার সুখ নাই; তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া যাইবে। প্রেমের খাতিরে সংসারের সকল সুবিধাই সে বিসর্জ্জন দিতে সম্মত। রেবাকে ত্যাগ করিলে সে বাঁচিবে না। কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গিয়াছে। মাতার কাছেও সে মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছে। তাহার ফলে মাতা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিতেছেন। বাকী ছিল রেবার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলা। এই বলার জন্য মন তাহার আকুলী বিকুলি করিতেছিল; তবু সঙ্কোচের হাত সে এড়াইতে পারিতেছিল না। ভালই হইল, রেবা নিজেই সুগম পন্থা দেখাইয়া দিয়াছে। কর্ত্তব্য যখন স্থির করাই আছে, তখন আর অনর্থক কালক্ষেপের প্রয়োজন কি? মাতাও আশা ছাড়িতে পারিতেছেন না; বাহিরেও কন্যাভারাতুর কোনও ভদ্রলোককে আশান্বিতও করিতেছেন। এ খেলার উপসংহার হইয়া গেলেই যে এখন বাঁচা যায়! রেবা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিনী। তাহাতে কি? ভালবাসার কাছে কি তুচ্ছ হাস্যকর সে বাধা! পর্ব্বতগৃহ-নিঃসৃতা সিন্ধু উদ্দেশ্যে গমনশীলা নদীর বেগ কি সামান্য প্রস্তরের বাধায় রুদ্ধ হইতে পারে! প্রচণ্ড ঐরাবতও যে এ স্রোতের টানে ভাসিয়া যায়। অশনি মুখ তুলিয়া দীপ্তচক্ষে চাহিল ও কহিল, "রেবা! আমাদের ভালবাসার কাছে ওর কি এত বেশী দাম! এ সব তুচ্ছ বাধায় আমাদের মিলনকে বাধা দিতে পার্‌বে না। আমি খৃষ্টধর্ম্ম নিয়ে তোমায় পেতে চাই।"

রেবার দুই চোখে বিস্ময় ভরিয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিত স্বরে সে কহিল, "ধর্ম্মত্যাগ কোর্‌বে? বল কি অশনি!"

অশনি মৃদু হাসিয়া কহিল, "না ত্যাগ কোর্‌বো কেন? শুধু ঠাকুরের নামটা বদ্‌লে নেব। তাতে তাঁর কিছুই ক্ষতি হবে না; কিন্তু না নিলে, আমার ক্ষতির শেষ থাক্‌বে না।"

রেবা মৃদুস্বরে কহিল, "কিন্তু এ ধর্ম্মমত ত তুমি তাঁর জন্যে বদল কোর্‌চ না। নিজের সুবিধের জন্যে, শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক সব খুটিনাটি, দোষগুণ সহ্য কোর্‌তে পার্‌বে কি না—?" রেবা তাহার কথার শেষ করিতে পারিল না। চোখের জলে তাহারও যে দৃষ্টি ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল! হয়ত, এ দুর্ব্বলতা এখনি অশনির চোখে পড়িবে, এই ভাবিয়া সে সংযত হইল।

অশনি উঠিয়া ঘরখানা বার-দুই পরিভ্রমণ

করিয়া রেবার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল ও কহিল, "এত ভেবে কাজ কর্‌বার আমার সাধ্য নেই। রেবা! আমার মনের কথা তোমায় সব জানিয়েচি। স্পষ্ট উত্তর দাও, তুমি আমার স্ত্রী হ'তে রাজী আছ কি না?"

রেবা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কি যে বল! সবাই ত আর তোমার মত পাগল নয়!"

তবুও অশনি জোর করিয়া তাহাকে ভাবিতে সময় দিল ও সেই সঙ্গে বলিয়া দিল, "এটাও ভেবো,—আত্মীয়, বন্ধু, সমাজ, সব ছেড়েও আমি অনায়াসে থাকৃতে পার্ব্বো; কিন্তু তোমায় ছাড়্‌তে হলে আমি বাঁচ্‌ব না।"

রেবাকে কথা কহিবার সময় না দিয়া, এবং নিজের কথা শেষ না করিয়া, ছাতিটা পর্য্যন্ত না লইয়াই সে ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। জানালা দিয়া রেবা চাহিয়া দেখিল, রাস্তাতেও সে আর ফিরিয়া চাহিল না।

(৩)

সপ্তাহ কাটিয়া গেল। অশনি রেবার সঙ্গে দেখা করিল না। রেবা তাহার খুড়ী-মার মুখে শুনিল, ছেলের সহিত ঝগড়া করিয়া অশনির মা দেশে চলিয়া গিয়াছেন; অশনি তাঁহার সঙ্গে যায় নাই। এমন ঘটনা রেবার অভিজ্ঞতায় আর কখনও ঘটে নাই। মা যখনই দেশে গিয়াছেন, অশনি তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। রেবা নিজে গিয়া তাঁহাদের ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। এবার অশনির মা দেশে গেলেন, কিন্তু রেবাকে একটা মুখের কথা বলিয়াও গেলেন না! রেবা দুই দিন তাঁর কাছে না গেলে, তিনি ডাকিতে আসিতেন, কত স্নেহের অনুযোগ করিতেন! আজ রেবা তাঁহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে যে, মুখের কথা একটা বলিয়াও গেলেন না! সে কেবলই চোখের জল মুছিয়া মুছিয়া ভাবিতেছিল, 'কেন এমন হইল! তবে কি অশনি সেই সব তার পাগ্‌লামির কথা তাঁহার কাছে প্রকাশিত করিয়াছে?—তাহাই সম্ভব। ছিঃ ছিঃ! তিনি কি মনে করিলেন! তিনি লজ্জাহীনা রেবার স্পর্দ্ধায় কতই না তাহাকে অভিশাপ দিয়াছেন। অশনি পাগল, তাই সে এমন ছেলেমানুষি কথা আবার লোকের কাছে প্রকাশ করে। রেবাই কি তাহাকে ভালবাসে না? বাসে বই কি! সে ছাড়া রেবার ভাল বাসিবার আর কে আছে? রেবার মনে হইল, হয় ত সে অশনিকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে না; যে ভালবাসায় জাতি-ধর্ম্ম ন্যায়-অন্যায় যুক্তি-তর্ক মানিয়া চলা যায় না। অশনির সেই বিশ্বগ্রাসী উদ্দাম ভালবাসার সহিত সে তাহার বিচার-বিবেচনাপূর্ণ সাধ্‌ঘাট বাঁধা ভালবাসার আবার তৌল করিতে চায় না কি? ছিঃ! সে কি তাঁহার যোগ্য! রেবা কল্পনা-নেত্রে সুদূর ভবিষ্যতের একখানা রঙিন চিত্র আঁকিয়া দেখিতে চাহিল।—চিত্রখানা বড় মলিন দেখাইল। অশনির মনের এ তীব্র অনুরাগ কে জানে কতদিন স্থায়ী হইবে! উদ্দীপনার অবসানে শুধু রেবার প্রেমই কি তাহার পরিত্যক্ত অতীত জীবনের সকল পূরাইতে পারিবে? যে-সমাজ রেবার সহিত তাহার আবাল্যের বন্ধুত্বেও তাহাকে আকৃষ্ট

করিতে পারে নাই, শুধু একটা বন্ধনের স্বীকার-উক্তিতেই সে কি নিজে হইতে মনে-প্রাণে তাহার আপন হইবে? তুচ্ছ রেবার জন্য এতখানি ক্ষতি সহিতে মন তাঁহার দুই দিনেই হয়ত অস্থির হইয়া উঠিবে। পুরাতনের জন্য মন যখন তাঁহার হাহাকার করিবে, রেবা তাঁহাকে তখন কোন্ সান্ত্বনা দিবে!

রেবা ভাবিয়া দেখিল, অশনির মঙ্গলের জন্য অশনিকে ত্যাগ করা ছাড়া, তাহার আর দ্বিতীয় পথ নাই। যে ভালবাসা প্রিয়ের ক্ষতি করে, সে ভালবাসা ত ভালবাসা নয়! সে উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসা কখনও স্থায়ী হয় না; তাতে সুখ ত নাই-ই, তৃপ্তিও নাই। রেবা মনে মনে বলিল, 'তুমি আমায় হৃদয়হীনা বল্‌বে, কিন্তু আর উপায় নেই। তোমার কাছ থেকে আমি সরে যাব;—আমায় ভুলে যেতে সুযোগ দেব; তা হলেই তুমি সুখী হ'বে। চোখের নেশা ফুরিয়ে গেলে, হয়ত, তুমি আমাকে ভুলেও যাবে।' অশনি তাহাকে ভুলিয়া যাইবে, মনে করিতেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি তেমন ভালবাসেন নি ত! যে ভালবাসায় সংসারের স্বার্থ ভুলিয়ে দেয়, এ ত সে ভালবাসা নয়! তাঁর চোখের বাইরে গেলে, হয় ত, মনের বাইরেও চলে যাবে। রেবা ভাবিল, এই না সে বলিতেছিল প্রাণ ঢালিয়া সে অশনির মত ভালবাসিতে পারে নাই! এ দুর্ব্বোধ্য মন লইয়া সে এখন কি করিবে? সে তাঁহাকে বন্ধনে ফেলিয়া দুঃখে ডুবাইবে না। মায়ের কোল, সমাজের বক্ষ হইতে সে তাহাকে ছিঁড়িয়া আনিবে না। সে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে দৃঢ়সংকল্প। তবু অশনি যে তাহাকে ভুলিয়া যাইবে এ চিন্তাও তাহার অসহ্য মনে হইতেছিল।

রেবার জীবনের সমস্ত সাধ, সব কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল, বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনও তাহার সেই সঙ্গে ফুরাইয়াছে। অশনির প্রশ্নের সে উত্তর দিয়াছে। চিঠিতে লিখিয়া নয়; নিজের মুখেই সে জবাব দিয়াছে। সেই সঙ্গে অশনির সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ চুকিয়া গিয়াছে। চিরজীবনের পাথেয়রূপে সে যখন অশনির বন্ধুত্ব চাহিয়াছিল, অশনি রাগ করিয়া বলিয়াছিল, 'মাপ কোরো। যদি নিতান্তই তোমায় ভুল্‌তে না পারি, শত্রু বলেই মনে কোর্ব্বো; —বন্ধু নয়।' উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসগুলা রুদ্ধ বক্ষের বাহিরে আসিবার জন্য যখন বিদ্রোহে ঠেলাঠেলি লাগাইয়া শ্বাসরোধ করিয়া দিতে চাহিতেছিল, তখনও সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত হাসি-মুখেই সে বলিয়াছে, "সেই ভাল; তোমার বন্ধুতার চেয়ে শত্রুতাও আমার কাম্য। তুমি এমন হতে পার, তা আমি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারি নি, অশনি!" একথার পরেও অশনি যখন একান্ত ব্যাকুলতার সহিত সকাতরে কহিয়াছিল, "বল, কখনও কোন দিন—যত দীর্ঘ দিন পরেই তা আসুক, কোন আশা আমি রাখ্‌ব কি না?" তখনও অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে রেবা বলিয়াছিল, "কালের জরিমানায় ধর্ম্ম কখনও ছোট হয় না; তোমায় আমি শ্রদ্ধা কর্ত্তুম, অশনি! সেটুকু আমার থাক্‌তে দাও। যা অসম্ভব তা কখনও সম্ভব হয় না। ও-সব পাগ্‌লামী বুদ্ধি ছেড়ে

দাও। জান ত তোমাদের শাস্ত্রই বলেছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ
এ কথার পর "বেশ তাই হবে" বলিয়া সেই যে অশনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে, তারপর আর সে রেবার কোন সংবাদ লয় নাই

রেবার ইচ্ছা করিতেছিল সে অশনির কাছে মাপ চাহিয়া বলে, সে মিথ্যাবাদিনী, তাই অবলীলায় অতবড় মিথ্যা বলিতে পারিয়াছে। সে তাঁহাকে শুধু শ্রদ্ধা করে না, ভালবাসে; সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসে। কিন্তু সে কথা সে কেমন করিয়া বলিবে? সে যে দর্পণের প্রতিবিম্বের মতই অশনির মন দেখিতে পায়। একবার এতটুকু দুর্ব্বলতা জানাইলে অশনি কি আর তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহিবে! যত কঠিনই হউক, অশনির মঙ্গলের জন্য অশনিকে ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে যাওয়া ছাড়া রেবার আর গতি নাই। সে তাই যাইবে। খুড়ীমাকে সে বুঝাইয়াছিল, কলিকাতা গিয়া কোথাও কোন কাজ সে খুঁজিয়া লইবে; নচেৎ বসিয়া খাইলে কয়দিন চলিবে? কুবেরের ভাণ্ডার তাহার নাই।

খুড়ীমা চোখে, কানে কম দেখেন ও শোনেন্। তবু যতটুকু বুঝিলেন, তাহাতে মনে করিলেন, বিদেশে কোথাও সরিয়া যাওয়াই ভাল। মেয়ের যেন দশ দিনে দশ বছর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার সে সদানন্দময় বালিকা-ভাব আর নাই। চিন্তা-শীলা যুবতী রাতারাতির মধ্যেই যেন প্রৌঢ়ত্বে উপনীতা হইয়াছে। কেন যে এমন হইল তাহার খবরও তিনি জানিতেন। সস্নেহে তিনি রেবাকে বুঝাইলেন, "কেন নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছিস্ মা! অশনিকে তুই কোন্ অপরাধে বিয়ে কর্ত্তে চাইচিস্ নে?"

রেবা আজ তাহার একমাত্র আত্মীয়ার কাছে চোখের জল লুকাইতে পারিল না; কাঁদিয়া কহিল, "ও কথা বোল না খুড়ী-মা! আমার জন্যে তিনি এত ছোট হয়ে যাবেন, —এ আমি সইতে পার্‌বো না!"

খুড়ীমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তবে কল্‌কাতাতেই চল। এখানে আর টেক্‌বে কেমন করে! আহা, বাছা অশনির মনেও এত ছিল!"

(৪)

রেবার উপর রাগ করিয়া অশনি কিছুদিন শূন্য বাড়ীখানাই আঁক্‌ড়িয়া পড়িয়া রহিল; রেবার আর সংবাদ লইল না। রাগটা কমিয়া আসিলে সে মনে করিল, রেবা, বোধ হয়, এইবার নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারিবে; পারিয়া ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইবে। সে ত রেবাকে বরাবর দেখিয়া আসিতেছে। অবহেলা সহিয়া সে আর কতদিন চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে? এমন রাগারাগি তাহাদের কতবার হইয়াছে, কিন্তু রেবাই আগে সাধিয়া ভাব করিয়াছে। কোন দিনই অশনিকে সাধিতে হয় নাই। রেবাই সাধিয়াছে। অসহ্য উৎকণ্ঠা বহন করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল। রেবার নিকট হইতে ক্ষমা-প্রার্থনা বহন করিয়া কোনও মূকবার্ত্তাবহই আসিল না।

একদিন সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া সকাল বেলা বিছানা হইতে উঠিয়াই অশনির মনে হইল, তাই ত এবারকার কলহের বিষয়টা ত ঠিক্ অন্যবারের মত নয়। যতই হোক্ বিবা-

হের বিষয় লইয়া যখন গোল, তখন সে স্ত্রীলোক আগে ক্ষমা চাহিতে পারে না। নিজেকে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া অশনি তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া নিজেই রেবার উদ্দেশ্যে যাইতে প্রস্তুত হইল। বাড়ীর বাহির না হইতেই দরোয়ান একখানা পত্র অশনির হাতে দিল। হাতের লেখা দেখিয়াই অশনি বুঝিল, চিঠি রেবার। মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের ক্ষুব্ধ অভিমান ঝড়ের মুখে তৃণগাছির মত কোথায় উড়িয়া গেল। তাহার অনুমান তবে ভ্রান্ত নয়। রেবা চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আগেই চিঠি লিখিয়াছে। নির্ব্বোধ কেন সে মিথ্যা ঝোঁকে নিজেও কষ্ট পাইতেছে, অশনিকেও পীড়িত করিতেছে? ভগবানের ইচ্ছাই যদি ইহাতে না থাকিবে, তবে কেন সে এমন করিয়া তাহার সমাজ-সংসারের বাহিরে একমাত্র অশনিকেই অবলম্বন করিয়া এত বড়টি হইয়া উঠিয়াছিল? ভগবানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ইহার তলে আছে বই কি!

অশনি ঘরে ফিরিয়া প্রথমে খামে মোড়া চিঠিখানা মুঠি করিয়া করতলে ধরিয়া কিছু-ক্ষণ চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। একেবারে খামখানা খুলিয়া ভিতরের অপূর্ব্ব রহস্যটুকুকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলিতে তাহার সাহস হইল না। সে ভাবিল, ভাল খবর নিশ্চয়ই আছে—তবু—!

কাঁচি দিয়া খামের একাংশ সন্তর্পণে কাটিয়া ভিতরের ভাঁজ করা কাগজখানি বাহির করিয়া অশনি টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল। তাহার হাত কাঁপিতেছিল। কিন্তু একি—! লেখা অল্পই; পড়িতে এক মিনিটও সময় লাগিল না। চিঠিখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া অশনি বিছানায় শুইয়া পড়িল। চিঠিতে লেখা—

"অশনি! বিশেষ প্রয়োজনে আমার আজন্মের শত সুখ-দুঃখের স্মৃতিমণ্ডিত প্রিয়তম কাশী ছাড়িয়া আজ দূরান্তরে চলিলাম। জানি না, ভাগ্য আর কখনও দিন আমায় আমার জন্মভূমির কোলে ফিরাইয়া আনিবে কি না! ভাবিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব; উচিতও ছিল তাই, কিন্তু সুবিধা হইল না। খুড়ীমা ভাইয়ের কাছে লাহোরে থাকিবেন, অগত্যা আমারও তাই গতি। জীবনে অনেক অপরাধ তোমার কাছে করিয়া গেলাম। পার ত মাপ করিও। মনে করিও রেবা বলিয়া এ সংসারে কেহ ছিল না। বিদায়—

রেবা।"

রেবা চলিয়া গেল? যাইবার সময় একটা মুখের কথা বলিয়াও গেল না! হৃদয়হীনা নারী! যাহার অশনির সহিত কথা কহিয়া কথা ফুরাইত না, চিঠি লিখিয়া কাগজে কুলাইত না, সেই রেবা এত শীঘ্র এমন পর হইয়া গেল! কি অপরাধ অশনি করিয়াছিল? রেবাকে ভালবাসিয়া সংসারের সকল ক্ষতি অম্লান মুখে সহিতে চাহিয়াছিল, এই না তাহার অপরাধ? কিন্তু এ পলায়নের ত কোন প্রয়োজনই ছিল না! তাহার আদেশই যে অশনির নিকট যথেষ্ট। এতটুকু বিশ্বাসও সে আর রাখিতে পারিল না। অশনির দুই হাতের বদ্ধাঞ্জলি, মুখের কঠোর ভাব, ললাটের কুঞ্চন-রেখা, তাহার অন্তর-যুদ্ধের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছিল। সে মনে মনে বলিল,

এ ঠিক্ হয়েচে! সে পাষাণে প্রাণ সঁপিতে চাহিয়াছিল, এ তাহার যোগ্য প্রতিফল। রেবা তাহার কেহ নয়। রেবা বলিয়া এ সংসারে কেহ তাহার ছিলও না। তবু যুক্তির দুর্ব্বল বাধা ঠেলিয়া অন্তরের দীন ক্রন্দন কেবলি কাঁদিয়া বলিতে থাকে, সেই যে তাহার সব। তাহার জন্য সে যে সকলি ছাড়িতে চাহিয়াছিল! চিরপ্রার্থিত মাতৃক্রোড় হইতে চ্যুত হইতেও সে যে ভয় করে নাই! তবে কেমন করিয়া সে মনে করিবে, সে তাহার কেহ নয়, কেহ ছিলও না? সে তাহার বন্ধু নয়, প্রিয় নয়, সর্ব্বস্ব নয়? অশনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন অশনি তাহার জেঠা-মহাশয়ের পত্রের উত্তরে লিখিয়া দিল, সে দেশে যাইতেছে। আনন্দবাবুর কন্যা কনকলতাকে বিবাহ করিতে তাহার আপত্তি নাই।

(৫)

সুদীর্ঘ দশটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অশনিকান্ত ঘোষাল এখন আর কলেজের ছাত্র নয়। সে এখন একটা মহকুমার ছোট খাটো হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সে ডেপুটি হইয়া দুই তিনটা মহকুমার জলবায়ু-পরীক্ষান্তে সম্প্রতি বদলী হইয়া আরামবাগে আসিয়াছে। সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা। অশনি স্ত্রী-পুত্রদের একদিনও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; তাই জাহাজের বোটের মত তাহারা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া থাকে। অশনির স্ত্রী কনকলতা রূপসী না হইলেও প্রকারান্তরে নামের সার্থকতা দেখাইয়াছিল।. ধনি-কন্যা স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যধিক আদরে বর্দ্ধিত হওয়ায় নিজেকে সংসারের কোন উপকারে লাগিবার উপযোগী করিয়া গড়িতে ত পারেই নাই; বরং সে-ই সম্পূর্ণরূপে সংসারের কাছে উপকার লইতেই শিখিয়াছিল। তাহার উপর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর গুণে তাহার স্বাস্থ্যও ক্রমে খারাপ হইতেছিল। সম্প্রতি সে সন্তান-সম্ভাবিতা। অশনি স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শে বলকারক পথ্য এবং বিজ্ঞাপন দেখিয়া "প্রসূতি-রক্ষক" নানাবিধ 'টনিক' 'পিল' গিলাইয়াও তাহার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ দুর্ব্বল দেহে বল-সঞ্চার করিতে পারিল না। কাশীতে মাতা এবং কলিকাতায় শ্বশুর কনককে লইয়া যাইতে চাহিলে, কেন যে তাহাকে পাঠায় নাই, তাহা ভাবিয়া অশনি এখন মনে মনে নিজের বিবেচনাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতেছিল। এখন আর সময়ও নাই।

ব্যাঘ্র-ভীতি-সঙ্কুল স্থলেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। দুইদিন প্রসব-বেদনা-ভোগে কনক-লতার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছিল। এখানকার একমাত্র শিক্ষিতা ধাত্রীটিও এই সময় পীড়িতা। ডাক্তার কহিলেন, "আর এক উপায় আছে। মিস্ গুহার ধাত্রী বিদ্যা চমৎকার। তিনি ব্যবসাদার ধাত্রী ন'ন বটে, কিন্তু ভারী হাত-যশ। একবার যদি তাঁকে আন্‌তে পারা যেত! তাঁরও শরীর ভাল নয়; কিন্তু দরকারের সময় নিজের অসুখ বিসুখ কিছুই তাঁর মনে থাকে না। তবে ঐ ভারী দোষ!—বা'র করে আনাই কঠিন।"

বিপদের সময় মানাপমান দেখিতে গেলে চলে না। অশনি চটি জুতায় পা গলাইয়া সার্টের বোতাম না আঁটিয়াই ধাত্রীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিল। সে গিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া

যেমন করিয়াই হউক্ তাঁহাকে লইয়া আসিবে। নহিলে কনককে বাঁচান যাইবে না।

মাননীয় অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় অগত্যাই মিস্ গুহকে বাহিরে আসিতে হইল। দশ-বৎসরের পর দেখা। কালের হস্তক্ষেপে আকৃতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তবু পরস্পরকে চিনিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। এ অতর্কিত সাক্ষাতের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না; তাই কিছুক্ষণ দুইজনকেই চুপ করিয়া মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। অশনির প্রয়োজন অধিক; শীঘ্রই সে আত্মস্থ হইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানাইল,—"সদাশয়া মিস্ গুহের অনুগ্রহের উপরেই তাহার জীবন নির্ভর করিতেছে। তাহার স্ত্রীর জীবন-রক্ষা না করিলে, শুধু দুইটা নয়, তিনটা প্রাণীরই মৃত্যুর সম্ভাবনা। রেবার মনে পড়িল, আর একদিন অশনি তাহার কাছে এমনি করিয়াই কাতর প্রার্থনায় জীবন-ভিক্ষা চাহিয়াছিল;— বলিয়াছিল, "তুমি ত্যাগ কর্‌লে আমি বাঁচ্‌ব না।" সে অগ্রসর হইয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "ঈশ্বরকে জানান্;—আমার দ্বারা চেষ্টার কোনও ত্রুটী হ'বে না।—চলুন্।"

(৬)

সারা রাত্রি অত্যন্ত গোলমালের পর সকালের দিকে বাড়ীখানা ঘুমন্ত পুরীর মত একেবারেই নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রসূতির খবর পাইয়া অশনির মা এবং কনকলতার বাপ্ আগের রাত্রেই আসিয়া পৌছাইয়াছেন। ছেলেমেয়েগুলির ঝঞ্ঝাট পোহানয় মুক্তি পাইয়া অশনি হাঁপ্ ফেলিয়া বাঁচিয়াছে।

দারুণ কষ্ট ভোগের পর মৃত পুত্র প্রসব করিয়া রক্তহীন কনকের জীবনী-শক্তি আরো ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ডাক্তার কহিলেন, "কৃত্রিম উপায়ে অন্যের দেহ হইতে রোগীর দেহে রক্ত-প্রদান ভিন্ন রক্ষার উপায় নাই।" শাশুড়ী, স্বামী এবং বুড়া বাপ্ প্রমাদ গণিলেন। যথেষ্ট পুরস্কার প্রতিশ্রুত হইয়াও অশনি রক্ত দিবার লোক সংগ্রহ করিতে পারিল না। বাপ্‌রে! পয়সার জন্যে গায়ের রক্ত দেওয়া যায়! অশনি যুবপুরুষ দেহও সুস্থ, কিন্তু কাটা-ফোঁড়ায় তাহার বড় ভয়। ডাক্তারকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য কোন উপায় নাই?" ডাক্তার কহিলেন, "না।" সময় চলিয়া যাইতে লাগিল। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রেবা কহিল, "ডাক্তারবাবু, আপ্‌নি প্রস্তুত হোন্। আর দেরী হলে ওঁকে রাখ্‌তে পার্‌বেন না। রক্ত আমি দেব।"

অশনি ক্ষোদিত-মূর্ত্তির মত চাহিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, "মিস্ গুহ, আমায় মাপ্ কর। তোমায় আমি নিজের মেয়ের মত মনে করি। তোমার প্রাণ যে কত দরকারী তা আমি জানি। তোমার যা শরীর, তাতে যে পরিশ্রম তুমি পরের জন্যে কর, তাই ঢের—।"

রেবা বাধা দিয়া কহিল, "ওঁকে বাঁচাতেই হ'বে, আমি কথা দিয়েচি। ডাক্তারবাবু, আপ্‌নার পায়ে পড়ি—আমার চেষ্টার ক্রটিতে যেন দুর্ঘটনা না হয়। আমার সত্য রক্ষা কর্‌তে দিন।"

অনেক বাত-বিতণ্ডার পর রেবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া অগত্যাই ডাক্তারকে সম্মত হইতে হইল। সঙ্কশীলা রেবা শান্তভাবে

ডাক্তারের অস্ত্রোপচারে আত্মসমর্পণ করিলে, অশনি কক্ষ হইতে পলাইয়া গেল। মা বাহিরে "হরির তলায়" মাথা কুটিয়া সেই অনাচারদুষ্টা অসমসাহসীক-নারীর সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যথেষ্ট জরিমানা "মানস" করিয়া দেবতার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারের অনুমান ভুল হয় নাই। নূতন শোণিত-সংগ্রহে কনকের জীবনের আশা ফিরিয়া আসিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে অনেকখানি সুস্থ হইয়া উঠিল।

ডাক্তারের আদেশে রেবা এখনও বিছানা ছাড়িয়া উঠা-বসা করিতে পায় না। ডান হাতের যে শিরা ছেদন করিয়া রক্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ক্ষত পূরিয়া আসিয়াছে। দুর্ব্বলতা এখনও সারে নাই। মা ছেলেপুলে, রোগী এবং সংসারের ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া অবসর পাইলেই রেবার কাছে আসিয়া বসেন। কখনও তাহার গায়ে মাথায় স্নেহের হাত বুলাইয়া দিয়া বলেন, "আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর্, আর কখনও এমন দুঃসাহসের কাজ করবি না। বাবা! ধন্যি মেয়ে তুই! বাছা, মনে কল্লেও গা শিউরে ওঠে। রেবা তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসে। রেবা বাড়ী যাইতে চাহিলে অশনির মা কহিলেন, "তাকি হয়? আগে ভাল করে সেরে ওঠ্। যে তোর শরীরে যত্ন বাছা! বাড়ীতে কেবা দেখ্বে, কেবা যত্ন কর্বে? খুড়ীটিও ত নেই! তাই ত বলি বিয়ে কল্লে এদ্দিনে এক ঘর ছেলে পুলে হোত! কি যে ধিঙ্গি হয়ে রইলি! এখানে ত আর জলে পড়িস্ নি! এও তো তোর নিজের ঘর।"

অশনির মার মুখের পানে চাহিয়া রেবার আবার অতীত জীবন মনে পড়িতেছিল। সেই অনাবিল আনন্দের নির্ঝর সুদূর অতীতে! কি মধুর তাহার স্মৃতি! রেবার জীবনে তেমন দিন আর আসিবে না। মনে পড়ে, অশনির সহিত একত্র খেলাধূলা—একত্র বিদ্যাশিক্ষা—মায়ের কোল-মায়ের স্নেহ! একবৃন্তে, ভিন্নজাতি দুইটি ফুল কি শোভনীয় মাধুর্য্যেই তাহারা ফুটিয়াছিল! সে সব সুখের কথা এখন স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়।

দুপুরবেলা একা বিছনায় পড়িয়া রেবার কর্ম্মহীন দীর্ঘ দিন কিছুতেই আজ যেন আর কাটিতেছিল না। হয়ত, কনক এখন একা বিছানায় পড়িয়া তাহারই মত এ-পাশ ও-পাশ করিয়া দিন কাটাইতেছে! অশনি এ সময় কাছারীতে বদ্ধ থাকে, তাই কনকের ঘরে যাইবার অদম্য লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। চলিতে এখনও পা টলিতেছিল, তবুও সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। মা অশনির ছেলে-মেয়েদের লইয়া বারাণ্ডায় মাদুর বিছাইয়া ঘুমাইয়াছেন। উঠানে শ্যামার মা বাসন মাজিতেছিল, অন্য ঝি-চাকরেরা দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের আশায় কে কোথায় গিয়াছে!

কনকের ঘরে যাইতে গিয়া সহসা অশনির কণ্ঠ-স্বরে বাধা পাইয়া রেবা বাহিরেই দাঁড়াইয়া পড়িল। কাজ বেশী না থাকায় অশনি সে-দিন হাঁটিয়াই সকাল সকাল বাড়ী আসিয়াছে। তাই রেবা তাহার ফিরিয়া আসার খবর জানিতে পারে নাই। রেবা শুনিল,

অশনি বলিতেছিল, "মা বুঝি, গল্প কর্‌বার আর লোক পান্ নি!—ও একটা ছোটবেলার পাগ্‌লামী! এখন মনে হলেই ভয় হয়। কি রক্ষেই পাওয়া গেছে!" স্বামীর আদরে গলিয়া কনক আদরের সুরে কহিল, "রক্ষেটা কিসের? অমন সুন্দরী, বিদ্বান্, কত সেবা-যত্ন জানে!" পত্নীর রুক্ষচুলের গোছা ধরিয়া, আদর করিয়া অশনি কহিল, "থামুন পাদ্‌রী-মশাই। আর বক্তৃতা দিতে হবে না। জান ত হিঁদুর বিয়ে এক জন্মের নয়! তুমিই যখন আমার জন্ম-জন্মান্তরের স্ত্রী, তখন মুখ্যই হও, আর কুচ্ছিৎই হও, তোমায় যে আমায় পেতেই হোত! ও আমার কে? কেউ না—।"

রেবা নিঃশব্দে আপনার নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিল। বুঝি, এত দিন এই কথা শুনিবার জন্যই মন তাহার মনের ভিতর তৃষিত হইয়াছিল। অশনির মঙ্গল কামনায় সে তাহার আত্মবিসর্জ্জনের মূল্যে যথার্থই অশনির মঙ্গল ক্রয় করিতে পারিয়াছে কি না—এ সন্দেহের অনুতাপ দশবৎসর ধরিয়া তাহার বুকে তুষানলের মতই ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিয়াছে। কতদিন মনে হইয়াছে, হয় ত হৃদয়ের সে গভীর ক্ষত কালেও মিলাইতে পারে নাই। না; সে ক্ষত ত নাই-ই; শুধু সামান্য আঁচড়ের দাগমাত্র। সে তাহার প্রিয়তমের দুঃখের হেতু নয়;—তাঁহাকে মাতৃক্রোড়, আজন্মের বিশ্বাস, সমাজ, পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম হইতে নিজের স্বার্থের সুখের মধ্যে না টানিয়া আনিয়া ভালই করিয়াছে।

রেবা মাটিতে বসিয়া দুই হাত যোড় করিয়া ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধায় ভূমে লুটাইয়া প্রণাম করিল।—"প্রভু! স্বামী! পিতা! শুধু তাঁকে নয়, আমাকেও তুমি রক্ষা করেছ!—তোমার করুণাময় নাম সত্য!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

দুর্দ্দিনে

[১]

আঘাত কর আঘাত কর
অমোঘ রাজ-দণ্ডে;
প্রখর তব শাসনে যেন
সকল দোষ খণ্ডে।
নিরাশা যাক্ বাতাসে ঘুচি,
ধুইয়া হিয়া লহ গো মুছি,
পোড়ায়ে মোরে করহ শুচি
পাবক-হোম-কুণ্ডে।

বেদনা-মাখা সাধনা তব
জেনেছি আমি মর্ম্মে;
বেদনা-পথে সাজিব নব
বেদনা-সহা বর্ম্মে।
কখনো যদি বেদনা পাকে
পরাণ মম কাঁদিতে থাকে,
নয়ন-বারি লইব ভরি
মরম-হেম-ভাণ্ডে।

[২]

যেমন ধারা বহিছে ঝড়্
গগনে,
তেমনি তর নৃত্য কর
এ মনে।
জমাট যত আঁধার-আলো,
হাওয়ার তালে উড়িয়ে চলো,
বিজলী-বোনা আলোক ঢালো
নয়নে।
গরজি মেঘ জাগায়ে দি'ক্
বেদনা;
বাদল-ধারে ধৌত কর
সাধনা।
যা'কিছু আমি গড়েছি বসে,
সকল যাক্ নিমেষে ধসে,
তোমার বাজ পড়ুক্ খসে'
চেতনে।

[৩]

আজ্ যে তোরে শুধ্‌তে হবে
আনন্দেরি দেনা;
তরল হাসির গরল দিয়ে
হয়েছে যা কেনা!
জীবন-বীণা লয়ে করে
কি গাহিলি জীবন ভরে?
চপল গানের উতাল স্বরে
জীবন কি যায় চেনা?
হাস্‌লি যত ক্ষিপ্ত হাসি
অকারণের গানে,
সে-সকল আজ যাবে ভাসি
ব্যথার বিপুল টানে।
আমোদ-প্রমোদ হয়ে তরল
রচে তোরই নয়নের জল,
সেই জলে সব যৌবন-মল
এবার ধুয়ে নে না!

দরবেশ

সংবাদ।

১। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।—এই বৎসর নিম্নলিখিত বালিকাগণ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—

প্রথম বিভাগ।

লীলা বসু—ডাওসেসন, মবেল ক্যাথারিন—ঐ, গীতা চট্টো—ঐ, চন্দ্রমুখী সিংহ—গার্ডেন মেমোরিয়াল, মালতীমালা সরকার—ঐ, শেফালিকা রায়—ব্রাহ্মবালিকা স্কুল, ফুলবালা গুপ্ত—ঐ, সুধীরবালা গুহ—ঐ, কনকলতা খাস্তগিরি—ঐ, সুবোধবালা রায়—বেথুন, সুধা চট্টো—ঐ, মণিকা চট্টো ঐ, প্রীতি দাস—ঐ, চপলা দেবী—ডাক্তার খাস্তগিরি বালিকা বিদ্যালয়, প্রমীলা ঘোষ—ছোটনাগপুর গার্লস স্কুল, সুমতি দত্ত—ঐ, সুপ্রভা কর—কটক রাভেন্সা, প্রীতিকণা দাস—ঐ, অমিয়া পাল—বাঁকিপুর বালিকা, সুমতিবালা দাস—ঢাকা বালিকা, নিখিলবালা গুপ্তা—ঐ, গৌরীপ্রভা দুয়ারা—ছোটনাগপুর বালিকা, স্নেহপ্রভা সরকার—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা, প্রেমমালা সিংহ—ঐ, অমিয়া বিশ্বাস—ঐ, সুনীতিবালা রায়—ঐ, কুলবালা সরকার—ঐ, শুদ্ধকণা চক্রবর্ত্তী—ছোটনাগপুর বালিকা, সুধা দত্ত—দার্জ্জিলিং মহারাণী হাই স্কুল, লাবণ্যপ্রভা বসু—ঐ, সুষমা সিংহ—বহরমপুর প্রাইভেট, শান্তিময়ী দাসী—ছোটনাগপুর বালিকা, লাবণ্য বন্দ্যো—ঐ, চিরপ্রভা বসু—ঐ, সীতা সরকার—বেথুন, সুষমা চক্রবর্ত্তী—বাঁকিপুর বালিকা, প্রীতিলতা গুহ মল্লিক—ঐ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

সুশীলাবালা মুখো—ডাওসেসন, ভিক্টোরিয়া মবেলসেন—ঐ, রামা জুদা—ঐ, সেরা এইনি—ঐ, সরোজ চক্রবর্ত্তী—গার্ডেন মেমোরিয়াল,

হৈবু মমিন—ইউনাইটেড মিশনরী, প্রেমবালা সাহা—ঐ, সরোজিনী বসু—ঐ, সুষমা দত্ত—ব্রাহ্মবালিকা, মনোরমা রায়—ঐ, সরলা সাধুর্খা—ঐ, নীহারিকা মল্লিক—ঐ, মীরা চট্টো—ঐ, সুশীলা সাধুর্খা—ঐ, শোভনা নন্দী—ঐ; জ্যোৎস্না সেন—প্রাইভেট; লাবণ্য-প্রভা দে—সি, এম, এস ; শান্তিলতা চৌধুরী—মহারাণী হাইস্কুল দার্জিলিং ; প্রিয়বালা সলোমন—ইউ এফ্ সি হাই, শশিকলা সিংহ—ঐ; মৃন্ময়ী রায়—প্রাইভেট; কমলকামিনী রায়—রাভেন্সা কটক; সৌভাগিনী দাস—ঐ, লিলি দাস—ঐ ; শৈলবালা রাউথ—ঐ; মা টোনমে—শিক্ষয়িত্রী ; শিশিরকুমারী সেন—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা, সুমতিবালা রায়—ঐ, লীলাবতী ঘোষ—ঐ ; লীলাময়ী চক্রবর্ত্তী—প্রাইভেট ; মাধুরীলতা চৌধুরী—মহারাণী হাই দার্জিলিং, স্নেহলতিকা হালদার—ঐ ; উৎস ঘোষ—ছোটনাগপুর বালিকা ; বিধান মজুমদার—ভিক্‌টোরিয়া ইন্, কলিকাতা।

তৃতীয় বিভাগ।

প্রতিভাবালা দাস—সি, এম্, এস্।
নলিনীবালা জোন্স—গার্ডেন মেমোরিয়াল্।
স্নেহলতা সামন্ত— ঐ
স্মিতমুখী চক্রবর্ত্তী— ঐ

২। ইংরাজ মহিলাগণ পুরুষদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষদিগকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিবার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। সম্প্রতি ভারতের গবর্ণর জেনারেলের ও বাণিজ্য-মন্ত্রীর কন্যাদ্বয় শিম্‌লা-পর্ব্বতে কেরাণীর কর্ম্ম শিখিতেছেন।

৩। ল্যাণ্ডন রোণাল্ড্-নামক ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রবিবাবুর কতকগুলি কবিতায় স্বর-সংযুক্ত করিয়া সঙ্গীতের আকারে প্রকাশ করিতেছেন।

৪। ১৯১৮ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ঐ সালের ৪ঠা মার্চ্চ, ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা ১২ই মার্চ্চ এবং বি-এ ও বি এস্-সি পরীক্ষা ৪ঠা এপ্রিল আরম্ভ হইবে।

৫। ইংলিশম্যানে প্রকাশ, গত সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্চাশ জন আবদ্ধ বাঙ্গালী যুবক স্ব স্ব বাটীতে থাকিবার আদেশ পাইয়াছে।

৬। টিকারির মহারাজকুমার বাঁকিপুরে ভারতীয় বালিকাদের বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত কলেজ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৩ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ৫ হইতে ১৮ বৎসরের বালিকাদের পর্দ্দার মধ্যে থাকিয়া পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে।

তপস্যা।

(২)

মধুমতী-তীরে কমলাপুর একখানি গণ্ডগ্রাম গ্রামে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস আছে। তন্মধ্যে হরনাথ রায় একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। হরনাথবাবু অতিশয় ধার্ম্মিক এবং নিষ্ঠাবান্ কায়স্থ। তিনি কোনও আফিসের চাকুরে নহেন। তাঁহার কিছু জায়গা-জমী ছিল ; তদ্দ্বারাই তাঁহার বেশ সচ্ছলে চলিয়া যাইত। পরের দাসত্ব তাঁহাকে করিতে হইত না। বিলাসিতাই মানবের অভাবের সৃষ্টি করিয়া দেয়। হরনাথবাবুর সে-সকল কিছুই ছিল না। কাজেই, তিনি নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। পত্নী রাজলক্ষ্মী ভিন্ন তাঁহার পরিবার-মধ্যে আর কেহ ছিল না। এই দম্পতী পরোপকার জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পরের কার্য্য ভিন্ন কখনও তাঁহারা অলসভাবে গৃহে অবস্থান করিতেন না। গ্রামের লোকের যাহার যখন যে কার্য্যের আবশ্যকতা হইত হরনাথবাবু তৎক্ষণাৎ সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতেন। কোথায় কাহার ছেলে পীড়িত, ডাক্তার ডাকিবার লোকাভাব, হরনাথবাবু অবিলম্বে ডাক্তার ডাকিয়া আনিতেন। কাহারও বাড়ীতে মৃত দেহ পড়িয়া আছে, সৎকার করিবার লোক

নাই, হরনাথবাবু তাহাকে বহিয়া লইয়া সৎকার করিয়া আসিতেন। কেহ বা রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই ; হরনাথবাবু রোগীর নিকটে বসিয়া দিবানিশি অক্লান্তভাবে তাহার শুশ্রূষা করিতেন। আবার কোনও প্রতিবেশীর হাট-বাজার করিয়া দিবার আবশ্যক হইলে, তাহাও করিয়া দিতেন। কোনও প্রতিবেশীর লাউ-মাচা, পুঁইমাচা বাঁধিতে হইবে ; সেখানেও হরনাথবাবু কোমরে গামছা বাঁধিয়া কাটারি লইয়া উৎসাহের সহিত বাঁশ-বাঁখারি কাটিতে লাগিয়া যান। পাঠিকা-ভগ্নীগণ, হয় ত, একথা শ্রবণ করিয়া হাস্য-সংবরণ করিতে পারিবেন না ; বলিবেন, "বাবুতে আবার কে কবে বাঁশ কাটে? মাচা বাঁধে? বাবু লোক ত 'পাম্পসু' পায়ে দিয়া, চুড়িদার গায়ে দিয়া, চুরুট-বার্ডশাইয়ের ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে গার্ডেনপার্টি জম-জমা করিবেন অথবা মুক্ত আকাশ-তলে বায়ু-সেবন করিবেন, কিম্বা ক্লাবে বসিয়া খোষগল্প অথবা থিয়েটারের 'রিহার্সেল' দিবেন। ইহাই এখনকার বাজারে "বাবু"-দিগের কার্য্য—। তাহা না হইয়া মাথায় উড়ানী বাঁধিয়া, চটী জুতা পায়ে দিয়া, তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, পায়ে এক পা ধূলা মাখিয়া ডাক্তার ডাকিতে যায়, কোমরে গামছা জড়াইয়া বাঁশ কাটে, মাচা বাঁধে! সে বুঝি তোমার বাবু? আরে ছ্যাঃ—।" কিন্তু যাহা সত্য, তাহার অপলাপ করা নীতিবিরুদ্ধ। সদ্বংশজাত, ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান্ কায়স্থ-সন্তান যদি আপনাদের নিকটে বাবু-নামধারীর অযোগ্য হয়েন, তাহা হইলে আপনাদের যাহা অভিরুচি তাহাই বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করিবেন। আমরা কিন্তু তাঁহাকে বাবুই বলিব। এই সকল গুণ ছাড়া হরনাথবাবুর আর একটি মহাগুণ ছিল। তিনি সকল লোকেরই হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারিতেন। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইত। ভ্রাতায় ভ্রাতায় দ্বন্দ্ব, শরিকে শরিকে বিবাদের তিনি মীমাংসা করিয়া দিলেই মিটিয়া যাইত। এইজন্য কমলাপুর-গ্রামবাসিগণের অর্থ উকিল, ব্যারিষ্টার-দিগের উদর-পূর্ত্তি না করিয়া, দেশের অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইত। হরনাথবাবু ব্যতীত গ্রামবাসিগণের এক মুহূর্ত্তও চলিত না। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, তিনি সকলেরই বন্ধু। বৃদ্ধেরা পরামর্শ-গ্রহণের জন্য, যুবকেরা উপদেশ-গ্রহণের জন্য এবং বালক-বালিকারা আদর-প্রাপ্তি ও গল্প-শ্রবণের নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার গৃহে যাতায়াত করিত। গৃহিণী রাজলক্ষ্মীও পতির উপযুক্তা পত্নী ; পরোপকারে তিনিও সিদ্ধহস্তা! কোনও বুভুক্ষু অতিথি কোনও দিন তাঁহার গৃহ হইতে অমনি ফিরিত না। তিনি নিজের আহার্য্য দান করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন। কেহ কোনও দ্রব্যের জন্য তাঁহার নিকটে আসিলে, কদাচ সে রিক্ত-হস্তে ফিরিয়া যাইত না। গরিব-দুঃখীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ দয়া।

পাড়ায় স্বজাতীয়ের বাটী নিমন্ত্রণ হইলে আগে রাজলক্ষ্মীর ডাক্ পড়িত। তিনি রন্ধনশালায় গিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে অতিপরিপাটিরূপে পঞ্চাশ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ফেলিতেন। কোমরে অঞ্চলটি জড়াইয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া সেই অন্ন-ব্যঞ্জন যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির পাতে তিনি পরিবেশন করিতেন, তখন তাঁহাকে যথার্থই অন্নপূর্ণার ন্যায় মনে হইত। তাঁহার প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া সকলেই প্রশংসা করিত। গ্রামের মধ্যে তাঁহার এইটী সুখ্যাতি ছিল। সহর অঞ্চলে এখন এ নিয়ম নাই। কিন্তু পল্লী-গ্রামে এখনও প্রচলিত আছে যে, দশজনকে নিমন্ত্রণ করিলে বাড়ীর মেয়েরাই রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। আমাদের এখনকার ভগ্নীগণের মধ্যে, হয় ত, রন্ধনশালায় গেলে অনেকেরই মাথা ধরিয়া উঠে, এবং রন্ধন-কার্য্যকে তাহারা অতিহেয় কার্য্য মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী তাহা মনে করিতেন না। বরং তিনি ইহাতে আনন্দিতা হইতেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অতিথি-অভ্যাগতকে

ভোজন করান, তিনি গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। এই প্রকার তাঁহাদের বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত হইত ; অভাব অশান্তি কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা আদৌ জানিতেন না। কিন্তু একটি বিষয়ে যথার্থই তাঁহারা বড় দুঃখিত ছিলেন। এই প্রৌঢ় দম্পতী নিঃসন্তান ছিলেন। অপত্য-মুখ-দর্শনে তাঁহারা বঞ্চিত। এজন্য যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-অনুষ্ঠানের এবং ঠাকুর-দেবতার ধরণা দেওয়া, কোন বিষয়েরই ত্রুটি হয় নাই। তথাপি কি জানি, কোন দেবতা এই দম্পতীর প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়া সন্তান প্রদান করেন নাই। কিন্তু বহুদিবস পরে বহু তপস্যার ফলে তাঁহাদের এ আক্ষেপ দূর হইল। "আতুড় ঘর আলো" করিয়া একটি "চাঁদ-পানা" ছেলে রাজলক্ষ্মীর অঙ্ক শোভিত করিল। পতি-পত্নীর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

(৩)

বিধাতার খেলা ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধির অগোচর। নিয়তি চক্রের নিষ্পেষণে মানব নিয়ত নিষ্পেষিত হইতেছে। মানবের ইচ্ছা-শক্তি সকল সময়ে কার্য্যকরী হইতে পারে না। মানুষ ভাবে এক, হয় আর। হায় মানব! 'আমি করিয়াছি', 'আমি করিব', বলিয়া তুমি কিসের দম্ভ করিয়া থাক! জান না, কাল তোমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তোমাকে নিয়ত চালিত করিতেছে? অপুত্রক দম্পতী পুত্র লাভ করিয়া অন্ধের চক্ষু-লাভের ন্যায় বড়ই আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন! হরনাথবাবু বড় ঘটা করিয়া ছয় মাসে পুত্রের অন্নপ্রাসন দিলেন। শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় শিশুটী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আধ আধ ভাষায় যখন "মা মা," "বা বা" বলিয়া সে ডাকিত, তখন তাঁহারা মনে করিতেন, "সংসারে এই ত চরম সুখ! আর সুখ কোথায়? হায়! তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এই সুখের মধ্যে অচিরে একখানা যবনিকা পতিত হইবে! যখন এইরূপ আনন্দে তাঁহাদের দিন কাটিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন রাজলক্ষ্মী জ্বরাক্রান্তা হইলেন। সেই জ্বরই তাঁহার কাল হইল। সে জ্বরের হাত হইতে আর তিনি মুক্তি-লাভ করিতে পারিলেন না। অনেক ঔষধ-পত্র খাইয়া জ্বর কয়েকটী দিনের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু পথ্য পাইবার পূর্ব্বেই আবার জ্বর দেখা দিল। পুনঃ পুনঃ তিনি এইরূপে জ্বর-ভোগ করিতে লাগিলেন। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হইল না। দেশের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক তিনিই রাজ-লক্ষ্মীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। রাজলক্ষ্মীর পীড়ার কোনও উপশম হইল না।

হরনাথবাবু পরের চাকুরি কখনও করেন নাই; জমা-জমীর আয়েই তাহার ক্ষুদ্র সংসার চলিয়া যাইত। আর্থিক সংস্থান তাঁহার অধিক ছিল না। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। দুই-একখানি জমীও বন্ধক পড়িল। কিন্তু রাজলক্ষ্মী এ বিষয়ের কিছুই জানিতে পারিলেন না। একদিন তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি যে আমার জন্যে এত ওষুধ-পত্তর কিনৃছ, মুটো মুটো টাকা দিয়ে ডাক্তার আনৃছ, এত টাকা কোথায় পাচ্ছ? আমার জন্যে শেষে ঋণগ্রস্ত হবে নাকি?" এ কথার উত্তরে হরনাথবাবু বলিয়াছিলেন, "কেন? তুমি কি আমাকে এতই গরিব ঠাওরালে না-কি? আমার কি এমন সংস্থান নেই যে তোমাকে ডাক্তার দেখাই?" রাজলক্ষ্মী অপ্রতিভ হইলেন, সেই হইতে তিনি আর কোন কথা বলিতেন না।

ক্রমান্বয়ে ভুগিয়া ভুগিয়া রাজলক্ষ্মীর দেহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এ সংসারের তাঁহাকে আর অধিকদিন থাকিতে হইবে না! বুঝিলেন, ভগবানের ডাক পড়িয়াছে, যাইতেই হইবে। প্রায় বৎসরাধিক তিনি এইরূপ পীড়ায় ভুগিতে লাগিলেন;—বহু চিকিৎসায়ও কোন ফলোদয় হইল না।

দিন দিন অবস্থা খারাপ দাঁড়াইতে লাগিল। একদিন ডাক্তার আসিয়া নাড়ী টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আমি ত এঁর কিছু করে উঠ্‌তে পাচ্ছি না, যদি আর কা'কেও দেখাতে ইচ্ছা করেন, দেখান!"

দেশের মধ্যে তিনিই প্রধান চিকিৎসক। তাঁহার মুখের এ কথা শুনিয়া হরনাথবাবুর বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। তিনি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আর জীবনের আশা নেই? আরাম কর্‌তে পার্ব্বেন না?"

চিকিৎসক দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "কি কোর্ব্বো, বলুন? আমার সাধ্য মত আমি ত্রুটী করি নি। আমরা রোগ আরাম কর্‌তে পারি, কিন্তু পরমায়ু ত দিতে পারি না!"

হর। তবে আর অন্য ডাক্তার দেখাবার কথা বল্‌ছেন কেন?

ডাক্তার। এর পরে আপনার মনে না আক্ষেপ থাকে, তাই এ কথা বল্‌ছি। আমি ত অবস্থা ভাল ব'লে বুঝ্‌ছি না।

"আপনি না ভাল কর্‌তে পার্লে আর কে পার্ব্বে?" এই বলিয়া হরনাথবাবু হতাশ ভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তারবাবু একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "দেখুন, এক কাজ করুন। কিছু দিনের জন্য 'চেঞ্জে' নিয়ে যান। তাতে উপকার হলেও হতে পারে। দুটো একটা এ-রকম রোগীকে 'চেঞ্জে' গিয়ে সেরে উঠ্‌তে আমি দেখেছি।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে হরনাথবাবু ভাবিয়া চিন্তিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইবারই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাজলক্ষ্মী তাহা শুনিয়া নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "আর কেন? এখন যে কটা দিন বেঁচে থাকি, এখানেই থাক্‌ব। ঘর ছেড়ে কখনও কোথাও যাই নি, এ সময় আর যাব না। আমার মধুমতী ছেড়ে আমি গঙ্গা-যমুনা কিছুই চাই না! আমি আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার ডাক্ পড়েছে; আমায় যেতে হবে। মৃত্যুতে আর আমার কোন আক্ষেপ নেই। আমি জীবনে যত সুখ ভোগ করিছি, খুব কম স্ত্রীলোকেই এ রকম সুখ ভোগ কর্‌তে পায়! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, লোকে যেন আমার মতন স্বামী-সোহাগিনী হতে পারে। এক দুঃখ ছিল—ছেলে হয় নি। তা' ভগবান্ সে আক্ষেপও দূর করেছেন। এখন তোমার পায়ে মাথা রেখে মর্‌তে পার্লেই হয়। আমাকে পায়ের ধূল দাও—আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্ম তোমার স্ত্রী হতে পাই। সুধীরকে দেখ। এখন হ'তে তুমিই তার মা-বাপ দুই-ই।" পত্নীর কথা শুনিয়া হরনাথবাবু চক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

উক্ত-ঘটনার এক দিবস পরে একদিন সায়ংকালে প্রেমময় পতি, শিশুপুত্র, গৃহ-পরিজন—সকলের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, পতি-পুত্রকে কাঁদাইয়া সতীলক্ষ্মী অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। হরনাথবাবু পত্নীর মৃত্যুশয্যায় পতিত হইয়া বালকের ন্যায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিবর্গ বহুযত্নেও তাঁহাকে সান্ত্বনা-প্রদানে সমর্থ হইল না।

প্রতিবেশীরা শবদেহ-সংকারের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিল। হরনাথবাবু প্রিয়তমা পত্নী গৃহলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মীর দেহ মধুমতী-তীরে ভস্মসাৎ করিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি শূন্যহস্তে শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সব ফুরাইল! হায়! আজি গৃহ তাঁহার পক্ষে শ্মশান-তুল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একমাত্র স্নেহময়ী প্রেমময়ী পত্নীর অভাবে আজি সমস্ত অন্ধকার! সব যেন হাহাকার করিতেছে! তিনি গৃহে আসিয়া যাহা দেখেন, তাহাতেই রাজলক্ষ্মীর স্মৃতি জড়িত দেখিতে পান। আজি যেন তাঁহার জগৎ-সংসার রাজলক্ষ্মীময় হইয়াছে! কই যখন রাজলক্ষ্মী জীবিতা ছিলেন, তখন ত এ প্রকার হইত না! বন্ধুগণ তাঁহার নিকটে বসিয়া প্রবোধবাক্য দান করিতে লাগিলেন। চিরদিন তিনি লোকের রোগে শুশ্রূষা,

শোকে সান্ত্বনা-প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, আজি তাঁহার সেই দুর্দ্দিন উপস্থিত; উপকৃত ব্যক্তিগণ কিরূপে আজি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে?

রজনী প্রভাত হইল, আবার দিবাসুন্দরী দেখা দিল! দিন যায় অবার দিন আসে; মানুষ যায় আর ফিরিয়া আসে না। রাজলক্ষ্মীহীন গৃহে হরনাথবাবুর একটী দিবস অতিবাহিত হইল। প্রভাতে রোরুদ্যমান পুত্র সুধীর আসিয়া পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। হরনাথবাবু সুধীরকে দেখিয়া চমকিত হইলেন। তিনি শোকে এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, সুধীরের কথা তাঁহার স্মরণই ছিল না। সুধীরকে একজন প্রতিবেশী লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সুধীর গৃহে যাইবার জন্য অত্যন্ত বায়না করায়, প্রভাত হইতেই তিনি সুধীরকে তাহার পিতার নিকট দিয়া গেলেন। সুধীরকে দেখিয়া হরনাথবাবুর রাজলক্ষ্মীর সেই কথাটী মনে পড়িয়া গেল।—"সুধীরকে দেখ, এখন থেকে তুমিই তার মা-বাপ, দুইই।" আর তিনি কেমন করিয়া সেই সুধীরকে ছাড়িয়া এক রাত্রি যাপন করিলেন? মাতা হইলে কি পারিতেন? হরনাথবাবু নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া রোরুদ্যমান সুধীরকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। বুঝি, ইহাতে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। সুধীরও পিতাকে দেখিয়া, পিতার কোল পাইয়া, কান্না-কাটা ভুলিয়া গেল।

(৪)

যখন রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হয়, তখন সুধীরের বয়ঃক্রম চারিবৎসর মাত্র। চারিবৎসরের শিশুসন্তানটি লইয়া হরনাথবাবু একাকী সংসার-স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। যখন রাজলক্ষ্মী জীবিতা ছিলেন, তখন হরনাথবাবুকে কিছুই দেখিতে হইত না। তিনি পরের কার্য্য লইয়া বাহিরে বাহিরেই অবস্থান করিতেন। কিন্তু এখন হইতে তাঁহাকে প্রত্যেক কাজটী স্বহস্তে করিতে হইত। তাঁহার এমন অবস্থা নহে যে, দাস-দাসী রাখিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করাইবেন! তদুপরি রাজলক্ষ্মীর পীড়া-হেতু কিছু ঋণও হইয়াছিল, দুই-একখানি জমীও বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। বাকি কিঞ্চিৎ সম্পত্তি যাহা ছিল তদ্দ্বারা পিতাপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইতে লাগিল। পরের চাকুরি তিনি কখনও করেন নাই,—আর এ বয়সে পরের দাসত্ব করায় তাঁহার ইচ্ছাও ছিল না। বিশেষতঃ সুধীরকে লইয়া এখন তাঁহার একপদ অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। তিনি এখন বাস্তবিকই একাধারে সুধীরের মাতাপিতা দুই-ই। সুধীরকে তেল মাখান, ভাত খাওয়ান হইতে "ঘুমপাড়ানি-মাসী"র গান গাহিয়া ঘুম পাড়ান পর্য্যন্ত তাঁহাকেই করিতে হয়। এখন একমাত্র সুধীরই তাঁহার সংসারের অবলম্বন। শোকে শান্তি, দুঃখে সহানুভূতি, কার্য্যে সহায়—সবই এখন তাঁহার সুধীর! যখন তিনি সংসারের কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেন, সুধীর তখন তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দিত, বাতাস করিত, ঘামাচি খুঁটিত, আবার কখনও বা তাহার কচি কচি কোমল হাত-দু'টি দিয়া তাঁহার পা টিপিয়া দিত। যখন তাঁহার রাজলক্ষ্মীর স্মৃতি হৃদয়ের মধ্যে উদিত

হইয়া হৃদয়কে কূলে কূলে ছাপাইয়া, নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহির্গত করিত, সুধীর তখন তাহা দেখিলে ছুটিয়া আসিয়া তাহার নবনীত-তুল্য হাত-দুইখানি দিয়া পিতার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা, তোমাল চ'খে কি পলেচে বাবা?" হরনাথ বাবু তখন সকল দুঃখ, বিস্মৃত হইয়া সুধীরকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মুখ-চুম্বন করিতেন। আবার যখন তিনি রন্ধন-শালায় বসিয়া রন্ধন করিতেন, সুধীর তখন তাঁহার ইন্ধন যোগাইয়া দিত; জলের ঘটিটী, পীড়িখানি আনিয়া পিতাকে প্রদান করিত। এইরূপে পিতা-পুত্রের দিন কাটিতে লাগিল।

একবার সুধীরের বড় কঠিন পীড়া হইল জীবনের আশা ছিল না। প্রতিবেশীরা ভাবিল, বুঝি, মায়ের কোলের ছেলে মা কোলে তুলিয়া লইবেন। হরনাথবাবু আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সুধীরের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তত যত্ন, তেমন শুশ্রূষা বুঝি মাতাও করিতে পারেন না! সন্তানবৎসল পিতার স্নেহ-যত্নের বিরাম ছিল না। তিনি সুধীরের আরোগ্য-কামনায় স্ত্রীলোকের ন্যায় কত দেবতার পদে মাথা কুটিতেন, কত হরির লুট মানিতেন। দেবতারা তাঁর সে কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। সুধীর আরোগ্য-লাভ করিল। হরনাথবাবু কৃতজ্ঞতার অশ্রু মুছিতে মুছিতে গ্রাম্য দেব-মন্দিরে পূজা দিয়া আসিলেন।

হরনাথবাবু অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী ছিলেন। তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতে জানিতেন না। পুত্রকেও সেই নীতির অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিতেন। বৃথা প্রবোধ দিয়া তিনি কখনও পুত্রকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন না। ভ্রমেও কখন পুত্রের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতেন না। মাতৃহারা শিশু যখন মাতার জন্য কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা! মা কোথায়?" হরনাথবাবু তখন ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেন "ঐ খানে!" বালক মাতাকে দেখিবার আশায় আকাশ-পানে চাহিয়া চাহিয়া যখন কিছুই দেখিতে পাইত না, তখন পিতাকে বলিত, "বাবা, আমি মায়ের কাছে যাব।" হরনাথবাবু তখন পুত্রকে বুঝাইয়া বলিতেন, "এখন সেখানে যাওয়া যায় না, বাবা! সময় হলে একদিন সকলকেই সেখানে যেতে হবে।" এইরূপে দরিদ্র হরনাথ রায়ের দিনগুলি অতি-বাহিত হইতে লাগিল।

সন্তান-সন্ততির শিক্ষার পক্ষে তাহাদের মাতাপিতার পূত চরিত্র ও তাহাদের পারি-পার্শ্বিক অবস্থা যেরূপ কার্য্যকরী এরূপ আর কিছুই নহে। পিতার সুশিক্ষার গুণে তাঁহার সদ্দৃষ্টান্তে বালক সুধীর শৈশব হইতে উচ্চ-প্রকৃতির লোক হইতে আরম্ভ করিল।

বঙ্গদেশে কন্যা-দায়গ্রস্ত ব্যক্তির অভাব নাই। রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হরনাথ-বাবুকে পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিতে অনেকেই অনুরোধ করিল। কত কন্যাদায়-গ্রস্ত উমেদার আসিয়া দুই বেলা তাঁহার খোষামোদ করিতে লাগিল।

কোনও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন; "ভাগাড়ে মরা গরু পড়িলে শকুনির পাল তাহাকে যেরূপ ঘেরিয়া ধরে, এক ব্যক্তির স্ত্রী-বিয়োগ হইলে সেই ব্যক্তিকে কন্যা-ভারগ্রস্ত ব্যক্তিরা সেইরূপ ঘিরিয়া ধরে!" কথাটা যথার্থ বটে! বাঙ্গালায়

বর-পণের সৃষ্টি হইয়া যে কি ঘোর সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে, বঙ্গবাসিগণ তাহা দেখিয়াও দেখেন না। প্রত্যেক গৃহেই কন্যাদায়; প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহেই হাহাকার; তথাপি এ পণ-গ্রহণ করিতে কেহই কুণ্ঠিত নহেন। কত স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় একাদশ বা দ্বাদশ-বর্ষীয়া কন্যা পঞ্চাশবৎসরের বৃদ্ধ-পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া মাতাপিতা কন্যা-দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। হায়! এরূপ বিবাহের নাম কি কন্যা-দান? ইহা যে প্রকৃত পক্ষেই "বলিদান!" এরূপ বিবাহ না দিয়া কন্যাকে চিরকুমারী রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ! কন্যা একটু বয়স্থা হইলেই, জানি না, সমাজের কি এমন সর্ব্বনাশ ঘটে! বাঙ্গালীর ঘরে বিবাহ যেন যা তা একটা ছেলে-খেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে সমাজের যে কি ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে,—বড় দুঃখের বিষয়, সমাজপতিগণ ভ্রমেও সে চিন্তা করেন না। এইরূপ বিবাহের ফলেই দেশে বালবিধবার সংখ্যা এত অধিক। এই প্রকার বিবাহের ফলেই পতিতা রমণীর সৃষ্টি এবং রাশি রাশি পাপের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এরূপ বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়গণ যদি ছোট ছোট বালিকার পাণিগ্রহণ না করিয়া বিপত্নীক অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যাস করেন, তাহা হইলে অনেক অবলা বালিকা দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু পুরুষ এতটুটা সংযম, এতটা স্বার্থ-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। পুরুষ অনায়াসে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছামত, তিন-চারি-বার বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু একটী দশ বৎসরের বালিকা যদি বিধবা হয়, তাহারও পুনর্বিবাহ দেওয়া আধুনিক হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে! নিজেরা বিলাস-সাগরে ভাসমান থাকিয়া তাঁহারা সেই কিশোরীর কর্ণে ব্রহ্ম-চর্য্যের মন্ত্র বর্ণিত করিতে থাকেন। সে মন্ত্র যে কতদূর কার্য্যকর হইতেছে, তাহা ত সচরাচর দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। হায়! বঙ্গদেশে রমণীগণ চির-পরাধীন! জানি না, কত মহাপাতক-ফলে বঙ্গদেশে রমণী জন্ম-গ্রহন করিয়া থাকে। যে দেশে সমাজ এত স্বার্থপর, সে দেশের সমাজের উন্নতির আশাও সুদূর-পরাহত।

হরনাথবাবু বঙ্গদেশবাসী; সুতরাং এ প্রৌঢ়া-বস্থায় তাঁহারও অনেক পাত্রী জুটিয়াছিল। কিন্তু তিনি বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ! কাহারও কথায়, কাহারও অনুরোধে তিনি পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহে সম্মত হইলেন না। যে অংযন্ত পীড়া-পীড়ি করিয়া ধরিত, তাহাকে বলিতেন, "আমার পুত্র আছে, আমার পুনর্ব্বার বিবাহের প্রয়োজন নাই আমি আর বিবাহ করিব না! আমার সুধীর বড় হইলে সুধীরের বিবাহ দিয়া বধূমাতা গৃহে আনিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

৫৫ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

কার্ত্তিক, ১৩২৪—নবেম্বর, ১৯১৭।

সূচী।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	এসেছে তরী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল্ এম্ এস্ ...	২৩৩
২।	গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ...	২৩৪
৩।	নমিতা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী ...	২৩৬
৪।	স্ত্রীর কর্ত্তব্য	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ...	২৪৫
৫।	শিক্ষিতা স্ত্রী	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী ...	২৪৭
৬।	ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (কবিতা)	শ্রীমতী সুনীতি দেবী ...	২৪৯
৭।	পুণ্যতীর্থ	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ ...	২৪৯
৮।	পরিতৃপ্তি (কবিতা)	৺হেমন্তবালা দত্ত ...	২৫২
৯।	অদৃষ্ট লিপি (গল্প)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু ...	২৫২
১০।	হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ...	২৫৪
১১।	আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?	শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু ...	২৫৬
১২।	সাধুবচন-সংগ্রহ ...	... ...	২৫৮
১৩।	তপস্যা (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র ...	২৫৯
১৪।	অনুতাপ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ...	২৬৩
১৫।	সংবাদ	... ...	২৬৪

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৶৹ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ (চারি আনা) মাত্র।
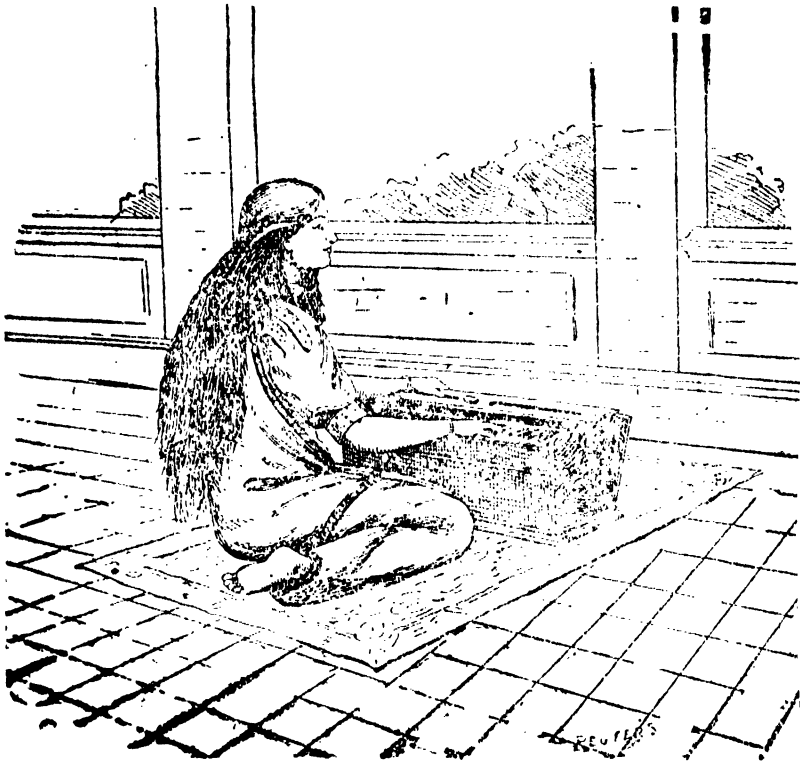
বামাবোধিনী পত্রিকা।

651. November, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫ বর্ষ। সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৪। নবেম্বর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

এসেছে তরী।

(৪)

। যাবি কে রে, আয় এসেছে তরী !
র ফুরাল খেলা, আর তবে কেন বেলা ?
না হ'লে হবে যে রে তুফান ভারি ;
...বি যদি চলে আয় এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে, আয় এসেছে তরী ;
এ পারে কেবলি শোকে পাগল করিবে তোকে ;
কেঁদে কেঁদে চোখে আর রবে না বারি ;
এই বেলা চলে আয়, কেন রে দেরি !

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী ;
আশার কুহকে মাতি ছুটাছুটি দিবারাতি,
তবু আশা পূরিবে না জীবন ধরি !
কাজ নাই, চলে আয় তাহারে ছাড়ি।

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী !
মায়ার বাঁধন কাটি তরীতে চলরে ছুটি,
ও-পারে পাবি রে সুখ পরাণ ভরি ;—
পারে নিয়ে যাবে বলে এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী !
পাপী তাপী যে যথায় সকলে ছুটিয়া আয়,
এ তরীতে নাহি ভয় তুফানে পড়ি,—
এ যে সেই পরমেশ-চরণ-তরী !

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শেঠ।

গানের স্বরলিপি।

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

তুমি এস হে।
মম বিজন চির-গোপন
দুঃখ-বিতান হৃদি-আসনে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
জাগে চেতনা শত বেদনা,
মৃত জীবনে তব পরশে ;
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
লভি শকতি, প্রেম-ভকতি,
তব আরতি করি জীবনে ;
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
আমি তৃষিত, আমি ক্ষুধিত,
যাচি অমৃত তব সকাশে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
যত সাধনা, ব্রত-কামনা,
সব সফল তব সাধনে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
II র্সর্সা র্রা পা। ধা ধা -া। পা ধা ণা। ণধা পা -া I
(১) তু ০ মি এ স ০ হে ০ ০ ০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ধা পা -া। মা গা -া। রগা মা -া। -া গা রা I
(২) তু মি ০ এ স ০ হে০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা ন্‌া -া। ধ্‌া ন্‌া স্‌া। -া -া -া II
(৩) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II সা রা -া। সরগা পমগা -া। গধা পা -া। গপা মা পা I
ম ম ০ বি০০ জ০ন ০ চি০ র ০ গো০ প ন
আ গে ০ চে০০ ত০না ০ শ০ ত ০ বে০ দ না
ল ভি ০ শ০০ ক০তি ০ প্রে০ ম- ০ ভ০ ক্ তি
আ মি ০ তৃ০০ ষি০ত ০ আ০ ছি ০ ক্ষু০ ধি ত
য ত ০ সাধ০ না০০ ০ ব্র০ ত ০ কা০ ম না

২´ ৩ ০ ১
I গা মা -া। রগা সা -া। সা -া -া। সা রা -া I
দুঃ খ- ০ বি০ তা ০ ন ০ ০ হৃ দি ০
মৃ ত ০ জী০ ব ০ নে ০ ০ ত ব ০
ত ব ০ আ০ র ০ তি ০ ০ ক রি ০
যা চি ০ অ০ মৃ ০ ত ০ ০ ত ব ০
স ব ০ স০ ফ ০ ল ০ ০ ত ব ০

২´ ৩ ০ ১
I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
আ স ০ নে০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা ন্া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৪) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
প র ০ শে০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা ন্া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৫) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
জী ব ০ নে০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা ন্া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৬) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

	২´			৩			০			১			
I	সা	রা	-া।	সরা	গমা	পা।	মগা	রা	-া।	-া	-া	-া	I
	স	কা	০	শে •	০ ০	•	০ ০	•	•	•	•	•	

	২´			৩			০			১			
I	গা	রা	-া।	সা	ন্	-া।	সা	-া	-া।	-া	-া	-া	I
(৭)	তু	মি	০	এ	স	০	হে	০	•	•	•	•	

	২´			৩			০			১			
I	সা	রা	-া।	সরা	গমা	পা।	মগা	রা	-া।	-া	-া	-া	I
	সা	ধ	০	নে •	০ •	০	০ ০	০	০	০	•	•	

	২´			৩			০			১			
I	গা	রা	-া।	সা	ন্	-া।	সা	-া	-া।	-া	-া	-া	I
(৮)	তু	মি	০	এ	স	•	হে	০	০	০	•	০	

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—৪ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিয়াই ১, ২ এবং ৩ নম্বরের "তুমি এস হে" যথাক্রমে গেয়। তাহার পর, পরবর্ত্তী কলি গেয়। ঠিক এই নিয়মেই ৫, ৬, ৭ এবং ৮ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিবার পরে পরেই, প্রত্যেক বারে ১, ২ এবং ৩ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিয়া, তখন অন্যান্য কলি ধরিতে হইবে। এই নিয়মে, গাহিতে পারিলে এই গানটি ভারি শ্রুতিমধুর হইবে।

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

নমিতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৮)

নির্জ্জন কক্ষে 'সোফা'র উপর আড় হইয়া পড়িয়া নমিতা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। যদিও যন্ত্রণাধিক্যে তাহার শরীর-মন অস্বচ্ছন্দতায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বিভিন্ন-ঘটনা-সংঘাতে উত্তেজিত চিন্তাশক্তি, তাহার মনোবৃত্তিগুলাকে ফাঁকে পাইয়া, প্রথমেই তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া ছুটাইল, তাহার সেই প্রত্যহের অভ্যস্ত কর্ম্ম-সংস্কারের দিকে! এই সুন্দর উদ্যম-আনন্দে সচেতন, স্নিগ্ধ-মধুর সন্ধ্যাকাল,—ইহা যে প্রতিদিন রোগি-নিবাসের সেবাব্রতের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, অক্লান্ত উদ্যমে তাহার শ্রম-চর্চ্চা করিবার সময়!—ইহা কি এই সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল কক্ষের মাঝে সুকোমল 'সোফা'য় পড়িয়া অলস- ও নিশ্চেষ্ট-ভাবে যাপিত করা সহ্য হয়! এ যে বড় কষ্ট-কর আরাম-উপভোগ!

কিন্তু গত্যন্তর নাই! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া, নিষ্পন্দ হইয়া 'সোফা'র উপর পড়িয়া রহিল। মনে সে ভাবিতে লাগিল, হাঁসপাতালের কথা! তাহার অনুপস্থিতির জন্য হাঁস্‌পাতালে, হয়ত, এতক্ষণ গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে! বেচারী চার্শ্মিয়ান্, হয়ত, খুব ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার জন্য পথ চাহিয়া রহিয়াছে!...... আবার আহা, নমিতার কর্ত্তব্যের অংশভার যাহাদের আজ হইতে বহিতে হইবে, তাহারা ঐ অধিকন্তু খাটুনীর জন্য কত কষ্ট পাইবে! হয়ত, কেহ মনে মনে বিরক্ত হইবে, কেহ প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানাইবে! আবার কেহ বা কটু-কাটব্য-বর্ষণেও হয়ত বা, ত্রুটি করিবে না।

নমিতার আর শুইয়া থাকা পোষাইল না। সে উঠিয়া সোফার উপর সোজা হইয়া বসিল; একবার মনে করিল ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া হাঁস্‌পাতালে হাজির হয়!......কি তুচ্ছ এই সামান্য দৈহিক যন্ত্রণা! স্মিথের মাতৃস্নেহ-করুণা-মণ্ডিত নয়নে ইহা যতই কষ্টকর-যন্ত্রণা হউক, কিন্তু নমিতার পক্ষে ইহা এখন সত্যই আর বিশেষ-কষ্টবহ বেদনা নহে! কিন্তু সামান্য এইটুকুর জন্য, সৌখীন-ক্লান্তি-অবলম্বনে সে এখানে অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া রহিল, আর সেখানে যে এই অজুহাতে 'দশ-বিশ-লক্ষ' মন্তব্য সংগঠিত হইবে, তাহার কঠিন গুরুত্ব তাহার বড়ই অসহ্য! ছুরির ফলার তীক্ষ্ণ কঠিনতার মধ্যে একটা মহদ্ গুণ আছে,—সারল্য। কিন্তু, মানুষের শাণিত রসনার শ্লেষ-ব্যঙ্গ,—না না, সে বক্র প্যাঁচের নির্দ্দয় তীক্ষ্ণতার ত্রিসীমানায়, কোন-জাতীয় সমবেদনা তিষ্ঠাইতে পারে না!...তবে? তবে উপায়?...

ব্যগ্র ব্যাকুল মনের উপর বজ্র-চমকে স্মৃতি ঝলসিয়া গেল,—ইহা স্মিথের আদেশ! —নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমর্ষভাবে নমিতা 'সোফা'র উপর আবার শুইয়া পড়িল। থাক্, স্মিথ্ যখন দয়া করিয়া স্নেহের দাবীতে, স্বেচ্ছায় কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কোনও কথা কহিবার অধিকার নমিতার আর নাই! নিষ্ফল অসন্তোষ দূর হউক্! যা হইবার হইবে। স্মিথ্ বুঝিবেন্! তিনি নমিতাকে নিশ্চিন্ত থাকিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন,—নমিতা দুশ্চিন্তা বিড়ম্বনার বোঝা ঘাড়ে লইয়া এখানে নিরুপায় নিশ্চিন্ততার আরাম ভোগ করুক্। বিপ্লবের ঝড় বাহিরে বহিয়া যাক্!

কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার আরামটুকু তাহার গায়ে যে তীব্র ঘৃণা-অস্বস্তির অঙ্কুশ হানিতেছে! নিস্তব্ধভাবে শুইয়া থাকিবার সাধ্য কি? নমিতার মনে হইতে লাগিল, এই যে আরাম-উপভোগ,—ইহা এখন নিতান্তই দস্যুতালব্ধ সম্পত্তির মত অন্যায় অধর্ম্মার্জ্জিত। অন্যের কষ্টভোগ বাড়াইয়া —এই যে নিজের শ্রান্তি-অপনোদন,—ইহা তাহার কাছে বড়ই ঘৃণাকর! কিন্তু স্মিথের স্নেহ-অনুকম্পাটা মাঝখানে জুটিয়া বড়ই গোলযোগ বাধাইয়াছে!

চোখের সম্মুখে মানুষের মুখের ভিড় বেশী জমিলে দৃষ্টিশক্তিটা বাহিরের দিকেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হয়, ভিতর দিকে ফিরিবার অবকাশ তাহার ঘটিয়া উঠা দায় হইয়া থাকে।—তা ছাড়া, বাক্‌শক্তির ঝঙ্কার-সংঘাতে চিন্তাশক্তিটা, অনেক সময়, থতমত খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। এতক্ষণ নমিতার অবস্থাও কতকটা তাহাই হইয়াছিল। এইবার

স্তব্ধ নির্জ্জন কক্ষের মাঝে কর্ম্মহীন উদাস চিত্তটা আচ্ছন্ন করিয়া থুচ্‌রা দ্বন্দ্বের আলোড়ন চলিতে চলিতে, সহসা মস্তিষ্ক-যন্ত্রটিকে তীব্র উত্তেজনায় সন্ত্রস্ত-চকিত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে গভীরতর দ্বন্দ্ব-বিপ্লব জাগিয়া উঠিল। নমিতার মনে পড়িয়া গেল, ডাক্তার মিত্রের আজিকার ব্যবহার, এবং নমিতার আত্মকৃত আচরণ!

মাথা ঠিক্ করিয়া খুব ভালরূপে সমস্ত ঘটনাটা তলাইয়া ভাবিয়া যথাসাধ্য নিরপেক্ষ হইয়া নমিতা বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কোন্‌খানে কাহার কতখানি দোষ আছে, তাহার মাপ জোঁক পরে হইবে, আগে নিজের ব্যবস্থাটা পরীক্ষা করা হউক্!...... নমিতা হাতের উপর মাথা রাখিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।—না, তাহার আজি-কার ব্যবহারটা ভাল হয় নাই; মোটেই ভাল হয় নাই! ন্যায় এবং সত্য যত বড়ই ও মহৎ. পবিত্র বস্তু হউক্, কিন্তু পঞ্চভূত-গঠিত এই মাথাটার উপর যাঁহারা উর্দ্ধতন হইয়া আছেন, তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে অসন্তোষ-বিরক্তি প্রকাশ করা, যেমনি দুঃসাহসিকতা, তেমনি নির্লজ্জ-ধৃষ্টতা!

নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল; তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বড়ই গরম বোধ হইতেছিল। জামাটা খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে সে ভাবিল,—না, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; হাঁসপাতালের চাকুরী আর নয়। মানুষের নীচতা-সংঘাতে এক ত তাহার মনও অবনত হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আর একটা নিদারুণ কষ্ট!—যাঁহারা উর্দ্ধতন সম্মান-পাত্র,—তাঁহাদিগের ব্যবহারকে ঘৃণা করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তের ঘটনায় ক্ষুব্ধ-বিদ্বিষ্ট হইয়া, চিত্তবিক্ষেপ ঘটাইয়া, তাহার বড় লোক্‌সান হইতেছে। সময়ে সাবধান হওয়া ভাল। ডাক্তার মিত্রের সহিত এই যে মনো-মালিন্য আরম্ভ হইল, ইহার চরম পরিণতি কোথায় গিয়া সমাপ্ত হইবে, কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ, সে ক্ষুদ্রপ্রাণ, ক্ষীণশক্তি মানুষ। প্রতিপক্ষ যখন প্রবল, তখন সন্তর্পণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংস্রব এড়াইয়া চলাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

জামা খুলিতে খুলিতে ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর দেওয়া সেই পত্রখানা নমিতার হাতে ঠেকিল। তাহার মনে পড়িল, তিনি উহা অবসর-সময়ে পাঠ করিতে বলিয়াছেন! এই ত অবসর! নমিতা একবার দ্বারের দিকে চাহিল;—কাহারই আসিবার সম্ভাবনা নাই, বুঝিল। আলো উস্কাইয়া দিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল। মুহূর্ত্তে সে হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িল! দেখিল, পত্রের সহিত দুইখানি নোট! একখানি পঞ্চাশ টাকার ও অন্যখানি পাঁচ টাকার!

নোট-দুইখানার এ-পিঠ ও-পিঠ একবার উল্টাইয়া দেখিয়া নমিতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রুদ্ধশ্বাসে পত্র পড়িতে লাগিল:—

"বিনীত নিবেদন,

পীড়িত পাচকের আশ্রয়দাত্রী করুণাময়ীর সন্ধান পাইয়াছি। দেবর নির্ম্মলবাবু ছাড়া আর কেহ এ সংবাদ জানে না, জানিবেন। যদি ঘৃণা না করেন, তবে অনুতপ্ত-বেদনার অশ্রুজলের সহিত আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। বেশী লিখিতে পারিতেছি না।

"মুখোমুখী এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। আমার মাতার দেওয়া তত্ত্ব প্রভৃতির দরুণ প্রাপ্ত টাকা হইতে পঞ্চান্নটি টাকা দিলাম। অতঃপর বালকটির চিকিৎসা-খরচে যাহা লাগিবে, তাহা দিয়া, বাকী টাকা তাহার হাতে দিবেন, এবং যাহাতে সে নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অন্য সুবিধা না থাকায়, আপনাকেই এ-সব দুঃখভোগের দায়ী করিলাম। নিরুপায়জ্ঞানে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

'আর একটি অনুরোধ। ঠাকুরকে এ বাড়ীতে আর আসিতে দিবেন না; এবং তাহাকে বা অপর কাহাকেও আমার নাম-সংক্রান্ত কোনও কথা জানাইয়া, মর্ম্মপীড়া বাড়াইবেন না। আপনার উন্নত-স্নেহ-ক্ষমা-শীল হৃদয়ের উপর অকপট বিশ্বাস-নির্ভর স্থাপন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম, ভুলিবেন না। ইতি

ক্ষমাপ্রার্থিনী

শ্রীসরমা মিত্র।"

বিশ্বস্ত-সুপ্ত মানুষের 'রগে' অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত বাজিলে, সে যেমন বিকল ও মুহ্যমান হইয়া অর্থশূন্য-দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, নমিতাও ঠিক তেমনি ভাবে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল!......মুক্ত স্বাধীনতার হাত ফস্কাইয়া, হঠাৎ তাহার সতেজ ক্রিয়াশীল হৃদ্‌যন্ত্রটা যেন একটা কঠোর পরাধীনতার দৃঢ় নিষ্পীড়নে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ইচ্ছাধীনভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণের ক্ষমতাও যেন তাহার লুপ্ত হইয়া গেল! নমিতা পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নিস্পন্দ-নির্জ্জীবভাবে নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মাথার ভিতর একটা জটিল গোলমালের প্রলয়-আলোড়ন চলিতেছিল। ক্ষিপ্ত বিদ্রোহ-সংঘর্ষে হৃদয়াভ্যন্তরে অনুভূতি-প্রবাহে বিরাট বিশৃঙ্খলা বাধিয়া গিয়াছিল; নমিতার মনে হইল, এক মুহূর্ত্তে সে যেন কি একটা অদ্ভুত কিছু বানিয়া গিয়াছে!

অনেকক্ষণ পরে, অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। স্মিথের টেবিলের উপর হইতে এক টুক্‌রা কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিল, "বাড়ীতে একটা জরুরী কাজ ভুল করিয়া আসিয়াছি, শীঘ্র ফিরিতে বাধ্য হইলাম, ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। আমার হাতে এখন কোন যন্ত্রণাই অনুভূত হইতেছে না, নিশ্চিন্ত থাকিবেন। নমিতা।"

ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর পত্রখানা সন্তর্পণে জামার ভিতর লুকাইয়া, ক্রুশ ও সূতার গুলি হাতে লইয়া, নমিতা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। বারেণ্ডায় স্মিথের বেহারার সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, সে সেলাম করিয়া জানাইল, "সুশীলকে সে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে। বিমল-বাবু কার্য্যগতিকে ব্যস্ত আছেন, শীঘ্রই এখানে আসিতেছেন।"

নমিতা রুদ্ধস্বরে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা! জরুরী কাম্‌কো বাস্তে হাম্ আবি মোকাম্ পর যাতা।—মেম-সাব আনেসে বোলো, টেবিল পর লিখ্‌কে আয়া......ঔর মেরা হাঁথ্ আবি আচ্ছা হ্যায়।"

মিস্ স্মিথ্ নমিতাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া ভৃত্যেরা নমিতার সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিত। নমিতা ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা

সাবধানে ডানহাতে ধরিয়া, বারেণ্ডার সিঁড়ি হইতে খুব ধীরে ধীরে নামিতেছে দেখিয়া, বেহারা পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া সসৌজন্যে বলিল, "জী, বড়ি আঁন্ধার হুয়া, একঠো বাতি লেকে, আপ্‌কো সাথ্—।"

পরের কষ্ট-অসুবিধা ঘটাইয়া, নিজের সুবিধা গুছাইয়া লইতে নমিতার দ্বিগুণ অসুবিধা বোধ হয়! ভৃত্যের প্রস্তাবে সে ব্যস্ত হইয়া, বাধা দিয়া বলিল, "কুচ্ কাম নেহি, সাম্‌কো বখৎ বহুৎ আদ্‌মী যাঁতে আঁতে হেঁ।—কেয়া ডর!"

বেহারা মাথ' নাড়িয়া সমর্থনসূচক স্বরে বলিল,—"বহুৎ—খুব্—!"

নমিতা রাস্তায় নামিয়া, যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকার হইলেও আকাশে তারা থাকায়, তাহা তেমন গাঢ় হয় নাই। মোড়ের মাথায় 'লাইট-পোষ্টে'র আলোয় পথগুলি আলোকিত। সংখ্যায় অল্প হইলেও পথে লোক-চলাচল হইতেছিল। নমিতা কাহারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বিরাট বিষণ্ণতার ভারে অভিভূতচিত্তে, ক্লান্ত নির্জ্জীবের মত পথাতিবাহন করিয়া চলিল।

দুই তিনটা মোড় ঘুরিয়া, বাড়ীর কাছে শেষ তে-মাথার মোড়ে 'লাইট-পোষ্টে'র নিকট আসিয়া পৌঁছিতেই, সহসা সাম্‌নে হইতে একদল সঙ্গীতমত্ত লোক আসিয়া পড়ায়, নমিতার গতিরোধ হইল। লোকগুলি নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুস্থানী; উৎকট সুরা-দুর্গন্ধের তীব্রঘ্রাণে চমকিত হইয়া নমিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিল।—সর্ব্বনাশ! ইহারা সকলেই যে অপ্রকৃতিস্থ!

অসহায় নমিতার আপাদমস্তকে, ভয়-ব্যাকুলতার তীব্র কম্পনপ্রবাহ বহিয়া গেল! সন্ধ্যারাত্রে প্রকাশ্য রাজপথের উপর কোনও ভয় নাই সত্য; কিন্তু এমন সঙ্গিহীন অবস্থায় হঠাৎ সম্মুখে ভয়ঙ্কর কিছু দেখিলে, তাহার মত ক্ষীণশক্তি মানুষের প্রাণ কোন্ সাহসে স্থির থাকিবে! সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রতম উপলক্ষ্য থাকিলেও কথা ছিল; কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা!

দু-পাশে প্রাচীর-বেষ্টিত বাড়ী, পিছনে অন্ধকার গলি! নড়িবার সরিবার পথ নাই, উপায় নাই, সময় নাই! উহারা আসিয়া পড়িয়াছে! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে শক্তি সংযত করিয়া, আলোকস্তম্ভের গা ঘেঁসিয়া, আহত হাতখানা আড়াল করিয়া, আড় হইয়া দাঁড়াইল। ঘাড় বাঁকাইয়া নতদৃষ্টিতে রুদ্ধশ্বাসে মাতালদের স্খলিত চরণগতি লক্ষ্য করিতে লাগিল! যদি মত্ততার ঝোঁকে কেহ এই দিকে টলিয়া পড়ে,—তবে হে ভগবন্,—আত্মরক্ষার শক্তি দিও!

ভগবান্, বুঝি, তাহা শুনিলেন। নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, এই অপ্রকৃতিস্থ মাতালদের দৃষ্টিতে মানুষের মত শিষ্টপ্রকৃতিস্থতা কিছু ছিল। অগ্রবর্ত্তী দুইজন সাম্‌নে নমিতাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত থামাইল এবং সন্ত্রস্ত হইয়া পিছনের 'চূড় মাতাল' সঙ্গীগুলির উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পাশের লোকটা মদিরালস নয়নে চলিতে চলিতে খুবই টলিতেছিল। একটা ছোট হোঁচ্‌ট খাইয়া, নেশার ঝোঁকে অভিভূত

শরীরটার ভার সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সে সবেগে ঘুরিয়া আসিয়া 'লাইট-পোষ্টে'র তলায় আছাড় খাইবার যো করিল।

হঠাৎ পিছনের অন্ধকার গলির ভিতর হইতে আর একজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া নমিতার পার্শ্বে পৌঁছিল। নমিতার দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া, ক্ষিপ্র সতর্কতায় দুইহাতে পতনোন্মুখ লোকটাকে ধরিয়া ফেলিল। সবেগে এক ঝাঁকুনী দিয়া তাহাকে সোজা করিয়া, রুক্ষস্বরে বলিল "আপ্‌নে ডেরা পর্ চলা যাও ভাই!—"

দলের প্রকৃতিস্থ দুইজন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রতিভ-ভাবে সবিনয়ে ক্ষমা চাহিয়া উপর্য্যুপরি সেলাম ঠুকিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় হড়্‌বড়্‌ করিয়া নানা কথা সে বকিয়া গেল। তাহার মধ্যে একটি কথা নমিতা শুধু বুঝিল,—"আপ্‌কো মঙ্গল হোক্, হামি লোক্ তো আপ্‌কো........।"

পরস্পরকে ধাক্কা মারিয়া, ঠেলিয়া, টানিয়া লইয়া, খুব ব্যস্তভাবে তাহারা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সাহায্য-কর্ত্তাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবার জন্য ফিরিয়া, তাহার পানে চাহিয়া নমিতা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল! এ যে—সেই, সুরসুন্দর!

সুরসুন্দরও বিস্ময়বিমূঢ়-ভাবে নমিতার পানে চাহিয়া রহিল। প্রথমতঃ সে কথা কহিতে পারিল না; তারপর মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "আপ্‌নি! ছি ছি, বড় ছেলেমানুষী করেছেন ত! এমন সময় একলাটি রাস্তায়...! কাজটা ভাল হয় নি। ... আমি ভেবেছিলাম, আর কেউ!"

নমিতার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। অতি-কষ্টে, আরক্ত মুখে সে বলিল, "বুঝ্‌তে পারি নি। ভাগ্যিস, আপনি..., কি উপকার যে কর্‌লেন! আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার ভাষা..."

বাধা দিয়া শুষ্ক ম্লান-মুখে সুরসুন্দর বলিল, "দয়া করে ও-সব বিড়ম্বনা-ভোগের দায় থেকে নিষ্কৃতি দেন! একটু দাঁড়ান, আসছি।"

সুরসুন্দর দ্রুতপদে পার্শ্বের অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকিল; ক্ষণপরে একজন জীর্ণ-শীর্ণ কুব্জনতদেহ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া, সাবধানে তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল। নমিতা অবাক্ হইয়া দেখিল, বৃদ্ধটি তাহাদের হাঁস্‌পাতালের মেথর ''রম্‌ণার' বৃদ্ধ পিতা —'জীবলাল মেথর'।

নিকটে আসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপ্‌নি আগে চলুন—।" নমিতা বিনা-বাক্যে চলিতে লাগিল। সুরসুন্দর মৃদু-স্বরে বলিল, "স্মিথের কুঠিতে খোঁজ নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌ছি; স্মিথ্ বলে দিলেন, কাল সকালেই একখানা দরখাস্তে সই করে ক্লার্কের কাছে পাঠাবেন, সায়েব সাতদিন ছুটি দিতে রাজি হয়েছেন।...আর সমুদ্রপ্রসাদ কাল সাড়ে ছ'টার সময় গিয়ে আপনার হাতটা ধুয়ে দিয়ে আস্‌বে, বলে দিয়েছি।"

নমিতা বলিল, "ধন্যবাদ! আমার 'ডিউটী'টা কার হাতে পড়্‌ল, জানেন?"

সুরসুন্দর বৃদ্ধের হাত ধরিয়া একটা উঁচু নালী পার করাইতে করাইতে বলিল, "আমার; সঙ্গে ছোট কম্পাউণ্ডার দেবীশঙ্কর থাক্‌বে।"

ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা বলিল, "ডাক্তার

মিত্র কিছু বলেন নি ত? আপ্‌নি দেরী করে যাওয়ার জন্যে?"

ম্লানমুখে ঈষৎ হাসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "ডাক্তার-সাহেবকে কে কি বলেছেন বুঝি! সাহেব কি বলেছেন, জানি না। ওরা ত বলাবলি কর্‌ছিল। স্মিথ্‌ শুনে চটে গেছেন,... তাই আপনাকে তাড়াতাড়ি 'এ্যাপ্লিকেশনের' কথা বল্‌তে পাঠালেন।... যাক্‌, ও-সব বাজে কথা শোন্‌বার জন্যে কান পেতে বসে থাক্‌লে ত কোনই কাজ কর্‌বার সময় পাওয়া যাবে না। শীঘ্র চলুন।"

নমিতা শীঘ্র চলিতে লাগিল। বলিবার মত কোন কথা সে হাতের কাছে খুঁজিয়া পাইল না; অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ডাক্তারবাবুর কি চমৎকার স্বভাব!

কিন্তু থাক, সে-সকল আলোচনা লইয়া আর চিত্তগ্লানির উদ্বর্ত্তনে কাজ নাই। পরের দোষ-ত্রুটির চর্চ্চায় ক্রমাগত দৃষ্টিশক্তিকে খাটাইলে, শেষে হয়ত সাঙ্ঘাতিক চক্ষুঃ-পীড়া আবির্ভূত হইবে।...অতএব এ-সকল বিষয়ে খানিকটা পাশ কাটাইয়া চোখ্‌-কাণ বুজিয়া থাকাই ভাল। নমিতা মনটাকে ধমক দিয়া শান্ত-নিরীহ বানাইয়া লইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

উঁচু নীচু অসমতল পথে চলিতে ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ জীবলাল ক্রমাগতই ঠোকর খাইতেছিল। সুরসুন্দর সতর্ক হইয়া তাহাকে সাম্‌লাইয়া লইতেছিল। এইবার তাড়াতাড়ি চলার জন্য বৃদ্ধ অসাবধানে একটা বড় রকম হোঁচট্‌ খাইয়া টলিয়া পড়িবার উপক্রম করিলে সুরসুন্দর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বুক পাতিয়া নিঃশব্দে তাহার বার্দ্ধক্য-জীর্ণ অসমর্থ দেহের ভারটা সাম্‌লাইয়া লইল। তাহার কাঁধের উপর বৃদ্ধের মুখ থুব্‌ড়াইয়া গেল। সুরসুন্দর তাহাকে সোজা করিয়া, তাড়াতাড়ি দাড়িতে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "বড়া লাগল ভৈ?"

"নেই বাপ্‌, কুছ নেই!—"এই বলিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধ আঘাত-বেদনাটা অস্বীকার করিয়া প্রীতি-কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল বদনে বলিল, "জীতা রও বাপ্‌, আজ তোম্‌কো নেহি মিল্‌নেসে হাম্‌ তো রাস্তে পর মর্‌ যাতা— ।"

সুরসুন্দর সে কথায় কান দিল না; মাথা হেঁট করিয়া ঘাড় বাড়াইয়া দিয়া বলিল, পাক্‌ড়ো হাম্‌রা কান্ধা।—হাঁ চলো।...মিস্‌ মিত্র,একটু আস্তে—।"

নমিতা নীরবে মুখ ফিরাইয়া একবার মুগ্ধ-করুণ দৃষ্টিতে উভয়ের অবস্থাটা দেখিয়া লইল; তারপর আবার পূর্ব্বের মত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সম্মুখ হইতে আর একদল লোক আসিল। নির্ভয়ে ক্রীড়ারত কপোত-শিশু অকস্মাৎ সম্মুখে উদ্যত-নখর বাজপাখী দেখিলে যেমন সভয়ে চমকিয়া উঠে,—কে জানে কেন, অন্যমনস্ক নমিতাও আজ হঠাৎ দত্তজায়ার মুখপানে চাহিয়া, অন্তর-মধ্যে তেমনিতর একটা তীব্র-চমক খাইল! কি কহিবে ভাবিয়া পাইল না; তাড়াতাড়ি আঁচলটা টানিয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতখানার উপর ঢাকা দিল।

সাচ্চা জরির 'বাদ্‌লা' বসান, রেশমের বিপুল আড়ম্বরশ্রী-যুক্ত, মূল্যবান্‌ জ্যাকেট ও সাড়ির খস্‌খসে শব্দের সহিত জুতার খট্‌খট্‌

শব্দ মিশাইয়া, স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষগম্ভীর কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মিহি-কোমল করিয়া, হাসি-হাসি-মুখে গল্প করিতে করিতে দত্তজায়া আসিতে-ছিলেন। সঙ্গে ডাক্তার মিত্রের 'মনের মত' পরিহাস-রসিক বন্ধু, স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীলের কীর্ত্তিমান্ বংশধর 'নিরেট বখা'-নামে বিখ্যাত 'হিতলালবাবু', সৌখীন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিতে-ছিলেন। দত্তজায়ার ভৃত্য আলো হাতে লইয়া আগে আগে আসিতেছিল।

পিছনে আর তিনজন পথিক তাঁহাদের আলোয় পথ দেখিয়া আসিতেছিল। তাহাদের একজন বৃদ্ধ, একজন যুবা ও অপরটি কিশোর বালক। বৃদ্ধটি বিরক্তি-কুটিল দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দত্তজায়াকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবাটি সহজে ফাজিল ;—সে বিদ্রূপবর্ষী হাসি-মাখা মুখে ও বক্র কটাক্ষে একবার হিতলাল-বাবুকে ও একবার দত্তজায়াকে দেখিতেছিল, আর ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গীর সহিত নানা ছাঁদে কাশিতে কাশিতে হাসিতেছিল। বালকটি নির্ব্বোধ; সে কৌতূহল-বিস্ফারিত নয়নে তাহাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া চলিতে চলিতে বারংবার হোঁচট খাইতেছিল।

চকিতদৃষ্টিতে পিছনের লোক-তিনটির পানে চাহিয়া নমিতার আভ্যন্তরিক সঙ্কোচ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল! ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে একবার দত্তজায়ার পানে চাহিয়া সে মাথা হেঁট করিয়া, কুণ্ঠিতভাবে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুরসুন্দর চোখ তুলিয়া একবার তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া লইল। বন্ধুপ্রীতির অনু-রোধে হিতলালবাবু প্রায়শঃ হাঁস্‌পাতালে ডাক্তারদের বসিবার ঘরে আসিয়া আড্ডা দেন। সুতরাং, হাঁস্‌পাতালের সকলেই তাঁহাকে চেনে। সুরসুন্দর তাঁহাকে একটা ছোট নমস্কার করিয়া চোখ নামাইল। তারপর বৃদ্ধ মেথরের পায়ের নীচেকার পথটা সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাবে নিরীক্ষণ করিতে সে সবিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র গোল গোল চোখের তীব্র প্রখর দৃষ্টি হানিয়া দত্তজায়া একবার সুরসুন্দরকে ও একবার নমিতাকে দেখিয়া লইয়া কর্ত্তৃত্ব-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল সব ?"

নমিতা কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, দত্তজায়ার ভৃত্যটি হাতের লণ্ঠনটা বৃদ্ধ মেথরের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া, অকুণ্ঠিত স্পর্দ্ধায় উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "বা বা, কম্পাউণ্ডার-সাহেব, 'ভঙ্গিকো' হাঁথ পাকড়'কে আপ্ কৌন 'স্বরগো'মে লে যাতা ?"

কোন্ স্বর্গে লইয়া যাইতেছে, তাহার নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় সুরসুন্দর চুপ করিয়া রহিল। বৃদ্ধ মেথর লজ্জায় 'এত-টুকু' হইয়া কুণ্ঠিতহাস্যে বলিল, তাহার পুত্র রম্‌ণার আজ 'জান্ খারাব' হইয়াছে, তাই সে তাহার 'উর্দ্দিপর কাম বাজাইতে' 'সার্জ্জি-ক্যাল ওয়ার্ডে' গিয়াছিল ; রাত্রি হইয়া যাওয়ায় 'অন্ধা বুড়াকে' দয়া করিয়া কম্পাউণ্ডার-সাহেব দিয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়া পথ দেখাইয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু বাক্স খালি হওয়ায়, অবশেষে হাত ধরিয়া পথটুকু পার করিয়া দিতেছেন।

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া তাহার কথাগুলা শুনিয়া লইল; দত্তজায়ার কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গেল।

দত্তজায়া পুনশ্চ বলিলেন, "তুমি কি হাঁস্‌পাতাল থেকে আস্‌ছ ?"

নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "না; স্মিথের কুঠি থেকে আস্‌ছি; হাঁস্‌পাতালে যেতে পারি নি।"

দত্তজায়া ব্যগ্রভাবে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন। খুব সম্ভব, তাহা কৈফিয়তের "কেন ?"—কিন্তু হিতলালবাবু মাঝে পড়িয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "আজ তা হ'লে আপনাকে আর হাঁস্‌পাতালে যেতে হবে না ? বেশ ত, চলুন না তা হ'লে আমাদের ওখানে তাসটাস খেলা যাক্। ব্যারিষ্টার পিয়ার্সনের মেয়ে মিস্ এলিন্ আস্‌বেন, আরও অনেক ভাল ভাল লোক থাক্‌বেন। চলুন সকলের সঙ্গে 'ইণ্ট্রোডিয়ুস করে দেব আপনার; চলুন চলুন... ।"

স্বল্প-পরিচিত ভদ্রসন্তানটির নিকট অতর্কিতে এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের তাড়া খাইয়া নমিতা হঠাৎ থতমত খাইয়া গেল। হতবুদ্ধির মত ক্ষণেক নির্ব্বাক্ থাকিয়া, কোনওরূপে আত্মদমন করিয়া শিষ্টভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল, "তাসখেলা...ক্ষমা করুন্।"

হিতলালবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন, আপত্তি কি ?"

নমিতা গোলে পড়িল; ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাড়ীতে বড় কাজ আছে। না হ'লে, এ সৌভাগ্য···!"

হিতলালবাবু পরম আগ্রহে বলিলেন, "বাজে গুজব রাখুন। বাড়ীতে কাজ মানুষের চিরদিনই থাকে. তা বলে কে আর···। এই ত মিসেস্ দত্ত যাচ্ছেন, ডাক্তার প্রমথবাবুও এখুনি আস্‌বেন। আপনাকে নিয়ে যেতে পার্‌লে 'পার্টি' জম্‌বে ভাল। আপ্‌নার কথা আমরা প্রায়ই বলাবলি করি। কি বলেন মিসেস্ দত্ত ! হা—হা—হা—!" এইরূপে তিনি খাম-খেয়ালি কৌতুকে জোর গলায় হাসিয়া উঠিলেন। দত্তজায়ার দৃষ্টিতটে অপ্রসন্নতার মেঘ ঘনাইয়া উঠিল; কোনওমতে অনিচ্ছার দমন করিয়া তিনি মোসাহেবের তোষামোদের সুরে একটু খাপ্‌ছাড়া হাসি হাসিয়া মাথামুণ্ড উত্তর যোগাইলেন,"—বিলক্ষণ।"

সে কথার অর্থটা এ-ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবব্যঞ্জক হইবে, তাহা দত্তজায়া স্বয়ং বুঝিলেন কি না সন্দেহ, কিন্তু একটা কিছু বলা ত চাই, তাই তিনি যাহা মুখে আসিল তাই বলিলেন।

হিতলালবাবুর সে হাসি নমিতার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নমিতার মনে পড়িল যে ছেলেবেলায় সে তাস খেলিতে খুব ভাল বাসিত বটে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সে আর তাস হাতে করে নাই। নমিতা মনটা চাঙ্গা করিয়া লইল। সবিনয়ে সেই কথাটা ব্যক্ত করিয়া এ প্রসঙ্গের মুড়া মারিয়া দিয়া নমিতা বিদায় লইবার সঙ্কল্প করিল; কিন্তু তখনই পরিহাস-রসিক হিতলালবাবুর ঘৃণিত-কঠোর হৃদয়হীনতার হাস্য-লাঞ্ছিত প্রকাণ্ড মুখখানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই মন দমিয়া গেল। অসম্ভব ! না, কিছুতেই না ! এখানে সে-কথা ব্যক্ত করিয়া উঁহাদের উপহাস-হাস্য-বিচ্ছুরিত রঙ্গদার যুক্তি তর্ক উপদেশ, শুনিয়া সে হৃৎপিণ্ডের কাঁচা ঘা-টা বেত্রাহত হইতে দিবে না ! তাহাতে মিথ্যা কহিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে হয়, সেও

ভাল! নমিতা ধীরভাবে বলিল, "আমি তাস খেল্‌তে জানি না।"

হিতলালবাবুর উৎসাহ অসীম! তিনি ত্রস্তভাবে বলিলেন, "না জানেন, নেই নেই; আমি শিখিয়ে দেব। চলুন। রাতদিন মেথর-মুদ্দফরাসের সঙ্গে মড়া ঘেঁটে মনটা জেরবার্ হয়ে পড়ে না! একটু আধটু বেড়ান চ্যাড়ান চাই বই কি? আপনার মত বয়েসের লোকের এমন কোটর-প্রিয়তা আমি কারুর দেখি নি! সব অনাসৃষ্টি! চলুন্, আজ আর ছাড়্‌ছি নে, বড় বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেব। এও ত একটা কম লাভ নয়!"

এমন প্রবল প্রলোভন, প্রচণ্ড সহৃদয়তা, ক্ষীণপ্রাণা নমিতার পক্ষে বড়ই বিষম অসহ্য ঠেকিল! তা ছাড়া, ভদ্রলোকের অনুরোধ ক্রমশঃ ধৃষ্টতার অঙ্কে গড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া নমিতা মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিতাও হইল। দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "এখন আমি যেতে অক্ষম। বাড়ীতে অসুখ বিসুখ। তাছাড়া, নিজের হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ায় অল্পক্ষণ হোল স্মিথের কাছে 'অপারেশন' করিয়ে আস্‌চি। কিছু মনে কর্ব্বেন না। নমস্কার।"

কাপড়ের আড়াল হইতে 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটা বাহির করিয়া সসৌজন্যে নমস্কার করিয়া নমিতা তাড়াতাড়ি সুরসুন্দরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আসুন।" নমিতা অগ্রসর হইল। সুরসুন্দরও বৃদ্ধকে লইয়া চলিল।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে উভয়ের পানে চাহিয়া দত্তজায়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন। সুরসুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, হিতলালবাবু তীব্র ঈর্ষাকুল কটাক্ষে তাহারই পানে চাহিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতে বকিতে যাইতেছেন। সুরসুন্দরের দৃষ্টিতে ক্ষিপ্ত-ঘৃণার বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। সে সবেগে মুখ ফিরাইল!

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

র কর্ত্তব্য।

বিংশ অধ্যায়—পশুপক্ষি-প্রতিপালন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুকুর।—

অনেকে কুকুরের গায়ে একটা জামা পরাইয়া তাহাকে বাটীর বাহির করেন। শৈত্য-নিবারণই এরূপ প্রথার যুক্তি। আব্-হাওয়ার তারতম্যানুসারে কুকুরের সর্দ্দি হওয়া সম্ভব; কিন্তু আমার মতে আব্‌হাওয়ায় সর্দ্দি ততটা সম্ভবপর নহে, যতটা আর্দ্র গৃহে। সত্য বটে, কুকুরে শৈত্য পছন্দ করে না। ইহার প্রমাণ এই যে, দ্বারের সম্মুখে যথায় বায়ুস্রোত প্রবাহিত, তথায় কুকুর কখনও থাকিবে না; বরং শয্যার উত্তাপে শুইয়া থাকিতেই পছন্দ করিবে। ইহাতেই বোধ

হয় যে, শৈত্য কুকুরের মনোমত নহে। কিন্তু তা বলিয়া যে, তাহার একটা কাপড়ের জামা আবশ্যক, তাহা আমি বিবেচনা করি না। কুকুরের গৃহ আর্দ্র না হইলেই হইল।

কুকুরেরা যেমন শৈত্য পছন্দ করে না, তদ্রূপ তাহারা গরমও পছন্দ করে না; সুতরাং, প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় কুকুরকে বাঁধিয়া রাখাই বিধি। কুকুরকে স্নান করান উত্তম প্রথা নহে। তাহাকে মাসে একবার স্নান করাইলে যথেষ্ট হইবে; কিন্তু প্রত্যহ তাহার চুল আঁচড়ান আবশ্যক। স্নান করাইতে হইলে, শীতকালে বেলা ১২টার সময় এবং গ্রীষ্মকালে ৯টার সময় স্নান করান উচিত। অনন্তর তাহার গাত্র মুছাইয়া দেয়া যুক্তিযুক্ত। সাবান্ দ্বারা কুকুরের গাত্র পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তদ্দ্বারা কুকুরের কেশের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। সাবান যেমন মানবের কেশের ক্ষতি-কারক তেমনি তাহা কুকুরের চুলের। ডিম্ব লাগাইলে কুকুরের চুলের পরিচ্ছন্নতার বৃদ্ধি করে। চুলে পোকা হইলে প্রত্যেক ডিম্বের কুসুমে এক চামচ তারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে পোকা মরিয়া যায়।

কুকুরকে কখনও কেবলমাত্র ভাত বা রুটি খাওয়াইয়া রাখিবে না কুকুরেরা মাংসাশী জন্তু। তাহাদিগের দাঁতই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। সুতরাং, তাহাদিগকে মাংস হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। মাংসে হরিদ্রা বা গরম-মশ্লা দিবে না। পরন্তু সপ্তাহে খাদ্যের উপর এক চামচ গন্ধক-চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। কুকুরেরা অস্থি বড় ভালবাসে। সুতরাং, মাংসের সহিত একটু অস্থি দেওয়া বিধেয়। কুকুরের জন্য জল এরূপ স্থানে রাখিবে যেন সে তাহা জানিতে পারে। কুকুর যদি খাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করে, তবে তাহাকে খাওয়াইবার কখনও চেষ্টা করিবে না। অজীর্ণ হইলে কুকুরেরা খাইতে চাহে না। অনাহার-দ্বারা উক্ত রোগের প্রতিকার করিতে চাহে। সুতরাং, সেরূপ স্থলে খাইতে দেওয়া অনুচিত।

কুকুরের রোগের ঔষধি।

দাস্ত—দাস্ত করাইতে হইলে এক চামচ শুষ্ক লবণ কুকুরের মুখে দিলে তাহার দাস্ত হইবে।

দুর্গন্ধ :—দুর্গন্ধ হইলে কৃষ্ণ লবণ ½ ছটাক ও হীরেকশ ½ ছটাক একত্র করিয়া আট আনা পরিমাণ খাদ্যের সহিত খাইতে দিবে।

অজীর্ণ :—খয়ের এক ড্রাম, খড়ি ২ ড্রাম, মিশ্রিত দালচিনি ও লবঙ্গ ½ ড্রাম, অহিফেন ৬ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং একটি করিয়া বটিকা দিনে তিন বার তাহাকে দিবে।

জ্বর :—কুইনেন ২০ গ্রেণ সেবন করানই বিধি।

কৃমি :—কৃমি হইলে ১২ ঘণ্টা কুকুরকে কিছুই খাইতে দিবে না। অতঃপর ওজন করিয়া প্রতিপাউণ্ড ওজনের গুরুত্বে এক গ্রেণ করিয়া সুপারি-চূর্ণ খাওয়াইয়া এক ঘণ্টা পরে রেঁড়ির তৈল পূর্ণ মাত্রায় খাওয়াইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

শিক্ষিতা স্ত্রী।

(ইংরাজী অবলম্বনে)

"আমি আপনার সহিত একমত হ'তে পাচ্ছি না। শিক্ষিতা স্ত্রী একটী অভিশাপ"—রামদাসবাবু মাথা নাড়িয়া এই কথা কহিলেন।

"তাই কি? কেন?—কিসে?"—এই বলিয়া মিষ্টার বসু হাসিলেন।

রা। তবে ধরুন্; প্রথমতঃ, তা'রা বড় ব্যয়বহুল।

বসু। কোন্ বিষয়ে?

রা। অনেক বিষয়েই অনেক ব্যয় করতে হয়, তাদের জন্যে।—শিক্ষিতা স্ত্রীর হাল্ 'ফ্যাশানে'র সৌখীন পোষাক অন্ততঃ মাসে একবার নূতন হওয়া চাই; তা'র 'পাউডার' চাই, 'পমেটম' চাই, সাবান চাই, ক্রিম চাই, ল্যাভেণ্ডার চাই, নানাপ্রকার সুগন্ধি এসেন্স চাই। তারপর হাওয়া খেতে 'মোটর কার' চাই, 'এয়ারোপ্লেন'—'সবমেরিন' সবই চাই।

বসু। আরও কিছু?

রা। আচ্ছা, আপনি যদি এইভাবে আমাকে বাধা দেন, তবে কিছু বল্‌বো না।

বসু। ক্ষমা কোর্‌বেন ম'শায়! আমি আপনাকে বাধা দিচ্ছি না; কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা কর্‌তেছি—তারপর?"

রা। শুনুন্, তা'র হারমোনিয়ম চাই, পিয়ানো চাই; সেতার, এসরাজ, বেঞ্জো, বেহালা কত কি চাই! কাজের মধ্যে তিনি প্রেমসঙ্গীত গাইবেন, আর কেবল বাজে গল্প করে, সভাসমিতিতে গিয়ে সময় কাটাবেন। এই জন্যে আমি, ম'শায়, শিক্ষিতা স্ত্রী মর্ম্মে মর্ম্মে অপছন্দ করি।

বসু। তবে আপ্‌নি বলতে চান্ যে, পরিণীতা স্ত্রীটীর বিনা মাইনের নির্ব্বাক্ চাকরাণী হওয়া উচিত?

রা। না হে, ম'শায়, তা নয়, সে কথা কে বলে?"

বসু। কিন্তু আপ্‌নি এখুনি বল্লেন যে, আপনি শিক্ষিতা স্ত্রী পছন্দই করেন না।

রা। না, না! আমার বল্‌বার সে অর্থ নয়! আমি বল্‌ছি, স্কুল-কলেজে পড়া স্ত্রী ভাল নয়। আমি মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে নই।

বসু। আহা! তাই বলুন না কেন? আপনি যে নিজের সীমা সংকীর্ণ করে ফেল্‌চেন!—বলুন ত, কলেজে পড়া সকল মেয়েরাই অপরিমিতব্যয়ী?"

রা। হাঁ, প্রায় সকলেই বটে!

বসু। তবে বলুন, আপনি তাদের মধ্যে কতজনকে জানেন?

রা। জানি, এই দু' একজন।

বসু। ওঃ! তবে আপনার এ বিষয়ে জ্ঞানের ভিত্তিই স্থাপিত হয় নি। ব্যক্তি-বিশেষের অভিজ্ঞতার উপর—?

রা। না না, ঠিক্ তাই নয়। আপ্‌নি যে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমার মতের সমর্থন কর্‌বে।

বসু। হাঁ, সে খুব কম; অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক! আপনি বল্‌ছেন, "যে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীকে।" আচ্ছা, আমি একজন শিক্ষিত ভারতবাসী। কৈ, আমি ত সমর্থন কর্‌ছি না! আর আমার স্ত্রীকে ত আপ্‌নি জানেনই! তিনিত একজন গ্রাজুয়েট? কিন্তু কৈ তিনি কখনও ত প্রতিমাসে—এমন কি প্রতিবৎসরেও বহুমূল্য পরিচ্ছদ বা অলঙ্কারের প্রার্থনা করেন না! অথবা 'মোটর কারে'র জন্ম আব্‌দারও করেন না। বরং আমার সংসারের তিনি এমন সুব্যবস্থা করে চালান, যাতে আমি—।" পত্নী-গুণমুগ্ধ বসু-মহাশয়ের পত্নীর গুণব্যাখ্যা রামদাসবাবুর আর সহ্য হইল না। তিনি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "আপনার কথা ছেড়ে দিন! ও রকম সকলের হয় না। কিন্তু তথাপি শিক্ষিতা স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ।

বসু। কোন্ কোন্ বিষয়ে বলুন?

রা। সকল বিষয়েই।

বসু। অনুগ্রহ ক'রে স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করুন্, দেখি।

রা। শিক্ষিতা স্ত্রীরা আয় অপেক্ষা অনর্থক ব্যয় অধিক করেন।

বসু। কেন? শিক্ষার গুণে কি তাদের আয়-ব্যয়ের জ্ঞানের অভাব ঘটে? তারা কি আপন স্বামীর ধন-সকল ছড়িয়ে উড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে দেয়? শ্রমশ্রান্ত শরীর-মনকে মধ্যে মধ্যে নির্দ্দোষ আমোদ-আহ্লাদে প্রফুল্ল করার জন্ম সঞ্চিত দু'এক পয়সা খরচ কর্‌লে বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং লাভ আছে;—কর্ম্ম-ক্ষেত্রে মন বসে ভাল। তোমরা 'থিয়েটার' যাবে, 'বায়স্কোপে' যাবে, স্বাধীনভাবে, সংসারের যেখানে যে আনন্দটুকু আছে, সে সকল অবাধে ভোগ কর্‌বে, আর নিজ-পক্ষ-রক্ষার জন্যে বল্‌বে পুরুষ-মানুষের এত কর্ম্ম-ময় জীবনে ক্লান্তিদূর আর আরামের জন্ম এ সকল চাইই: কিন্তু তোমার সঙ্গে সমান সুখ-দুঃখের ভাগী, সাংসারিক কাজে অশ্রান্ত পরিশ্রমী, একই ভাবে যার সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাটে, তোমার সেই সৌখশায়নিকী স্ত্রীর আনন্দ উপভোগের জন্ম কি রাখ? একটু আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করলে, একটু সুশিক্ষা পেলে অনেক সময় তার চিত্তভার লঘু হয়। তুমি তাতেও খড়্গহস্ত! তুমি কি তাকে একটি কলকারখানার জড় পদার্থের, বা ক্রীত-দাসীর মত রাখ্‌তে চাও? তুমি দেখছই, আমি আমার নিজের স্ত্রীকে 'বায়স্কোপ' প্রভৃতি সব দেখিয়ে আনি, মধ্যে মধ্যে।

রা। না, না। আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করে বল্‌ছি না। আমি সাধারণের কথা বল্‌ছি। আমাদের সমাজের বিশৃঙ্খলা দেখে।

বসু। সব সময় স্ত্রীকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে আমোদ দিবারই বা কি আবশ্যকতা? তিনি নিজের ঘরেই যথেষ্ট আমোদ পেতে পারেন। আর বাহিরে মেয়েদের যাওয়াও সকল সময়ে হিতকর নয়! তাকে বাড়ীতে বসে নিজের ঘরে গান-বাজ্‌না প্রভৃতি কর্‌তে দাও, উপদেশপূর্ণ পুস্তকের সাহায্য দাও, লেখা-পড়া কর্‌তে দাও, নিজে তার শিক্ষার সাহায্য করে দাও, তার সঙ্গে উন্নতি-বিষয়ে আলোচনা কর, তা'হলেই দেখ্‌বে তার শরীর ও মনের

উন্নতি হবে, সে অনেক আনন্দ পাবে; সর্ব্বদাই প্রফুল্লমুখী থাক্‌বে।

র্মা। হাঁ, হাঁ, আমি স্বীকার করি, আপনি যা বল্‌ছেন। কিন্তু কিন্তু —।

বসু। না, আর কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে। আপনি যে ঠিক্ Goldsmithএর সেই গ্রাম্য পাঠশালার স্কুলমাষ্টারের মত, পরাস্ত হয়েও হচ্ছেন না; তর্ক বজায় রাখ্‌তে চাচ্ছেন। হাঃ হাঃ!

রামদাসবাবু নিরুপায় হইয়া পলায়ন করিবার মানসে বলিলেন, "আচ্ছা, মিষ্টার বসু, আপনাকে নমস্কার। আমার এখন একটা বিশেষ দরকার আছে; আমি চল্লুম্।

বন্ধুকে চলে যেতে দেখে, মিষ্টার বসু তখন অপ্রতিভের হাসি হেসে অগত্যা উঠে দাঁড়ালেন।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ভ্রা দ্বিতীয়া।

স্নিগ্ধ আলোকে ভরিয়া হৃদয়,
প্রকাশিল ঐ দ্বিতীয়া-রবি;
উদিলা বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে
ভাই-ভগিনীর মিলন-ছবি!
জাগো এবে ত্রিশ কোটী নরনারী!—
সাদর আগ্রহ ভগিনী-পরাণে।
সারা বরষের আনন্দ হরষ
ফুটিয়া উঠুক্ ভ্রাতার কল্যাণে!
হে শুভ দ্বিতীয়া-লগন আজিকে,
অভিষেক তব আমাদের ঘরে।

সুগন্ধ চন্দনে শিশির-কুঙ্কুমে
পবিত্র প্রসূন কোমল হারে।
তোমার স্নেহের চরণ-পরশে
আসুক্ সম্পদ্ আসুক্ শান্তি।
দূর করে দাও হিংসা-দ্বেষ যত,
মলিনতা-ভরা বিষাদ-ভ্রান্তি।
আন হে আনন্দ তোমারি নামেতে,
তোমারি পূজায় হউক্ সিদ্ধি।
ভাই-ভগিনীর একতা-বলেতে
ভারতে আসুক উন্নতি-বৃদ্ধি॥

শ্রীসুনীতি দেবী।

পুণ্য-তীর্থ।

জগতে তীর্থের মাহাত্ম্য সকলেই অবগত। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকল জাতিই তীর্থ-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রোল্লিখিত ও বহুকাল হইতে শ্রদ্ধার সহিত লোক-মুখে বিবৃত সেই সকল তীর্থের নাম উচ্চারণ করিলে মানবের

মনোমধ্যে এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হয়! সেই সকল তীর্থে যাইবার জন্য লোক ব্যাকুল হইয়া উঠে। অর্থব্যয়, শক্তিব্যয় স্বাস্থ্যক্ষয়, প্রভৃতি নানাবিধ বিপৎ-পাতের সম্ভাবনা থাকিলেও নরনারী তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইতে ক্ষান্ত হয়েন না। তীর্থ-স্থান ধর্ম্মে বিজড়িত, শ্রদ্ধায় আবৃত ও আগ্রহে মণ্ডিত। ইহা লোকের ধর্ম্মাকাশের ধ্রুবতারা। ইহা জীবনাকাশের স্বাতিনক্ষত্র; ইহার একবিন্দু জলে যাত্রীর মনে মুক্তা ফলে —মোক্ষ-ফল উৎপন্ন হয়।

তীর্থ-পর্য্যটন-বাঞ্ছা পাপীর মনে তাহার পাপ-মোচনের আশার সঞ্চার করে এবং ধার্ম্মিকের মনকে ধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল ও বিভাসিত করে। ইস্‌লাম জাতির তীর্থ মক্কা-মদিনা, ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপবাসী-দিগের তীর্থ জেরুসেলাম এবং হিন্দুদিগের-তীর্থ কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, চন্দ্রনাথ, অবন্তিকা প্রভৃতি। এই সকল স্থানে যাইবার জন্য যাত্রিগণ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আমাদিগের হিন্দুর গৃহে পূর্ব্বে কত নরনারী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বামী, প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সুখময় সোনার সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া, সুকুমার শিশুদিগের স্বর্গ-জ্যোতি-বিভাসিত পবিত্র কোমল মুখ-কমলের সুন্দর হাস্যের ছটা ভুলিয়া, তীর্থে ধাবমান হইতেন! পথিমধ্যে শ্রমে ও অনাহারে শরীর শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও, জীবন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইলেও তীর্থ-ফল-লাভের আশায় তীর্থগামী ব্যক্তি তীর্থ-যাত্রা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। অস্মদ্দেশে যখন বাষ্প-শকটের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কত ব্যক্তি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করিবার পূর্ব্বে 'উইল'-পত্র সম্পাদন করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। কিন্তু তথাপি এরূপ বিপৎ-সঙ্কুল তীর্থ-যাত্রা লোকে ভুলিতে পারিত না। কত তীর্থযাত্রীকে দস্যুদল পথিমধ্যে আক্রমণ করিত, যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত, এবং অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত হরণ করিয়া চলিয়া যাইত। তবুও তীর্থ-বিশ্বাসী তীর্থ-ফলাকাঙ্ক্ষী যাত্রী তীর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিত না।

আমরা হিন্দু; আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন। আমরা পরমার্থ তত্ত্ব-নিরূপণে ব্যস্ত; সর্ব্বদাই ধর্ম্মের জন্য লালায়িত। ধর্ম্মই আমাদিগের চরম বস্তু, পরম পবিত্র মহারত্ন। আমাদিগের দেশে যত ধর্ম্মালোচনা হয়, এমনটী জগতের আর কোথায়! আমরা খাইতে, শুইতে, উঠিতে বসিতে ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া থাকি। আমাদিগের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মই আমাদিগের ধন, মান, জ্ঞান ও প্রাণ—আমাদিগের জীবন-সর্ব্বস্ব। আমরা ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু-জাতি। ধর্ম্ম আমাদিগের জাতীয় মেরুদণ্ড, আমাদিগের গৌরব-নিশান। পুণ্যসঞ্চয় আমাদিগের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য। স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য আমরা বিলক্ষণ বুঝি। একটী কার্য্য করিবার পূর্ব্বে স্বর্গের পবিত্র সুখ ও নরকের দারুণ যন্ত্রণা আমরা কল্পনার চক্ষে যত দেখিয়া থাকি, হৃদয়ে যত ভাবি, এত আর কোন্ জাতি করে? আমরা যমদূত ও বিষ্ণুদূতের কথার আলোচনা করি।

আমাদিগের দেশবাসী অতিশয় তীর্থ-প্রিয় এবং সর্ব্বদাই তীর্থ-গমনে লালায়িত হইলেও, তাঁহাদিগের স্ব স্ব গৃহ যে এক একটি পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ-ভূমি, তাহা বোধ হয়, অনেকেই মনে ভাবেন না। এই তীর্থের জল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, আকাশ, রবি, চন্দ্র, তারা সকলই পবিত্র, মনোহর, সুন্দর! এই তীর্থে কি না আছে? সকলই আছে। দয়া, মায়া, স্বার্থশূন্যতা, সহানুভূতি, পরোপকার, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সকলই আছে। ধর্ম্ম শিখিবার ও শিখাইবার এমন সুন্দর স্থান আর পৃথিবীতে, বুঝি, কুত্রাপি নাই। আমাদিগের এই গৃহ এক একটী আশ্রম ও তীর্থ। ইহাতে কত ধর্ম্মপ্রাণ মুনি ঋষি বাস করিয়া গিয়াছেন। ইহা কত রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মাদিগের পদার্পণে পবিত্রীকৃত হইয়াছে! এমন সুন্দর পবিত্র তীর্থ-চ্ছবি আর কোথায় আছে!

এই গৃহ-তীর্থে আকাশ হইতে উচ্চতর পিতা, এবং বসুন্ধরা হইতে গুরুতরা মাতার যিনি সেবার মত সেবা করিতে পারেন, তাঁহার কিসের ভাবনা? তাঁহার তীর্থফল হাতে হাতে। তাঁহাকে অধিক দূরে বাহিরে যাইতে হইবে না—গৃহে বসিয়াই পাইবেন। এ স্থানে "ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা" রূপ আজ্ঞা যিনি শিরে বহন করিতে পারেন, তিনি ধন্য;—তাঁহার মনের সুখ ও পুণ্য যথেষ্ট! যে জনক-জননী সুকুমার শিশুদিগকে স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া অন্নজ্ঞানাদি প্রদান করিয়া সুখ-সম্ভোগ করেন—তাহাদিগের বিমল আনন্দ—স্বর্গসুখ—পুণ্য-তীর্থের চরম ফল।

এই গৃহ-তীর্থের এক দেবতা স্বামী। স্বামি-সেবাই হিন্দু রমণীর প্রধান ধর্ম্ম। যিনি কায়মনোবাক্যে স্বামীর আরাধনা করেন, তিনি ইহ-পরকালে স্বর্গসুখ লাভ করেন। অস্মদ্দেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, শৈব্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় রমণীগণ এই তীর্থের এক একটী আদর্শ স্থল। তাঁহাদিগের জীবনের দেব-জ্যোতি-বিকশিত আলেখ্যে প্রত্যেক হিন্দু-গৃহ সুসজ্জিত হওয়া আবশ্যক।

যে হিন্দুর পুণ্য-গৃহ সুন্দর শিশুদিগের প্রভাতকমলসদৃশ মুখকান্তিতে সুশোভিত, বালক-বালিকাগণের নির্ম্মল হাস্যে, পরিপূর্ণ, আত্মীয় স্বজনের স্নেহময় মঙ্গল-বাক্যে আনন্দযুক্ত, দাস-দাসীগণের কোলাহলে প্রতিধ্বনিত, অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়নে আনন্দিত, জনক-জননীর স্নেহ সম্ভাষণে মুখরিত, স্বামি-স্ত্রীর সোহাগবচনে প্রফুল্লিত, তাঁহার তীর্থস্থান আর কোথায়?

মানবের গৃহই তাঁহার তীর্থস্থান। তথায় তিনি সুন্দররূপে ধর্ম্মালোচনা করিতে পারিলে তাঁহার সমস্ত তীর্থ-কামনা পূর্ণ হইবে। তাঁহার গৃহই তাঁহার পুণ্য-তীর্থ। অন্যত্র গমন করিতে হইবে না। তথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই লাভ হইবে। যিনি এই, গৃহ-তীর্থের পুণ্যসলিলে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ও পবিত্রভাবে অবগাহন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য! তাঁহার জীবন সার্থক।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

পরিতৃপ্তি।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

কেন বৃথা কর অনুরোধ,
শিশুটী কি পেয়েছ আমায় ?
কা'র মিটে প্রবল তিয়াসা
'আঙুর' 'আনার' 'বেদনায়' ?

সারা প্রাণে জ্বলিলে অনল
ধূ ধূ ধূ ধূ রাবণের চিতা,
নাহি বল, নাহি যে অভয়,
চিন্তা-ভারে রহি ক্লান্ত ভীতা !

শূন্য মোর হৃদয়-মন্দিরে
যবে হবে পূজা-আয়োজন,
দেবতারে অরঘ সঁপিয়া
দূরে যাবে তিয়াসা ভীষণ।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

অদৃষ্ট-লিপি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে অনেক দিনের কথা। কলিকাতায় —নং কলেজ ষ্ট্রীটে, রমাকান্ত ঘোষ, এল্, এম্, এস্-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাড়ীটি বেশ সুন্দর। উপরতলায় ডাক্তারবাবু সপরিবারে বাস করিতেন; নীচের তলায় ডিস্‌পেন্‌সারি ছিল। ডাক্তারের চেহারা পরম সুন্দর। লোকে তাঁহাকে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান, মিষ্টভাষী বলিয়া জানিত। সকলে মনে বুঝিত ডাক্তারের চিকিৎসা-বিদ্যায় যেমন অভিজ্ঞতা, হাতযশঃও সেই রকম। এ-রকম লোকের প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে বেশী দিন লাগে না। অল্প দিনের মধ্যেই রমাকান্তের অর্থ ও যশঃ অর্জ্জিত হইতে লাগিল।

কিশোর বয়সেই রমাকান্ত মাতাপিতৃহীন হইয়া, পৈত্রিকভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থদ্বারা বিদ্যাশিক্ষা করেন। এখন পরিজন বলিতে, একমাত্র ভার্য্যা ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরীও মাতাপিতৃহীনা। তাহার পিতৃকুলে কেবল অগ্রজ গোপীনাথ এবং ভ্রাতৃজায়া মোহিনী ছিলেন। শ্বশুরকুলে স্বামী ভিন্ন অন্য কোনও আত্মীয় ছিল না। অতএব বালিকা-বয়স হইতেই ভুবনেশ্বরী তাহার হৃদয়পূর্ণ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও মমতারাশি তাহার স্বামীর চরণে অঞ্জলি দিল। সে-দান রমাকান্ত যেমন সাদরে গ্রহণ করিলেন, তেমনি সাগ্রহে প্রতিদানও করিলেন। এমনি সুখের দিনে তাঁহাদের একটী পুত্র-সন্তান জন্মিল।

সেবারে আষাঢ় মাসের প্রথমে পুরীধামে রথযাত্রা দেখিতে রমাকান্তের বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে ইচ্ছুক হইলেন। কয়জনে রমাকান্তকে তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্য চাপিয়া ধরিলেন। রমাকান্তের দেশ-ভ্রমণের সাধ চিরদিনই প্রবল। বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহা আবার প্রবলতর হইয়া উঠিল। তাই একদিন পত্নীর হাতে ধরিয়া, দুই-বৎসরের পুত্র সুধীরকে চুমা খাইয়া, ধীরে ধীরে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার প্রস্তাব করিলেন।

শুনিয়াই ভুবনেশ্বরীর বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। দূরদেশে যাওয়া; অসুখ-সম্ভাবনা, শুশ্রূষার ত্রুটি—পলকের মধ্যে এমনি কত কথা তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় খেলিয়া গেল। আসল কথা, সে তাহার স্বামীকে—সে তাহার একমাত্র সুহৃদ্, একমাত্র আত্মীয় স্বামীকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারে না। কিন্তু ওঁর যখন পুরীতে যাইবার এত আগ্রহ, তখন তাহাতে বাধা দেওয়াও বড় স্বার্থপরের কাজ। স্বামীকে একবিন্দু দুঃখ দিতে ত সে পারে না। তখন শ্রীক্ষেত্রযাত্রী বন্ধুবান্ধবদিগকে মনে মনে গালি দিতে দিতে, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, সাধ্বী সলজ্জভাবে বলিল, "তা তুমি যদি যাও, তবে আমাদেরও নিয়ে চল। তোমায় ছেড়ে থাকা যায় না"। কথা শুনিয়া রমাকান্ত যেমন প্রীত তেমনি ব্যথিত হইলেন। পত্নীকে খুব আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমায় কি ছেড়ে থাকা যায়, লক্ষ্মি? তোমার তবু দাদা আছেন, বৌদি আছেন। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বল দেখি? এ জগতে আমার ভালবাসিবার যদি কিছু থাকে, তবে সে তুমি; আমার যদি 'আমার' বলিতে কিছু থাকে, তবে সে তুমি। তোমায় ছেড়ে আমি কয়দিন থাকৃতে পারি বল ত? তুমি আমার উপরে রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটী আমার! আমরা বজ্‌রায় চ'ড়ে যাব। তাতে তোমার আর খোকার যাওয়ার সুবিধে হবে না। শুনচি ওদিকে শীঘ্র রেল খুলবে। তখন তোমাদের নিয়ে আবার বেড়া'তে যাব।"

তথাপি পত্নীর ম্লান মুখ এবং ছল-ছল চক্ষু দেখিয়া রমাকান্ত আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার জন্যে কিছু ভেব না। তুমি ত ভগবানের চরণে নির্ভর কোরে থাকৃতে জা'ন। তাঁরই কৃপায় তোমরা ভাল থাকবে, আমি ভাল থাকব। প্রত্যহ আমি তোমায় চিঠি লিখ্‌ব। এই কয়টা দিনের জন্য তুমি কেন কাতর হোচ্চ? তোমার হাসিমুখ না দেখ্‌লে স্বর্গে গিয়েও আমি আনন্দ পাব না। তুমি ত আমার মনের কথা জা'ন। আর দাদাকে তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তোমার বৌদিকেও নিয়ে এস।"

এই সব কথার পরে ভুবনেশ্বরী আর কিছু কাতরতা প্রকাশ করিল না। যথাসময়ে গোপীনাথ ভগিনীর অভিভাবক হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তপ্ত অশ্রু মুছিতে মুছিতে রমাকান্ত ও ভুবনেশ্বরী, পরস্পরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীমা—।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

বঙ্গদেশ।—কালীঘাট।

কালীঘাট কলিকাতায় অবস্থিত। ইহার নিম্ন দিয়া পূতসলীলা গঙ্গাদেবী কলনিনাদে প্রবাহিতা। প্রবাদ এইরূপ যে, সতী দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহার মৃত শরীর লইয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহাদেবকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত বিষ্ণু তাঁহার সুদর্শন-চক্র-দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যে যে স্থানে সতীর দেহাংশ পতিত হইল, সেই সেই স্থান পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হইল। কালীঘাটে সতীর একটি অঙ্গুলি পতিত হয়। সুতরাং এখানকার কালী অত্যন্ত বিখ্যাত। হিন্দুরা কালীকে পরব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া থাকেন। কালী-নামে ভগবানের কালস্বরূপা শক্তিকে বুঝায়। অথবা কাল-শব্দে সংহার, ও ঈকারে তৎকর্ত্রী; অর্থাৎ সংহার-কর্ত্রী। ইহাই কালী-নামের ব্যাখ্যা। যাঁহাতে সকলই লয় পায়, তাঁহাকেই কালী বলা যায়। ইনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা; তাই কালরূপে সকলের আদিতে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে অন্য কোনও বস্তু ছিল না। সেইজন্য মনু "আসীত্তমোময়ং লোকমনর্ক-গ্রহতারকং" বলিয়াছেন। ইহাতে আমরা ইহাই বুঝি যে, পূর্ব্বে কেবল অন্ধকারময় লোক ছিল, সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপতি গ্রহ-তারকা কিছুই ছিল না। সুতরাং, সেই সময়কেই কালবাদীরা ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং, সেই কালস্বরূপ পরমাত্মা শক্তিযোগে কাল ও কালীরূপ প্রকাশে দুইরূপ হইলেন। শ্রুতিতেও আছে যে "স একাকী নরমেত, অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। অনন্তর সেই কাল ত্রিবিৎকরণ-দ্বারা তিনগুণে ব্যাখ্যাত হইলেন; যথা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান; অথবা তমঃ, রজঃ ও সত্ব। মোট কথায়, সৃষ্টিকাল, স্থিতিকাল ও নিধনকাল। সর্জ্জনকালের নাম রজঃ; সুতরাং ইহা ব্রহ্মরূপ। স্থিতিকালের নাম সত্ব; সুতরাং ইহা পালনকর্ত্তা বিষ্ণুরূপ। সংহারকালের নাম তমঃ; সুতরাং রুদ্ররূপ। এই রুদ্রের নাম কালাগ্নি। অতএব কালী বলিলে হিন্দু ব্রহ্মকেই বুঝেন।

কালীর তিনটী গুণকে তিনটী চক্ষু বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোথাও বা "চন্দ্রার্কানললোচন" ও বলিয়াছেন। এই সত্ব-গুণ সোম, রজোগুণ রবি এবং তমোগুণ অগ্নি। তাই কালীর অন্য একটী নাম ত্রিগুণা; অর্থাৎ তিনিই আদ্যা সমস্ত-জগৎ-প্রকাশিকা, সমস্ত জগৎ-পালিকা এবং সমস্ত জগৎ-বিনাশিকা। সূর্য্যে উৎপত্তি, চন্দ্রে স্থিতি ও অগ্নিতে বিনাশ দেখা যায়। জীব-শরীরেও আমরা দেখিতে পাই, শোণিতে উৎপত্তি, শুক্রে স্থিতি এবং অগ্নিতেই লয়। এই শোণিত রজোরূপী সূর্য্য, শুক্র সত্বরূপী চন্দ্র এবং রুদ্রস্বরূপ তমোরূপী কালাগ্নি। যে কালাগ্নি-দ্বারা জীব লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই কালী-নামে অভিহিতা।

পরব্রহ্মের নিকটে যাবতীয় বস্তু, কিছুই

অগোচর নহে। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালকেই দেখিতেছেন। এইজন্য কালী ত্রিনয়না। জীবমাত্রেই কাল-দ্বারা বিনষ্ট হয় বলিয়া জীব কালের হারস্বরূপ। তাই নানাবর্ণের নরমুণ্ড কালীর কণ্ঠভূষণ।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় শ্রুতিই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। সুতরাং, কালীর কর্ণদ্বয়ে দুই শিশু সংলগ্ন আছে। শাস্ত্রে অর্দ্ধচন্দ্রচ্ছলে অর্দ্ধমাত্রাকে নাদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাই কালরূপ কালী নাদরূপে পরিণতা। সেই নাদই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেদের শিরোভাগে অবস্থিতি করেন। এ-কারণ, কালী প্রণব-স্বরূপা। কালীকে কেহ কেহ দন্তুরা ও বলেন; অর্থাৎ কালের দংষ্ট্রে সকলেই অবস্থিত। ইনি আলোল-রসনা শব্দেও অভিহিত হয়েন। এই শব্দ দ্বারা আমরা ইহাই বুঝি যে, জিহ্বার নাম রসজ্ঞা। আত্মার সত্তাতেই জগতের যাবতীয় রসাস্বাদন হইয়া থাকে। বাহেন্দ্রিয়ের রসাস্বাদনে কোনও ক্ষমতাই নাই। তাই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এ-কারণ, কালী জিহ্বা বিস্তার করিয়া আছেন; অর্থাৎ তিনি 'আমিই সমস্ত রসের আস্বাদনকর্ত্রী, আমার সত্তাতেই জীবের রসবোধ হইয়া থাকে' ইহাই জানাইতেছেন।

কালী মুক্তকেশী। কেশ-শব্দে মায়াজাল। পরব্রহ্ম হইতে মায়া অবতীর্ণা হইয়া জগৎকে আচ্ছাদন করে বলিয়া, মুক্তকেশী-শব্দে ইহাই বুঝায় যে, কালীর স্বরূপ-বেত্তা জীবের মায়া-পাশ হইতে পরিমুক্ত হয়। এই কারণেই কালীকে মুক্তকেশী বলা হয়।

কালী চতুর্ভুজা। শাস্ত্রে পুরুষার্থ চতুষ্টয় ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকে বলে। তাই এই চারিটী কালীর হস্ত। যে হস্তে বর সেই হস্তই ধর্ম্মস্বরূপ। যে হস্তে অসি তাহাই অর্থ। রাজ্যলাভেই সম্যক্ অর্থের লাভ হয়। বিনা অসি রাজ্যজয় হয় না। সুতরাং যুদ্ধার্থে জীবকে শস্ত্রপাণি হইতে হইবে। যে হস্তে মুণ্ড সেই হস্তই কাম অর্থাৎ অভিলাষ। বিনা শত্রু-নিপাতে অভিলাষ পূর্ণ হয় না। যে হস্তে অভয় সেই হস্তই বিশুদ্ধ মোক্ষ। যে পর্য্যন্ত জীব মোক্ষলাভ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার ভয় দূর হয় না। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা ভয়হীন! এই জন্য কালীর অভয়প্রদ হস্তকে চতুর্ব্বর্গের শেষবর্গ মোক্ষস্বরূপ কহা হইয়াছে।

কালী দিগম্বরী। সর্ব্বব্যাপক কালের পরিধি নাই; সুতরাং চারিদিক্‌কেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন।

কালীর চরণতলে শবরূপে কালের অবস্থিতি। কাল শব্দে মৃত্যু। সেই মৃত্যু যে শক্তিতে পরাভূত হইয়া শববৎ পতিত আছে, তাহাই ব্রহ্মস্বরূপা কালী।

কুল্লা কুরুল্লাদি অষ্ট নায়িকা অষ্টসিদ্ধিরূপে ব্রহ্মরূপা কালীর পরিচর্য্যা করেন। ইহা-দ্বারা বুঝা যায় যে, পরব্রহ্মের পরিচারিকা অষ্টসিদ্ধি। শমদমাদি অষ্টাঙ্গযোগই অষ্ট নায়িকা। এইগুলিই লোকদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করে।

কালীঘাটে কালীর যে মন্দির দেখা যায়, তাহা ৩৩০ বৎসরের পুরাতন। বরিসার সাবর্ণ চৌধুরীর দ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি মন্দির-পরিচালনার জন্য ৬৮৮ বিঘা জমী দান করেন। চণ্ডীচরণ-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মন্দিরের প্রথম ব্রাহ্মণ নিযুক্ত

হ'ন। তাঁহার বংশধরগণ হালদার-নামে খ্যাত। ইঁহারাই মন্দিরের মালিক। দুর্গা-পূজার অষ্টমীর দিন কালীঘাটে আড়ম্বরপূর্ণ পূজাদি হইয়া থাকে।

তীর্থসেবিগণ কালীঘাট-দর্শন করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী নকুলেশ্বরের দর্শন করেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জল Hydrogen বা উদজান এবং Oxygen বা অম্লজানের মিশ্রণে উৎপন্ন বস্তু। এই দুইটি জিনিষ মিশে একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য হয়ে গেছে। জল কখনও স্থির থাকে না, জল সর্ব্বদা নিম্নগামী, নীচের দিকে যায়; এবং নানা-স্থানে ফিরে ঘুরে শেষে সমুদ্রে পড়ে। জলের স্রোত জমির উপর এবং ভিতর দিয়া চলে। ভিতরের জলকে চোয়ান জল বলে। জল এইরূপ গতিশীল না হইলে আমাদের বড়ই কষ্ট হইত।

জলের মূল ভাণ্ডার সমুদ্র। সমুদ্রের জল নিতান্ত লোণা। মানুষ ইহা ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রের জল এরূপ লোণা না হইলে, নষ্ট হইয়া যাইত। বিধাতা জল পরিষ্কার করিবার জন্য অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছেন। তাঁহার বকযন্ত্র চোয়ানের কল অহনির্শ চলিতেছে। সমুদ্র হইতে সূর্য্যের তাপে যে বাষ্প উঠে, তাহাতে লবণ কিম্বা অন্য কিছু জিনিষ থাকে না। সেই বাষ্প আকাশের উপর শীতল স্থানে গিয়া মেঘের আকার ধরে এবং এই মেঘ একত্র ও ঘন হয় এবং তাতে ঠাণ্ডা লাগিলে বৃষ্টি হয়। পৃথিবীর উপরে যেখানে যত প্রকার জল আছে এবং জড় উদ্ভিদ্ ও জীবদেহে যে জল আছে, সে সমস্ত হইতেই বাষ্প উঠে। হিমালয় বা অন্যান্য শীতল পর্ব্বতে জলীয় বাষ্প বরফের আকার ধারণ করে এবং সূর্য্যতাপে সেই বরফ গলিয়া নানা আকার ধরে। প্রস্রবণ, নদ,নদী প্রভৃতি নানা-প্রকারের জলস্রোত হয়। নদী, প্রস্রবণ, হ্রদ আমাদের প্রধান জল-ভাণ্ডার। তা'ছাড়া পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিয়া জমির ভিতরের স্রোত হইতে জল উঠাইয়া লইয়াও আমরা ব্যবহার করি। পুষ্করিণী ও কূপ যথেষ্ট পরিমাণে গভীর না হইলে তা'র জল স্বাস্থ্য-কর হয় না। জমির উপরিভাগের মাটির তলায় এঁটেল মাটি আছে। সেই মাটিকে ভেদ করিয়া percolation (চোয়ান) এর জল যাইতে পারে না।

এই এঁটেল মাটি ভেদ করে জল আনিলে

জল স্বাস্থ্যকর হয়, সেইজন্য কূপ এবং পুষ্করিণী ততটা গভীর করিতে হয়।

পুষ্করিণী এবং কূপের জল পরিষ্কার রাখিবার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়। কারণ, জলের মধ্য দিয়া নানাপ্রকার রোগ-বীজ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের স্থানীয় পানীয় জল বিশেষভাবে পরিষ্কার হওয়া চাই। পানীয় জল প্রথমে ফটকিরি বা নির্ম্মলী ফল দিয়া পরিষ্কার করিয়া দশ মিনিট ফুটাইয়া লইলে অনেকটা দোষ কেটে যায়। ফটকিরি অনেক প্রকার বীজ নষ্ট করে; কিন্তু ইহার পরিমাণ বেশী হইলে জল বিস্বাদ হয়।

জল আমাদের কি উপকার করে ? জল ব্যতীত কোন জীব বা উদ্ভিদ্ বাঁচিতে পারে না। আমাদের শরীরের ওজনের প্রায় বার আনা অংশ জল। তা'র অল্প অংশই আমরা খাদ্য হইতে পাই। তাহার অধিকাংশই জল ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্য হইতে পাই। জল ব্যতীত আমাদের kidney বা মূত্রাধার এবং অন্যান্য যন্ত্র কাজ করিতে পারে না, ঘাম ভালরূপে নির্গত হইতে পারে না, ত্বক্ (চাম্ড়া) শুষ্ক ও অপরিষ্কার হয়। জল অভাবে আরও অনেক প্রকার অনিষ্ট হয়। উদ্ভিদ্ ফল মূল নানাপ্রকার আনাজ জন্মায় না। সেজন্য অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে অনেকেরই কষ্ট এবং কাহারও বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়।

স্বাভাবিক বৃষ্টির জলেই প্রায় সকল প্রকার ফসল রক্ষা করে। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে খাল (canal)-দ্বারা নদী ও পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া ছোট ছোট নালা-দ্বারা ক্ষেতে জল দেওয়া যায়। এইরূপ জল দেওয়াকে Irrigation 'ইরিগেসন' বলে।

আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট (সরকার-বাহাদুর) লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া জলপ্রণালী, করেছেন। তদ্দ্বারা নানা স্থানের কৃষিকার্য্য চলে। এইরূপ না করিলে কত লোকের কত কষ্ট হইত। ইংরাজ-রাজ্যে প্রজার সুখ-সুবিধার জন্য কতই ব্যবস্থা আছে। সে সমস্ত জানিলে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া থাকা যায় না।

জলের আমাদের কতই প্রয়োজন ! দেহ গৃহ, কাপড়, বাসন, প্রভৃতি জল ব্যতীত কি পরিষ্কার হয় ? তৃষ্ণায় জলপান এবং ক্লান্ত উত্তপ্ত শরীরে স্নান করিলে যে কত সুখ ও আরাম হয়, তা কি একমুখে বলা যায় !

কে ভাঙ্গিতে পারে তৃষ্ণা শুখাইলে মুখ,
স্নানের সময় এত কেবা দিত সুখ !
জল বিনা একদণ্ড বাঁচিতে না পারি,
দয়াময় হরি তাই সৃজিলেন বারি।

শ্রীরাজমোহন বসু।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

১। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে যিনি সহায় করিয়াছেন, ও তাঁহার উপরেই যাঁহার সকল আশা ভরসা, তিনিই সুখী।

২। বিজ্ঞেয়োঽক্ষরসন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্। বিহায় শব্দশাস্ত্রাণি যৎসত্যং তদুপাস্যতাম্॥ সন্মাত্র অক্ষর বস্তুই বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য, জীবনও চঞ্চল। সকল শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া, যাহা সত্য, তাহাই অবলম্বন কর।

৩। কবির শ্বাস সুফল সোই জানিয়ে,
হরিকা সুমিরণ লায়ে।

কবির বলিতেছেন, সেই শ্বাসই সফল জানিও, যে শ্বাস হরি-স্মরণেতে লাগিয়া যায়।

৪। কবির গোবিন্দ্‌কে গুণ গাওতে, কভু না কিযিয়ে লাজ্।

কবির বলিতেছেন ঈশ্বরের গুণগান করিতে কখনও লজ্জা করিও না।

৫। Sing unto the Lord with thanks-giving : sing praise upon the harp unto our God :

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রভুর গুণগান কর, বীণাবাদনপূর্ব্বক আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গান কর।

৬। অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে-ব্যক্তি শ্বপচ (চণ্ডাল) হইলেও কেবল সেইজন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করেন, তাহারাই হোম করেন, তাঁহারাই তীর্থস্নান করেন, তাঁহারাই আর্য্য (সদাচারী), এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করে।

৭। কবির সোণা রূপা কাল হায়, কঙ্কর্ পাথর হীর্। এক্ নাম মুক্তামণি, তাকো জপহি কবির।

কবির বলিতেছেন, সোনা-রূপাই কাল; হীরা কাঁকর পাথর। এক নামই আমার মুক্তামণি; তাহাকেই কবির জপ করেন।

৮। সংসার আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করি ভব তরিবারে॥
(চৈতন্যদেব)।

৯। সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্মকে অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই তোমার সকল অভাব পূর্ণ হইবে ও অভাবের অতিরিক্ত দান পাইবে।

১০। কবির হরি-রস্ এয়ো পিয়া, বাকি রহিম ছাক।
পাকা কলস্ কোঁ ভারকা, বহুরি চড়ে নহি চাক।

কবির বলিতেছেন, হরিরস যে একবার পান করিয়াছে, তাহার আর কোনও রসের সখ্ থাকে না; যেমন পোড়া কলসী পুনরায় আর কুমারের চাকে চড়ে না।

১১। কবির কহৎ শুনৎ জগ্ যাৎ হায়,
বিখয়ন্ সুঝে কাল।
কহেঁ কবির রে প্রাণিয়ঁ।!
বাণি ব্রহ্ম সঁভাল

কবির বলিতেছেন, কহিতে কহিতে শুনিতে শুনিতে জগৎ চলিয়া যাইতেছে বিষয়রূপ বিষে কালকে দেখিতে দিতেছে না। কবির তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, "রে প্রাণিগণ! ব্রহ্মের বাক সাম্‌লাও, অর্থাৎ ধরিয়া রাখ।"

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

নিদাঘের অপরাহ্ন। প্রখর রবি সারাটি দিন ধরণীকে দগ্ধ করিয়া, বৃক্ষলতা-সকল ঝলসাইয়া দিয়া, পথিকের শিরে অগ্নিবর্ষণ করিয়া এইবার ক্লান্তভাবে পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মধুমতী-তীরে ঝাউ ও বটবৃক্ষের শাখায় বসিয়া বায়স উচ্চ চিৎকারে দিগন্ত মুখরিত করিতেছে; অন্যান্য পক্ষিকুলও স্ব স্ব রবে সন্ধ্যার আগমনী গাহিতেছে। নদীবক্ষে তরণী-সকল আরোহী লইয়া ধীর-মন্থর গতিতে গমনাগমন করিতেছে। দূরে বাষ্পীয় লৌহ-শকটের বংশীধ্বনি শ্রুত হইতেছে। তন্মধ্যস্থিত আরোহিগণের অস্পষ্ট আয়তন গবাক্ষ-পথ দিয়া দেখা যাইতেছে। এরূপ সময়ে নদী তীরে বসিয়া হরনাথবাবু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে বায়ুকোণে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল। পথের ধূলা উড়াইয়া বাতাস মেঘের সঙ্গে ছুটিল। পল্লী-বালক-বালিকাগণ ডালা-চুপ্ড়ি হস্তে লইয়া আম কুড়াইবার জন্য বাতাস ঠেলিয়া ছুটিল। তখনও বৃষ্টি পড়ে নাই; শুধু বাতাস বহিতেছিল। হরনাথবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৃহে ফিরিবেন কি-না, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় বাতাস ঠেলিয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সহাস্য আস্যে একটী ষোড়শ বৎসরের বালক আসিয়া একখণ্ড কাগজ হরনাথবাবুর হস্তে দিয়া বলিল, "বাবা, আমি 'পাস' হয়েছি; 'ফার্ষ্ট' হয়েছি। এই দেখুন, কাকা 'টেলিগ্রাম' করেছেন।" এই বালকটি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সুধীর; আর তাহার কাকা, হরনাথ-বাবুর জনৈক প্রতিবেশী; গ্রাম-সম্বন্ধে হরনাথ-বাবুর ভাই হ'ন্।

সুধীর 'টেলিগ্রাম'-খানি হরনাথবাবুর হাতে দিলে হরনাথবাবু তাহা দেখিবেন কি! আনন্দাশ্রুতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। আর অলক্ষ্যে বক্ষ ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাসও যে না বহিয়াছিল, তাহা নহে! হায়, রাজলক্ষ্মি, আজ তুমি কোথায়? তোমার কত তপস্যার ধন সুধীর আজি প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে! —কত ধনাঢ্যের সন্তানকে অতিক্রম করিয়া দরিদ্র বালক আজি তাহাদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে! এ সুখের অংশ গ্রহণ করা রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যে নাই! তাই আজি হরনাথবাবুর এ আনন্দ-সংবাদেও দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়াছিল; আনন্দাশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে একবিন্দু শোকাশ্রুও ঝরিয়াছিল!

সুধীর বলিল, "'টেলিগ্রাম'-খানা পড়ে দেখুন না বাবা!" তখন হরনাথবাবুর চিন্তা-স্রোত রুদ্ধ হইল। তিনি 'টেলিগ্রাম'-খানায় চক্ষু বুলাইয়া বলিলেন, "হাঁ—বাবা, পড়েছি। এখন চল, মা কালীর বাড়ী পূজা দিয়া আসি।" তখন হরনাথবাবু গ্রাম্য কালী-মন্দিরে গিয়া পুত্রের মঙ্গল-কামনায় কালীর পূজা দিয়া আসিলেন।

যথাকালে গেজেট বাহির হইল; সুধীরের উচ্চবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। গ্রামের লোক ভাবিল, এছেলে কালে একজন 'কেষ্ট' "বিষ্ণু"-গোছ না হয়ে যায় না। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া সে এত বড় একটা হইয়া উঠিয়াছে; বিদ্যালয়ও ইহাতে গৌরবান্বিত হইল!

সুধীরের বাসনা, সে বি-এ, এম্-এ পড়িয়া কালে একজন কৃতবিদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। হরনাথবাবুরও যে ইহা ইচ্ছা নহে, তাহা নহে; তবে তিনি এক বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। এবার সুধীরকে এফ্এ পড়িতে হইলে কলিকাতায় যাইতে হয়। কলিকাতা যাইলেই পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিবে। একমাত্র নয়ন-মণি, অন্ধের যষ্টি, হৃদয়-নিধিকে প্রবাসে পাঠাইয়া তিনি কি প্রকারে গৃহে অবস্থান করিতে পারিবেন? সুধীরকে ছাড়িয়া তিনি কিরূপে জীবনধারণ করিবেন! কখনও বা তিনি মনে করিলেন, গৃহদ্বারে তালা লাগাইয়া তিনিও সুধীরের সঙ্গে কলিকাতায় বাস করিবেন। সুধীর ছাড়া তাঁহার কিসের সংসার! কিন্তু আবার সে কথাটা যুক্তি-সংগত বলিয়া মনে হইল না। কারণ, গৃহ-ত্যাগ করিয়া যাইলে ঘর-দোর ত সব মাটী হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন বাগান-বেড় জায়গা-জমী যাহা আছে, তাহাও যে নষ্ট হইয়া যাইবে! ফসল যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহাও আর পাওয়া যাইবে না। তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের তাহাই যে একমাত্র উপায়! সুধীরও মনে মনে এইরূপ কত চিন্তা করিতে লাগিল। কখনও বা সে কল্পনায় পিতাকে ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিয়া তুলিত। আবার কখনও বা পিতৃ-বিরহজনিত আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িত। বিদেশ বিভুঁয়ে একা সে কিরূপে থাকিবে! সেখানে কে তাঁহাকে এমন স্নেহ যত্ন করিবে? বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন-কালে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কে তাহার প্রতীক্ষা করিবে? আর সেই-বা গৃহে ফিরিয়া কাহার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে? সেখানে ত বাবা নাই! সে যে মাতৃহারা বালক! পিতার অপরিসীম স্নেহই যে তাহার সমস্ত জীবনটী ভরিয়া রাখিয়াছে। পিতার ভালবাসাই যে তাহার জীবনের সম্বল! পিতাকে ছাড়িয়া একা সে কিরূপে থাকিবে!

পিতা-পুত্র উভয়েরই যখন মনের ভাব এইরূপ, তখন কাজেই সুধীরের পড়িবার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিক দিন তাহার এ অবস্থায় গেল না। পিতা-পুত্র উভয়েরই যুক্তি-তর্ক খণ্ডিত হইয়া গেল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সুধীরকে একাকীই কলিকাতায় যাইতে হইল। হরনাথবাবুর অনৈক প্রতিবেশীর পুত্র কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। সে আসিয়া একদিন হরনাথবাবুকে বলিল, "আপনি স্নেহের আধিক্যে সুধীরের ভবিষ্যৎ নষ্ট কর্ব্বেন না। সুধীরকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন্; আমাদের সঙ্গে আমাদের 'মেসে' থাক্‌বে; আমি তাকে দেখ্‌ব আপ্‌নার কোনো ভাবনা নেই। আপনিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আস্‌বেন। তা ছাড় বছরে দু'বার 'কলেজ' বন্ধ হবে। পূজার বন্ধে গ্রীষ্মের বন্ধে সুধীর দেশে আস্‌বে। আপনা ভাবনা কিসের? এমন ছেলে যদি এই পল্লী গ্রামে ব'সে থাকে, ওর ভবিষ্যতে উন্নতি আশা একবারে মাটী হয়ে যাবে।" অগত্য হরনাথবাবু সম্মত হইলেন।

যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। পিতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে সুধীর উক্ত প্রতিবেশীর সহিত কলিকাতায় যাত্রা করিল। পুত্রগতপ্রাণ হরনাথবাবু সুধীরের মুখ চুম্বন করিয়া সাশ্রুনয়নে বিদায় দিলেন। হায়, এ হৃদয়নিধিকে মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষের অন্তরাল করিতে যে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, বুক চিরিয়া বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখেন। এই দুঃখময় জগতে অপত্যস্নেহ কি একটী স্বর্গীয় পদার্থ! ইহা নন্দনের পারিজাত, চন্দ্রের সুধা, সংসার-পীড়া উপশমের ধন্বন্তরি-হস্ত-নিঃসৃত অমোঘ ঔষধ। সন্তানের ন্যায় প্রিয় বস্তু এ সংসারে আর কিছুই নাই। বারংবার প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিবার আদেশ দিয়া, হরনাথবাবু সুধীরকে বিদায় দিলেন! সুধীর সম্মতি-সূচক মস্তক সঞ্চালিত করিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে গমন করিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্রকে দৃষ্ট হইল, হরনাথবাবু ততক্ষণ একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন সুধীর অদৃশ্য হইয়া গেল, তখনও তিনি তেমনই ভাবে চাহিয়া রহিলেন! ভাবিলেন, ঐ বুঝি, গাছের ফাঁক দিয়া ঝোপের আড়াল হইতে পুত্রকে অস্পষ্ট একটু দেখা যাইতেছে! ঐ বুঝি, তাহার পরিধেয় বসনের কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে! ঐ-ঐ বুঝি ওটা তাহার ছায়া!—না না, ও যে একটা গাছের ছায়া! সন্তানবৎসল উদ্‌ভ্রান্ত পিতা সজ্ঞাশূন্য, নির্ব্বাক্, নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ধরণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; প্রকৃতিরাণী ধূসর-বসনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবৃত করিলেন;—আর কিছুই দৃষ্ট হইল না! তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে হরনাথবাবু গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

তৃতীয় দিনে অতিপ্রত্যুষে উঠিয়া হরনাথ-বাবু ডাকঘরে উপস্থিত হইলেন। তখনও ডাকঘর খোলা হয় নাই। ৮টার সময় ডাক বিলি হয়। যথাসময়ে 'পোষ্ট মাষ্টার'-বাবু আফিস গৃহে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই হরনাথবাবু ব্যগ্রভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়! আমার কোনো চিটী আছে কি?" 'পোষ্ট-মাষ্টার' বাবু হরনাথেরই গ্রামবাসী এবং বিশেষ পরিচিত। তিনি হরনাথবাবুর সকল কথাই জ্ঞাত ছিলেন। কস্মিন্ কালেও হরনাথবাবু ডাকঘরে আসিয়া চিটীর জন্য তাগাদা করেন না। সুধীর কলিকাতায় গিয়াছে, সেইজন্যই যে হরনাথবাবু চিঠির সন্ধানে আসিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনার ত কোন চিঠি নেই! বোধ হয়, আপনি সুধীরের খবরের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু সে ত মোটে পরশু কল্‌কাতায় গেছে, এখনও তার চিটী আস্‌বার সময় হয় নি। হয়ত, কাল আপনার চিঠি আস্‌তে পারে।" হরনাথবাবু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি যে নেহাৎই নির্ব্বোধের মত কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বুঝিলেন ও লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে একবার ডাক-ঘরে আসা তাঁহার একটা দৈনিক কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইল।

সুধীর কলিকাতায় পৌঁছিয়া পিতার আদেশ

প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিত। ইংরাজ-রাজের কৃপায় প্রবাসগত আত্মীয়ের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের ইহা একটি মহা সুযোগ। ডাকঘর তাহাদের পক্ষে মহাতীর্থ-ক্ষেত্র। সন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি-প্রস্রবণ!

(৬)

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে সুধীরের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সে আজন্ম পিতৃস্নেহে লালিত, পক্ষি-শাবকের ন্যায় পিতার স্নেহময় বক্ষে বর্দ্ধিত! পিতার সে স্নেহনীড় ছাড়িয়া অন্যত্র বাস তাহার পক্ষে যে কষ্টকর হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে জীবনে এক দিনও পিতার অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থান করে নাই, প্রবাসে একাকী সে কি প্রকারে স্থির থাকিবে? এখানে ত সে 'কলেজ' হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্নেহময় জনকের দর্শন পায় না! কেহ ত তাহার জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে পথ-পানে চাহিয়া থাকে না! পাঠ্য পুস্তক-গুলি অযত্নে অবিন্যস্ত ভাবে শয্যার চতুঃপার্শ্বে পতিত থাকে, কেহ সেগুলি যত্ন করিয়া গুছাইয়া রাখে না! পাঠের সময় একখানি পবিত্র আনন আনন্দ-গদ্‌গদ চিত্তে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে না! এ যে আত্মীয়-বন্ধু-বিহীন প্রবাস!—এ যেন পথিকের পান্থ-শালায় অবস্থানের ন্যায় তাঁহার অনুভব হইত। ঘটিকা-যন্ত্রচালিত হইয়া স্নান কর—খাও; কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে আর আহার মিলিবে না। আহার্য্য দ্রব্যই বা কি পরিপাটী! ফেন-মিশ্রিত দাল, খোষা সংযুক্ত কুমড়া-আলুর তরকারি, "জলবৎতরলং" মৎস্যের ঝোল! কোথায় পিতার স্বহস্ত-প্রস্তুত সেই সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন, আর কোথায় এই উড়িষ্যা-দেশবাসী পাচকের কদর্য্য রন্ধন! পল্লী-বালক সুধীরের হঠাৎ এতটা পরিবর্ত্তন নিরুদ্বেগে সহ্য করা কিছু কষ্টকর হইল। কলিকাতা সহরের এ বদ্ধ জলবায়ুও তাহার বড় ভাল লাগিত না। কলিকাতা-বাসিগণ "পাড়া গেঁয়ে" বলিয়া পল্লীবাসীদিগের উদ্দেশ্যে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পল্লীবাসিগণ প্রকৃতি-রাজ্যের যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পান, সহরবাসিগণের অদৃষ্টে সে সুখভোগ ঘটিয়া উঠে না। নির্ম্মল বাতাস, তটিনীর মধুর কল্লোলধ্বনি, পক্ষীর গান, চন্দ্রের কিরণ, এমন আর কোথায়! কলিকাতা-সহরে এমন কি অনেক গৃহস্থের অদৃষ্টে সূর্য্য-দেবের দর্শনলাভও ঘটিয়া উঠে না। সুধীর প্রকৃতি-রাজ্যের প্রজা। তাই তাহার এ 'ইলেক্ট্রিকে'র আলো, ইলেক্ট্রিকের বাতাস, কলের জল, কিছুই ভাল লাগিত না। তাহার মনঃপ্রাণ সর্ব্বদা সেই মধুমতী-তীরের গৃহকুঞ্জে পড়িয়া থাকিত।

কলিকাতায় আসিয়া সুধীরের একটী সঙ্গী জুটিয়াছিল। অতুল-নামক একটী বালকের সহিত তাহার অত্যন্ত সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। অতুল সুধীরেরই সমবয়স্ক, এবং এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। অতুলের বাটী সুধীরদের মেসের ঠিক্ সম্মুখেই। সুধীর সর্ব্বাই অতুলের বাটী যাইত। অতুলের মাতাও সুধীরকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অতুলের ছোট বোন্ বিভা সুধীরকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিত। বালিকার সেই অকপট অনাবিল ভালবাসা সুধীরকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সুধীরের ভ্রাতা-ভগ্নী ছিল

না। ভ্রাতৃপ্রেম ভগ্নীর স্নেহে সে চির-বঞ্চিত ছিল। বালিকা বিভাকে তাই তাহার বড়ই ভাল লাগিত। সরলা বালিকার প্রাণে কুটিলতার স্থান ছিল না। সংসারের ভেদাভেদ-জ্ঞান তাহার জন্মে নাই; —আপন-পর সে জানিত না; শুধু জানিত প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে। সুধীরকে দেখিলেই সে "সুধীর-দা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিত, কখনও হাত ধরিয়া টানিয়া মাতার নিকটে লইয়া যাইত। আবার কখনও বা ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া বলিত সুধীর-দা, খোকাকে আমার পিঠে চড়িয়ে দিন্ না; আমি ঘোড়া হব! বালিকার বাসনা শুনিয়া সুধীর "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিত। বাস্তবিক এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হইয়া সুধীরের মন অনেকটা ভাল ছিল। সুধীরের কাছে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে বিভা বড় ভাল বাসিত। সুধীর ও বিভাকে বড় ভাল বাসিত। মধ্যে মধ্যে পুতুলটী, ছবির বইখানি, জরির ফিতা প্রভৃতি কিনিয়া সুধীর বিভাকে প্রীতি উপহার দিত। বিভা তাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রত্যেককে দেখাইয়া বেড়াইত। এই-রূপে সুখে দুঃখে সুধীরের প্রবাসের দিন-গুলি এক রকম কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একবার গ্রীষ্মাবকাশ কালে অতুল সুধী-রের সঙ্গে সুধীরের বাটী গিয়াছিল। অতুল কলিকাতা-বাসী; জীবনে সে কলিকাতা ভিন্ন অন্য দেশ দর্শন করে নাই। কমলাপুর তাহার নিকটে বড় সুন্দর মনে হইল। উষার অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া নব দিবাকর যখন পূর্ব্বাকাশে দেখা দিতেন, তখন নদী-তীরে দাঁড়াইয়া অতুল বিমুগ্ধ নেত্রে তাহা দর্শন করিত। আবার দিবসের কার্য্য সমাধা করিয়া সূর্য্যদেব যখন অস্তাচলে গমন করিতেন, সুধাকর গাছের আড়াল হইতে সহাস্য আস্যে উঁকি দিতেন, এক দিকে কমলিনী বিষণ্ণ চিত্তে আপনাকে সঙ্কুচিত করিত, ও অপর দিকে কুমুদিনী পতি-দর্শন লালসায় সহর্ষ চিত্তে প্রস্ফুটিত হইত, তখন অতুল তাহা দেখিয়া পুলকিত হইত। তটিনীর মৃদু কল্লোল, কোকিলের কূজন, বিহঙ্গের কাকলী, অতুলের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। অতুল মনে মনে বলিত, "কে বলে পল্লীগ্রাম খারাপ? আমি যদি এমন গ্রামে বাস করতে পেতুম, তাহলে জীবন সার্থক মনে কর্‌তুম! কি পবিত্র শান্তিপূর্ণ এই দেশ! কি সুন্দর! এ যে বঙ্গমাতার বিশ্রাম-কুঞ্জ! জনপূর্ণ নর-কোলাহল-মুখরিত সহর অপেক্ষা এ ক্ষুদ্র পল্লী নির্জ্জন নীরব সাধকের মনোমুগ্ধকর কবিত্বে পরিপূর্ণ!　　(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

অনুতাপ।

যখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,
　　সারা নিশি জেগে তোমার আশে,
তখন তুমি এসেছিলে, নাথ,
　　মালাটিকে ফেলে গেছ পাশে!

ডেকে ডেকে পাও নি তুমি সাড়া,
　　ফিরে গেছ অভিমান ভরে;
ভেবেছিলে কোনো আয়োজন!
　　করি নাই আমি তোমা তরে।

ডাকৃছি আমি কতদিন ধ'রে,
বঞ্চিত না হব দরশনে!
এমন ক'রে যাবে তুমি চ'লে
ভাবি নাই কোনো দিন মনে!
সযতনে রচি' আসনখানি,
বসেছিলাম, কত আশা ক'রে,
তার উপরে বস্‌বে যবে তুমি,
দেখবো আমি দু'টী নয়ন ভ'রে!

বনে বনে কুড়িয়েছিলাম ফুল,
পূজ্‌বো ব'লে তোমায় কত সাধে।
এসেছিলে যদি, নাথ, তুমি,
জাগালে না কোন্ অপরাধে!
আর আমি ঘুমাবো না কভু,
ফিরে এস ওগো মোর সখা
একা আমি ভাব্‌ছি বসে ব'সে,
আবার কবে পাব তব দেখা!

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদ।

কংগ্রেসের প্রার্থনা—আগামী জাতীয় মহাসমিতির অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ভারত-সচিব মহাশয়কে বড়দিনের সময় কলিকাতার কংগ্রেস দর্শণ করিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভারত-সচিব মহাশয় তাহার উত্তরে জানাইয়াছেন যে, বড়দিনের সময় তাঁহার কলিকাতায় থাকা অসম্ভব।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান মন্দির—সার জগদীশচন্দ্র বসু প্রকৃতির যে রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, জগতে তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ঐ তত্ত্বের আরও অনুশীলন করিবার জন্য তিনি এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মন্দিরের মধ্যে যেমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুশীলন হইবে, মন্দিরের পশ্চাতে নির্জ্জন সুরম্যস্থানে সাধক আরও বৈজ্ঞানিক আলোক লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবেন। সার জগদীশচন্দ্র স্বোপার্জ্জিত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা এই মন্দিরের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ১৫ লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই সংবাদ অবগত হইয়া, ভারতের জ্ঞান জগতে বিলাইবার অভিলাষে বোম্বায়ের ষোনানজী একলক্ষ ও মিঃ মুলজি খাটাও সওয়া দুইলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও ডাক্তার বসুর শিষ্যদিগের জন্য কটী বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় মহিলা-বৃত্তি।

এ বৎসর নিম্নলিখিত বালিকাগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছেন।

২০৲ টাকার বৃত্তি।

সুধা দত্ত—মহারাণী হাইস্কুল দার্জ্জিলিং।

১৫৲ টাকার বৃত্তি।

১। সুবোধবালা রায়—বেথুন।
২। নিখিলবালা গুপ্ত—ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা
৩। প্রীতিলতা গুহমল্লিক—ব্রাহ্ম গার্লস।
৪। ইন্দুবালা দাসগুপ্ত—ইডেন, ঢাকা।
৫। লীলাবতী নাগ— " " ।
৬। সুধা চট্টোপাধ্যায়—বেথুন।

১০৲ টাকার বৃত্তি।

১। অমিয়প্রভা বিশ্বাস—বিদ্যাময়ী, ময়মনসিং।
২। লীলা বসু—ডাওসেসন।
৩। মালতীমালা সরকার, ইউনাইটেড মিশন।
৪। স্নেহপ্রভা সরকার—বিদ্যাময়ী ময়মনসিংহ
৫। ফুলবালা গুপ্ত—ব্রাহ্ম গার্লস।
৬। সুধীরবালা গুপ্ত— " " ।
৭। সুমতিবালা দাস—ইডেন, ঢাকা।
৮। মণিকা চাট্যার্জ্জি—বেথুন।
৯। সুনীতিবালা রায়—বিদ্যাময়ী, ময়মনসিং।

মিঃ টমাসক্লার্ক পিলিং গিবন্স কে, সি, ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গালার 'এড্‌ভোকেট জেনারেল'-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৪—ডিসেম্বর, ১৯১৭।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৶০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৶০ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

December, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬২ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। ডিসেম্বর, ১৯১৭। { ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্রদেশ—একতালা।

ঐ মহাসিন্ধুর ও-পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে!

কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে, "আয় চলে আয়,

ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে!"

বলে, "আয় রে ছুটে, আয় রে ত্বরা,

হেথা নাইকো মৃত্যু, নাইকো জ্বরা,

হেথায় বাতাস গীতি-গন্ধ-ভরা, চির-স্নিগ্ধ মধু-মাসে;

হেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা, চির-জ্যোৎস্না নীলাকাশে।

কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,

ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে?

দেখ্ ঐ সুধা-সিন্ধু উছলিছে পূর্ণ-ইন্দু পরকাশে।

ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমার পাশে।

কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ,

ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ?

ওরে, সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।

কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস্ পরবাসে!"

[গী]ত ও সুর—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
পা -া II { ধা ধা -া। পা -া পমা। মা মা -া। মা মা -া I
ও ই ম হা ০ সি ০ ন্ধুর্ ও পা র থে কে ০

১
[পা -া -া]
সে ০ ০

২ ৩ ০
I মা -পধা পা। -া মগা রসা। রা পা পা। পা পধা -ণা } I
কি ০ ০ স ০ ঙ্গী ০ ত ০ ভে সে আ সে "ও ০ ই"

২´ ৩ ০ ১
I { -া -া পা। পা পা -ধণা। ণা ণা -া। র্সা ণা -া I
০ ০ কে ডা কে ০ ০ ম ধু র তা 'নে ০

১
[পা মা মমা]
লে আয় ওরে

২´ ৩ ০
I ধা ধা -পধা। পা মা -া। মা -া পা। মা মা -া } I
কা ত র ০ প্রা ণে ০ আ য় চ লে আ য়

১
[-া না না]
০ ব লে

২´ ৩ ০
I মা -ধা ধা। ধা ধা -া। ধা ধা -পা। পধা—ণা ণা II
আ য় চ লে আ য় আ মা র্ পা ০ ০ শে

২´ ৩ ০ ১
I { না -া না। না না -র্সা। র্সা -া র্সা। র্সা র্সা র্সর্সা I
আ য় রে ছু টে ০ আ য় রে ত্ব রা হেথা

১
[র্রা র্রা র্সনা]
ত্ব রা হে থা

২´ ৩ ০
I র্সা -র্রা র্সা। ণা -ধা পা। মা -পা র্রা। র্রা র্রা -র্গর্মা } I
না ই কো মৃ ০ ত্যু না ই কো ত্ব রা ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I { না না -া। র্সা -া র্সা। র্সা -র্রা র্সা। ণা ধা -পা I
বা তা স্ গী ০ তি গ -ন্ ধ ভ রা ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা -ধপা। মা -গা রা। রা মা গা। রা রা মা } I
চি র ০ ০ স্নি ০ গ্ধ ম ধু মা সে হে থা

২ ৩ ০ ১
I মা মা -পা। পা পা -া। মা পা -র্সা। র্সা র্সা -া I
চি র ০ শ্যা ম ল ব সু ০ ন্ধ রা ০

[-া সা সা]
০ কে ন

I র্সর্রা -র্সা -ণা। ধা -পা পা। পা ধা -া। পা -ধণা ণা II
চি র ০ জ্যো ৎ স্না নী লা ০ কা ০০ শে

I রা রা -া। রা রা -গমগা। রা রা -া। রা রা রসসা I
ভূ তে র বো ঝা ০০০ ব হি স্ পি ছে ভূতের

I মা মা -া। মা মা -া। মা মা -পধা। পা মা মমমা I
বে গা র খে টে ০ ম রি স্০ মি ছে দেখ্ ঐ

I {ধা ধা -া। ধা -া ধা। ধা ণা ধা। পা -া -া I
সু ধা ০ সি ০ ন্ধু উ ছ লি ছে ০ ০

[ধা র্সা র্সর্সা]
শে ভূ তের

I পা -ধা পা। মা -া গা। মা ধা পা। ধা ধণা র্সা}
পূ ০ র্ণ ই ০ ন্দু প র কা শে দেখ্ ঐ

I র্সা সা -া। নর্সা র্সা -া। ণা ণণা -া। ধা ধা -া I
বো ঝা ০ ফে লে ০ ঘ রের্ ০ ছে লে ০

[-া না না]
০ কে ন

I পা ধা পা। মা গা -া। মা ধা -া। পধা -ণা ণা II
আ য় চ লে আ য় আ মা র পা০ ০ শে

I {না না -া। না না -র্সা। র্সা র্সা -া। র্সা র্সা র্সর্সা I
কা রা ০ গৃ হে ০ আ ছি স্ ব ন্ধ ওরে

[র্রা র্রা র্সনা]
অ ন্ধ ওরে

I র্সর্রা র্সা -ণা। ধা পা -ধপা। মা পা -র্রা। র্রা র্রা -র্গর্মা} I
ও রে ০ মূ ঢ় ০০ ও রে ০ অ ন্ধ ০০

I {না না -া। র্সা -া র্সা। র্সর্রা র্সা -ণা। ধা -পা পা I
সে ই ০ সে ০ প র মা ০ ন ০ ন্দ

১
[রা রা রা]
সে কে ন

২´ ৩ ০
I পা পা -ধণা। ধা পা -মগা। রা গমা গা। রা -া -া } I
যে আ ০০ মা রে ০০ ভা ল০ বা সে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I মা মা -পা। পা পা -া। মা পা -র্সা। র্সা র্সা -া I
ঘ রে র্ ছে লে ০ প রে র্ কা ছে ০

২´ ৩ ০ ১
I র্সর্রা র্সা -ণা। ধা পা -া। পা ধা -া। পা -ধা ণা II II
প ড়ে ০ আঁছি স্ প র ০ বা ০ সে

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৯)

বাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া নমিতা শঙ্কর-চাকরকে ডাকাডাকি করিয়া সাড়া পাইল না। সুরসুন্দর বৃদ্ধকে পথে দাঁড় করাইয়া, বারাণ্ডায় উঠিয়া, সজোরে কড়া নাড়িয়া প্রাণপণে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"বিমল-বাবু, বিমলবাবু!—সুশীলবাবু,— !" এবার সুশীলের সাড়া পাওয়া গেল। তাহারা দুয়ার খুলিয়া দিতে আসিতেছে.....।

সুরসুন্দর বারাণ্ডা হইতে নামিবার উদ্যোগ করিল। সে জুতার ফিতা-টা টানিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে হেট-মুখে বলিল, "তা হ'লে আমি এখন চল্লুম্। কাল সকালে সাড়ে ছ'টায় সমুদ্রপ্রসাদ আস্‌বে। আপ্‌নি নিজে দেখে শুনে, একটু সাবধানে 'ড্রেস্' করিয়ে নেবেন্; ঘা-টায় পুঁজ যেন না হ'তে পায়, লক্ষ্য রাখ্‌বেন্।"

হিতলালবাবুর সৌহার্দ্দ্য ও আপ্যায়নের দৌরাত্ম্যে নমিতার মগজের মধ্যে বেশ একটু উৎকট গোল্‌মাল্ বাঁধিয়া গিয়াছিল। এত-ক্ষণের পর বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছিয়া, সে যেন প্রকৃতিস্থ হইবার অবসর পাইল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, প্রসন্ন-সৌজন্যপূর্ণ মুখে ছোট একটি নমস্কার করিয়া বলিল, "আসুন, আজ আমার জন্যে আপ্‌নারা বড়ই কষ্ট পেয়েছেন;—বিশেষ আপনি......! বাস্তবিক, আমার বড় ভাই এখানে থাক্‌লে, আজকের বিপদে যা' না কর্‌তে পার্‌তেন্, আপ্‌নি তা'র চেয়ে বেশী করেছেন।—শুধু দূর থেকে পরের মত নমস্কার করা-টা আজ উচিত হয় না। আপ্‌নাকে প্রণাম করে, পায়ের ধুলো নেওয়া-ই—!"

সহসা পিছু হটিয়া অস্বাভাবিক তীব্র গম্ভীর স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "না না, পরকে 'পর'

বলেই মনে রাখ্‌বেন! ও-সব লৌকিকতার আড়ম্বর—সমস্তই—সব একেবারে ভুলে যান্‌ —ভুলে যান্‌! সংসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, শিষ্টসৌজন্য-কোমলতার অনুরোধে, ও-সব হাস্যাস্পদ পাগ্‌লামীকে মনে ঠাঁই দেবেন না; আমি বারণ করে দিচ্ছি। কে বল্‌তে পারে, শেষে হয় ত একদিন স্রেফ্‌ ঐ জন্যেই ......?" সুরসুন্দর আর বলিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত বাষ্পবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

অন্ধকারে বিস্ময়াহত নমিতার পাণ্ডু বিবর্ণ মুখ-ভাব কেহ দেখিতে পাইল না; কিন্তু তাহার স্বচ্ছন্দ-নিঃশ্বাস-গতিটা যে, অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল! নমিতা কোন কথা কহিতে পারিল না।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া সুরসুন্দর বেদনা-মথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বড় অশোভন স্পর্দ্ধা-বর্ব্বরতা প্রকাশ কর্‌লুম কি? কি কোর্ব্বো! ক্ষমা করুন্‌; উপায় নাই! আমাদের চক্ষে যে, সৌজন্য, শীলতা, শিষ্টতা, কিছুই নাই; আছে শুধু, কুৎসা, গ্লানি, আর বীভৎস নীচাশয়তা! আমাদের আত্মপর কোনো সম্মান-জ্ঞানই নাই; তাই যথেচ্ছ-কৌতুক-প্রিয়তার পরিচয় দেবার জন্য আমরা অতিব্যগ্র। কিন্তু শ্লীলতার সীমা কোথায়, সেটুকুর হিসাবে আমরা অতিকুণ্ঠিত! আমাদের মত জানোয়ারের কাছে মানুষের শিষ্টতা জানাতে আসেন্‌? ভুল, বিষম ভুল! ম্যাডাম্‌, যে রাস্তার, যে ধূলোর উপর ভগবান্‌ আপ্‌নাকে দাঁড় করিয়েছেন, সে রাস্তার, সে ধূলোর উপর নারীজনসুলভ হৃদয়ের নমনীয়-কোমলতা নিয়ে দাঁড়াবার স্থান নাই! প্রাণকে পাথরের মত শক্ত করুন্‌; তবে এখানে দাঁড়াবার শক্তি পাবেন। না হ'লে, ঠক্‌বেন,—বড় মর্ম্মান্তিক ঠকা ঠক্‌বেন্‌! এটা নিশ্চয়!—"

ভিতরের উগ্র-উত্তেজনার তাড়নে সুরসুন্দরের আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না; ধূলি-ধূসরিত বারাণ্ডার সিঁড়ির উপরে বসিয়া পড়িল ও ঘাড় হেঁট করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগ সবলে দমন করিয়া নিঃশব্দে চক্ষের জল সাম্‌লাইয়া লইল। গভীর অভিমান-বেদনাহত স্বরে সে বলিল, "কোন্‌ সাহসে মুখ উচুঁ করে বিশ্বাস-যোগ্যতার দাবী কোর্‌বো বলুন! সে স্থান নাই! চারিদিকে যে বীভৎস পঙ্কিলতার স্রোত বয়ে যাচ্ছে! এতে কি জঘন্য গ্লানিতে মন ভরে যায় না, লজ্জায় ঘৃণায় মুখ পুড়ে যায় না? আপ্‌নি ছেলেমানুষ; এ-সবের কি বল্‌বো আপনাকে? তবে একটি কথা বলে রাখ্‌ছি—।" এই বলিয়া সুরসুন্দর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কঠিন স্বরে বলিল, "আমাদের হৃদয়হীন লঘু চপলতা, নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতার সংস্রব থেকে, যতটা পারেন, দূরে—খুব দূরে সরে দাঁড়ান! পৃথিবীর বাজারে উচ্চ-প্রাণতা বলে কোন জিনিস নাই; তাই মানুষের হৃদয়ের নির্ম্মল বিশ্বাস-প্রীতি, শ্রদ্ধা-সম্মান,—এ সকল আমাদের কাছে মূল্যহীন,—নাটক-নবেলের কথা মাত্র! তাই শ্রদ্ধামর্য্যাদাহীন নীচান্তঃকরণ আমরা। আমাদের অসাধ্য হেয় কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই! এটা খুব ভাল করে স্মরণ রাখ্‌বেন।

দ্বার খুলিয়া সুশীলের সহিত লছ্‌মীর মা আলো হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। মুখের

ঘাম হেঁট হইয়া হাঁটুর কাপড়ে মুছিয়া, শুষ্ক স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "যান্, বাড়ীর ভেতর যান্।" তাহার পর পথে নামিয়া, কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সে আবার বলিল, "কাল সকালেই সমুদ্র আস্‌বে, মনে রাখ্‌বেন।...... তা হ'লে আসি।—যান্, দাঁড়াবেন না; বাড়ী যান্। সুশীল, বাড়ী যাও ভাই!"

সুশীলের সৌজন্য-জ্ঞানটা খুব তীক্ষ্ণ; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এই যে যাই; আগে আপ্‌নারা চলে যান্; তা'পর।"

সুরসুন্দর শান্ত কোমল দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিয়া ম্লানভাবে একটু হাসিল। তার-পর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বৃদ্ধের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নমিতা কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিঃশব্দ পাদক্ষেপে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

সুরসুন্দর দৃষ্টি-পথাতীত হইলে, দুয়ার বন্ধ করিয়া লছ্‌মীর মা'র সহিত সুশীল বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে লছ্‌মা রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ইহার পর ধীরে সুস্থে নমিতার হাতের সংবাদটা সময় মত জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে বলিয়া, আপাততঃ কাজ কামাই করিতে তাহার ত্বরা সহিল না। কর্ম্মঠ-প্রকৃতি লছ্‌মীর মা চির-দিনই হাতের কাজ সারিয়া, তবে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সংবাদ লইত।

সুশীল মা'র ঘরে—এক দৌড়ে আসিয়া দিদির সন্ধান লইয়া জানিল, সেখানে দিদি এখনও পৌঁছায় নাই। তৎক্ষণাৎ সে দিদির শয়নকক্ষের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

বিমলের পড়িবার ঘরের ভিতর দিয়া শয়নকক্ষে যাইতে হয়। ছুটিয়া আসিয়া পড়িবার ঘরে ঢুকিয়াই সুশীল হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, টেবিলের কাছে চেয়ারের পিছনে পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে দাঁড়াইয়া, নমিতা অস্বাভাবিক ব্যাকুল-দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে দেয়ালের গায়ে টাঙ্গান স্বর্গীয় পিতৃদেবের 'ফটো'-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া আছে। তাহার মুখমণ্ডলে নিরুপায়-নির্য্যাতনবাহী স্তব্ধ-গাম্ভীর্য্যের দীপ্ত জ্বালা উদ্ভাসিত!

এক রাশ প্রশ্নের বোঝা সুশীলের জিহ্বার মধ্যে জমাট বাঁধিয়া বসিয়া গেল! নমিতাকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। হাঁ করিয়া খানিক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইয়া আসিল ও ঝুঁকিয়া পড়িয়া নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সন্তর্পণে 'ব্যাণ্ডেজের' এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে অঙ্গুলি-স্পর্শ করিয়া, আপন মনেই সহানুভূতি-করুণকণ্ঠে বলিল,—"আহা!"

সশব্দে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। অব্যক্ত গ্লানি-মনস্তাপের উগ্রদ্বন্দ্ব বক্ষের মধ্যে তীব্র আলো-ড়নে চলিতেছিল; তাহারই ঘূর্ণিচক্রে সমস্ত অনুভূতিটা এতক্ষণ যেন হতজ্ঞান হইয়াছিল। সুশীলের আগমন-ব্যাপারটা মোটেই সে টের পায় নাই। একাগ্র-পর্য্যবেক্ষণে রত সুশীলকে নতশিরে পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, সহসা সে চমকাইয়া গেল! আত্মসংবরণ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—"কে? সুশীল!"

"হুঁ" বলিয়া, বড় বড় চোখের আগ্রহো-জ্জ্বল দৃষ্টি নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া সুশীল বলিল, "আমি ভেবেছিলাম বুঝি, তুমি আগেই মা'র সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছ!

কাপড় ছাড়তে এসেছ, তা ত জানি নে! মা যে তোমার জন্যে বড্ডই ভাবছেন, দিদি!"

তাহার জন্য ভাবনা!—ধ্বক্ করিয়া রূঢ় বেদনার আঘাতে হৃৎপিণ্ডটা সজোরে নমিতার বুকের মধ্যে লাফাইয়া উঠিল। 'মা তাহার জন্য অত্যন্তই ভাবিয়া থাকেন—!' ইহা ত অত্যন্ত পুরাতন কথা! শুনিয়া শুনিয়া তাহার ত ইহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে! কিন্তু আজ?......না, না, এই পুরাতন অভ্যস্ত সত্যের আস্বাদ আজ অত্যন্ত নূতন! সমস্ত অন্তঃকরণটা আজ নিদারুণ অভিমান-ক্ষোভে অশ্রু-সজল হইয়া উঠিতে চাহিতেছে! তাহার জন্য ভাবনা!' সত্যই তাহার অবস্থা আজকাল অসহনীয় সমস্যা-সঙ্কটে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার জন্য সকলেই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তান্বিত! যাহার ভাবিবার কথা নয়, তিনিও!

মুখ ফিরাইয়া নমিতা তীব্রদৃষ্টিতে নিজের দেহের পানে চাহিল! একটা হিংস্র উন্মাদনায় মনটা মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর উগ্র হইয়া উঠিল! এই দেহটার জন্যই না? হাঁ, সকল দিকেই অন্ন-দাসত্বের চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া, দেহযাত্রাটা বেশ স্বচ্ছলভাবে সে নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে! শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাধীন স্বচ্ছন্দতাও যে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে! সংসারের যত কিছু জঘন্য-লালসার ক্রূরদৃষ্টির সামনে শুধু এইটার অপরাধেই ভয়-কুণ্ঠিত হইয়া চলিতে হয় না? হাঁ, শুধু এই জন্যই! কঠিন হস্তে কণ্ঠনালী টিপিয়া ধরিয়া বিকৃতকণ্ঠে নমিতা বলিল, "বেরিয়ে যা, সুশীল—!"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশীল বলিল, "তুমি কাপড় ছাড়বে?"

অকস্মাৎ উগ্র ঝাঁজের সহিত নমিতা বলিল, "হাঁ, হাঁ; তুই যা না—!"

বিস্মিত সুশীল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। চেয়ারের পিছনে বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া, আজ অনেক দিনের পর, নমিতা অসহ্য কষ্টে, আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল! তীব্র অভিমানাহত নিঃশব্দ ক্রন্দন!

নমিতা সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞা, নির্ব্বোধ, ছেলেমানুষ! হায়, সংসারের মানুষ, বাহিরে দাঁড়াইয়া দেহের বয়স হিসাব করিয়া কাহাকে বিচার করিতে চাহ! দুঃখ-দ্বন্দ্ব-শোকের তাড়া খাইয়া সচেতন অনুভূতি-সম্পন্ন মানুষের মনের বয়স যে অত্যন্ত শীঘ্র বাড়িয়া উঠে! দেহের বয়সের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া সব মাটী মাড়াইয়া চলিবার সাধ্য ত তাহার থাকে না!......কিন্তু হায়, কে ইহা বিশ্বাস করিবে? বিষয়ী বুদ্ধিমানেরা জানেন, ইহা নাট্যাচার্য্যের নাটকীয় বিজ্ঞতা, ঔপন্যাসিকের অলস-মস্তিষ্ক-প্রসূত ভৌতিক উপদ্রব!......থাক্, যাহা ইচ্ছা তাঁহারা মনে করুন, ইহা লইয়া তর্ক চলিবে না!

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতার আলোক-চিত্রের দিকে চাহিতেই তাহার দৃষ্টি আবার বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া গেল! ঐ পুণ্যোজ্জ্বল শোক-স্মৃতি! উহার প্রতিষ্ঠা-অর্চ্চনার স্থান সত্যই কি জগতে কোথাও নাই? জীবন্ত মানুষের সজাগ প্রাণের অভ্যন্তরেও নাই? ঐ সুমহান্ স্মৃতির তেজস্বী শক্তি-প্রেরণাবলে হৃদয়ের মধ্যে দৃপ্ত নির্ভীক হইয়া, শান্ত-নির্ম্মল দৃষ্টি

তুলিয়া, সে সমস্ত জগতের সকল নয়নে যে, ঐ পিতৃনয়নের উজ্জল স্নেহ-করুণা দেখিতে চায়, ঐ পিতৃমুখের প্রতিবিম্ব-মহিমা দেখিতে চায়! সে সবই অলীক ভাবুকতা মাত্র! সত্যের লেশ তাহাতে কিছুই নাই! অসহ্য! এমন জঘন্য কৃতঘ্নতার—এমন নিষ্ঠুর বিশ্বাসহীনতার বেদনা বহিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না; অন্ততঃ নমিতা পারিবে না।

সহসা একটা নূতন আশ্বাসের সুর আসিয়া তাহার অবসন্ন মনকে স্পর্শ করিল। শান্ত হইয়া নমিতা চক্ষের জল মুছিল। এই সময় বাহির হইতে সুশীল ডাকিল, "দিদি, এখনো তোমার হয় নি?" আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া নমিতা বলিল, "তুই, বুঝি আমার জন্যে এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্? আচ্ছা, ঘরে আয়।"

ইতস্ততঃ করিয়া সুশীল বলিল, "না, তুমি কাপড় ছাড়; আমি মা'র কাছেই যাই—।"

নমিতা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "না না, এই খানেই আয় ভাই, একটা কথা বল্‌বো—।

সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি —?"

নমিতা আঁচলের কাপড়টা মুখের উপর উত্তমরূপে ঘসিয়া মাজিয়া, নিকটস্থ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। সুশীলকে পাশে টানিয়া লইয়া, ডানহাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া স্মিতমুখে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "স্নিগ্ধের কাছে ডাক্তার মিত্রের কথাটা বলা হয়েছে? প্রকাণ্ড বোকা তুই!.....আচ্ছা, বল ত, বাড়ীতে মা'র কাছে এসেও সব গল্প করেছিস্?"

ঘাড় নাড়িয়া বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে সুশীল বলিল, "না দিদি, শুনে শুধু মার মনে দুঃখু হবে, তাই বলি নি,...... ।"

উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসটা সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া লইয়া নমিতা বলিল, "লক্ষ্মী ভাইটী আমার! মগজের বুদ্ধির সঙ্গে বিবেচনা একটু খাটিয়ে সাবধান হয়ে মা'র কাছে কথাবার্ত্তা বলো! শোকে-দুঃখে একেই তাঁর মন ভেঙ্গে রয়েছে, তার ওপর বাইরের ব্যাপার,—আমাদের দুঃখ, ক্ষতি অপমান, এ গুলোর ভার আর চাপান চলে না!... বাইরের বোঝা চৌকাটের বাইরে নামিয়ে রেখে, ঘরে তাঁর কাছে হাল্কা হয়ে এসে দাঁড়াতে হবে। বুঝেছ মাণিক, তাঁর কাছে কিছু বলো না... ।"

নমিতার বেদনা-করুণ কণ্ঠস্বরে সুশীলের চোখ্-দুইটা ছল্ ছল্ হইয়া আসিল। ম্লান মুখে সে বলিল, "কিন্তু তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ার কথাটা ত বলে ফেলেছি—।"

মৃদু হাসিয়া নমিতা বলিল, "উত্তম, ওটা এড়িয়ে যাওয়া চল্‌ত না।"

সুশীল পুনশ্চ বলিল, "আমারই মাথায় ঠুকে যে তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে গেছে, তাও বলেছি।—তা'র জন্যে ছোড়্‌দি—।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সহাস্যমুখে নমিতা বলিল, "থাক্ থাক্, বুঝেছি। ছোড়্‌দির কথা বাদ দিয়ে যা। চল মা'কে আগে দেখা আসি।"

সুশীল বলিল, "কাপড় ছাড়্‌বে না?"

"তিনি ভাবছেন্ রে, আগে তাঁকে খবরটা দিয়ে আসি— ।" এই বলিয়া নমিতা বাহির হইল। সুশীলও তাহার পিছু পিছু চলিল।

বাহির হইতে বিমল আসিয়া সদর দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকাডাকি করিতেছে

শুনিয়া, সুশীল দুয়ার খুলিয়া দিতে ছুটিল। নমিতা একাকিনীই মা'র ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মা পিঠের কাছে উঁচু বালিশ রাখিয়া, অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কষ্টে নিঃশ্বাস টানিতেছিলেন। নমিতা ঘরে ঢুকিতেই, উদ্বেগপূর্ণ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন, "হাতটায় কি বড়ই লেগেছে?"

প্রফুল্ল-স্মিত মুখে বেশ জোরের সহিত নমিতা বলিল, "কিছু না!—সামান্যই আঘাত!—"

সমিতা মাতার বুকে তৈল-মালিশ করিতেছিল। নমিতা তাহারই পাশে বসিয়া পড়িয়া প্রসন্ন মুখে বলিল, 'কাণার লগ্নে কুঁজের বিয়ে';—মাঝখান থেকে আমি সাতদিনের ছুটি পেয়ে গেলুম।—এ একরকম মন্দ হোল না। যথালাভ.........।" এই বলিয়া নমিতা সকৌতুকে হাসিতে লাগিল; যেন তাহার এই পরমলাভের সুসংবাদটুকু মাতার কাছে বহন করিয়া আনিতে পারায় আনন্দে সে পরম কৃতার্থতায় উল্লসিত!—কিন্তু অন্তর্য্যামী দেখিতেছিলেন, তাহার এই ছুটির লাভ-টা কিন্তু কঠোর-গ্লানি-বিষ-দগ্ধ! কি দুঃসহ-বেদনাময়! কি নিদারুণ অস্বস্তি-অভিশাপপূর্ণ!

স্নিগ্ধের স্নেহ-করুণার উল্লেপে খুব একটা বড় রকম ভূমিকা ফাঁদিয়া, নমিতা জাঁকাইয়া প্রশংসা সুরু করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সুশীলের সহিত বিমলকুমার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরে ঢুকিল। নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতের প্রতি ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল ক্ষুন্নভাবে বলিল—"উঃ, কি গ্রহের ফের! দুঃখ-বিপদ্ যখন আসে, তখন এমনি করেই এসে থাকে! তোমার দরকারী কাজের হাতটা আজ্ কা জখম্ হোল!"

বিমল বাম পায়ের গ্রন্থিটা সজোরে টিপিয়া ধরিয়া কাতরভাবে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "অন্ধকারে ছুটোছুটি করে যেতে খানায় পড়ে পা মচকে গেছে! তবু এই পা নিয়েই চারিদিক্ ঘুরলুম্; কেউ সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না, মা!...বাস্তবিক, লোকটা আশ্চর্য্য পালানই পালিয়েছে!..."

সবিস্ময়ে নমিতা বলিল, "কে?"

সুশীলের দিকে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল বলিল, "গেজেট, কি নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি ভুলে গেছিস্, না কি? ডাক্তারবাবুর ঠাকুর যে ফেরার...! শোন নি, দিদি?"

হতবুদ্ধি নমিতা বলিল, "কখন্?—"

বিমল বলিল, "সমি ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে তাকে খবর দিয়েছিল যে, ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তুমি দেখা কর্‌তে গেছ। সেই শুনেই সে বেচারী উদ্বেগ-চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তারপর তুমি গেছ, সুশীল গেছে, আমি 'বল্' খেল্‌তে বেরিয়ে গেছি; ইতি-মধ্যে কখন্ সে গায়ের কাপড়খানি নিয়ে সুট্ করে নিঃশব্দে পিট্‌টান দিয়েছে; কেউ জানে না! আমি 'বল্' খেলে এসে ব্যাপার শুনে, তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলুম্; এই বাড়ী ঢুকছি!"

নমিতা গুম্ হইয়া খানিকক্ষণ ভাবিল। বিমল আহত পায়ের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বিরক্তভাবে বলিল, "যাই বল বাপু, পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, সুখস্বস্তি ত বোল আনা! আবার বদনামের ভাগী হওয়া

দ্যাখো! রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কোথায় হয় ত ভোঁচ্কানি লেগে মরে পড়ে থাক্‌বে, তারপর সে পাপের দায়ী কে হ'বে বল ত? আর লোকটার নিমক-হারামি দ্যাখো! আমরা এত যে কর্‌লুম্, তা একটা কৃতজ্ঞতা জানান নেই, কিছু নেই;—খাতির নদারত; বেমালুম গা-ঢাকা দিলে! কি বল্‌তে ইচ্ছে হয় বল দেখি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা বলিল, "কৃতজ্ঞতার কাঙ্গালী হয়ে এখানে বসে মাথা খুঁড়্‌লে কোনই লাভ নেই। উঠে পড়, ভাই! চল দু'জনে মিলে রাস্তায় আর একটু খোঁজ্ তল্লাশ করে আসি। আমাদের কর্ত্তব্যটা আমরা পালন করে যাই; তারপর ভগবানের ইচ্ছা—!"

আহত চরণটির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিমল বলিল, "তুমি বল্‌ছ, চল যাই; কিন্তু কিছুই যে ফল হবে না, তা আগেই বলে রাখ্‌ছি। আর একটা কথা। সুরসুন্দর তেওয়ারীকে বলে এসেছি। তিনি এখনি চারিদিকে লোক পাঠিয়ে সন্ধান নেবেন। ওঁর কাছে উপকার পায় বলে, অনেক হিন্দুস্থানী ওঁর বাধ্য আছে। সুরসুন্দর আরো বল্লেন, ঐ ঠাকুরের চাচা না কি হয় বটে, কে এক ভাই বেরাদার কাছারিতে পেয়াদার কাজ করে। তা'র কাছে খোঁজ্ নিলে, খুব সম্ভব, সন্ধান পাওয়া যাবে।"

রুষ্টভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নমিতা বলিল, "তোর সবই ব্যাগার-ঠেলা কাজ! এখন থেকে এই রকম ফাঁকিবাজ্ হ'তে অভ্যাস কর্‌ছিস্, এর পর বয়স বাড়্‌লে সংসারের কাজে একটা অদ্ভুত স্বার্থপর জন্তু হয়ে উঠ্‌বি, দেখ্‌ছি!"

নমিতা যে হঠাৎ এমন রাগিয়া উঠিবে, বিমল তাহা প্রত্যাশা করে নাই। একটু থতমত খাইয়া সে বলিল, "তেওয়ারী নিজেই খোঁজ্ নেওয়ার কথা তুল্লেন। হাঁস্‌পাতালের বুড়ো মেথরকে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মোড়ের কাছে দেখা হল; আমায় খোঁড়াতে দেখে তিনি বল্লেন, "আপ্‌নি আর কষ্ট কর্‌বেন না; বাড়ী যান্। আমি খবর নিয়ে পরে আপ্‌নাকে জানাব।" তাঁ'রই কাছে ত তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ার খবর পেলুম।"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না। মনের মধ্যে যে অত্যুগ্র দ্বন্দ্ব-তিরস্কারের বিশৃঙ্খল তুফান-স্রোত বহিতেছিল, তাহার উদ্দাম ঢেউ সশব্দে তাহার উপরে আছ্‌ড়াইয়া পড়িতে চায় দেখিয়া, নমিতা নিজের উপর বিরক্ত হইল। পাচকের পলায়ন-সংবাদের নীচে সব দুশ্চিন্তা ঢাকা পড়িয়াছিল। একটা উদ্বেগ-পীড়ন উপর্য্যুপরি ঝাপ্টা হানিয়া তাহাকে অশান্ত করিয়া তুলিতেছিল। পাচকের সাহায্যের জন্য ডাক্তার-পত্নী তাহাকে টাকা গতাইয়া দিয়াছেন;—সে-কথা মা'র কাছে বলা উচিত কি না?—সে-সমস্যা লইয়া নমিতা নিজের মধ্যেই অত্যন্ত বিপন্নতা অনুভব করিতেছিল। মা হয় ত ভিতরের দিক্‌টা তলাইয়া বুঝিবেন না; বিরুদ্ধ ধারণায় অসম্মান-বোধে, বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু ডাক্তার-পত্নীর সেই বেদনা-করুণ মুখচ্ছবি মনে পড়িলে, নমিতার মনের আত্মসম্মান-বোধটা যে নম্র অভিভূত হইয়া আসিতে চাহিতেছে, স্নেহ-সমবেদনায় প্রাণটা আর্দ্র হইতে চাহিতেছে! আহা, সেই নিরুপায় মর্ম্মপীড়িতা বেচারীর অনুতপ্ত হৃদয়-

ভার-লাঘবে সাহায্য করিতে পারিলে, নিজের সম্মান-ক্ষুণ্ণতার দুঃখ ভুলিয়াও নমিতা সত্যই সুখী হইতে পারিত। কিন্তু এ যে সকল দিকে গোল বাঁধিল! হায়! নমিতা গৃহে ফিরিবার আধ্ ঘণ্টা পরে যদি পাচকের মাথায় পলায়নের সুবুদ্ধিটার উদয় হইত!

বিমলের কাছে আসিয়া আহত পায়ের এ-দিক্ ও-দিক্ টিপিয়া দেখিতে দেখিতে নমিতা বলিল, "মচ্‌কে ফুলে গেছে! একটু চূণে-হলুদ্ গরম করতে হবে—।"

আশ্বস্ত হইয়া বিমল তাড়াতাড়ি সমিতার দিকে চাহিল। বিমলের অভিপ্রায় বুঝিয়া মাতা বলিলেন, "সমি, যা মা, চূণে-হলুদের ব্যবস্থা দ্যাখ্। মালিশ থাক্—।"

সজোরে মালিশ করিতে করিতে ঘাড় নাড়িয়া আপত্তির সুরে সমিতা বলিল, "এই এখুনি! দেখ্‌ছ এখন তেল মালিশ করছি—."

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "তাই ত। না না, মালিশ চলুক্। আমি ওর পায়ের সদ্গতি করছি; তুই মালিশ্‌টাই ততক্ষণ কর্। আমি এসে তোকে ছুটি দেব—।"

পরম সন্তোষে কৃতজ্ঞ ও উৎফুল্ল হইয়া সমিতা বলিল, "হ্যাঁ দিদি, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী তোমায় কেন ডেকেছিলেন?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নমিতা বলিল, "'টাই'য়ের নমুনার জন্যে। কাল বোনার বাক্সটা একবার পাড়্‌তে হবে। হাঁ, ভাল কথা! মা, আমাদের ডাক্তারবাবুর স্ত্রী অক্ষয় সেনের পিস্তুতো বোন্। সেই অক্ষয়-দা—দাদার বন্ধু—।"

প্রবাসী 'দাদা'র সম্পর্কীয় প্রত্যেক সংবাদের প্রত্যেক বর্ণটির জন্য ভাই-বোনের চক্ষুকর্ণ সজাগ হইয়া থাকিত। সুতরাং তৎক্ষণাৎ অনেকগুলা আগ্রহ-ব্যস্ত প্রশ্ন উপর্য্যুপরি বর্ষিত হইয়া গেল। যথাসম্ভব সংক্ষেপে সে-গুলার সন্তোষজনক উত্তর দিয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অতীত-সৌভাগ্য-দিনের অনেকগুলা বিস্মৃতপ্রায় স্নেহ-মধুর স্মৃতি সকলের মনের মধ্যে জাগিয়া একটা করুণ বেদনালোকের সৃষ্টি করিল।

আবশ্যক খুচ্‌রা কাজকর্ম্ম সব সারিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে নমিতা হাঁস্‌পাতালের দরখাস্ত লিখিল। তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাকথা ভাবিয়া অনিলকে একখানি পত্র লিখিল।

পাছে অনিল দূরদেশে থাকিয়া বেশী দুশ্চিন্তায় পড়ে বা দুঃখিত হয় বলিয়া; নমিতা পারিবারিক ঘটনার বহির্ভূত সমস্ত সংবাদ যথাসম্ভব কাট্‌ছাঁট্ করিয়া তাহাকে জানাইত। অনিলও দূরে থাকিয়া একমাত্র স্মিথের প্রশংসা ছাড়া আর কাহারও সংবাদ পাইত না। আজ নমিতা তাহাকে হাঁস্‌পাতাল-সংক্রান্ত সকল কথাই খুলিয়া লিখিল; আর ইহাও লিখিল যে, এরূপ সব উদ্ধতচেতা খাম-খেয়ালী প্রভুর মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হইলে, ক্রমে নিজের ন্যায়ান্যায়-বোধ ও মনুষ্যত্ব-জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়া চলা ভিন্ন গতি নাই। কাজেই এখানে বেশি দিন টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা সকলের উপর। কিন্তু মানুষকেও ঈশ্বর চেষ্টা ও চিন্তা করিবার শক্তি দিয়াছেন; সুতরাং, কুম্ভকর্ণের নিশ্চিন্ত-নিদ্রা-অবলম্বনে উদাসীন থাকা অনুচিত বিবেচনায় নমিতা অন্যত্র চেষ্টা দেখিতেছে। এখন অনিলের অনুমতি প্রার্থনীয়।

নমিতা হিসাব করিয়া দেখিল এই পত্র অনিলের হাতে গিয়া পৌছিবার ঠিক্ সাতদিন পূর্ব্বে তাহার চরম পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। উদ্বেগে দুর্ভাবনায় সারা রাত্রি আর সে ঘুমাইতে পারিল না; থাকিয়া থাকিয়া একটা রুক্ষ ঔদ্ধত্য তাহার মনের মধ্যে অপমানের ঝঞ্ঝনা হানিতে লাগিল! নির্ম্মম দাসত্ব-সম্মান। অতিনির্ম্মম! এক-একবার পাচকের কথা মনে হইতে লাগিল। যদি কেহ তাহার কোনও সংবাদ আনে, তাই উৎকর্ণ হইয়া সে পথের দিকে কান পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার অন্য চিন্তায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

সারা রাত্রি কাটিল। পরদিন বেলা বারটার সময় সুরসুন্দর হাঁসপাতাল হইতে জনৈক কুলির হাতে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া পাঠাইল, "বিমলবাবু, বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলাম, পাচক তাহার ঔষধের শিশি ও গায়ের কাপড় লইয়া একজন পরিচিত লোকের সহিত, কাল সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে তাহার দেশের দিকে গিয়াছে। খুব সম্ভব সে নিরাপদেই দেশে গিয়া পৌছাইবে। এখন হৈ চৈ করিয়া লাভ নাই। ব্যাপারটা চাপিয়া যাওয়াই সকলের পক্ষে মঙ্গল।"

নমিতা নূতন ভাবনায় পড়িল। টাকাগুলি কেমন করিয়া সকলের অগোচরে ডাক্তার-বাবুর স্ত্রীর কাছে পৌছাইয়া দেওয়া যায়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গান।

(মূলতান)

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
হৃদয় উদাসে!
কোথা তুমি প্রিয়তম,
পরাণ উছাসে!

তোমায় আজি পেলে প্রাণে,
ভরাই হৃদয় গানে গানে,
জীবন-ভরা অশ্রু আমার
মুছাই নিমেষে!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তারকেশ্বর।

তারকেশ্বর হুগ্‌লি-জেলার অন্তঃপাতী শ্রীরামপুর 'সব-ডিভিসনে'র একটি গ্রামমাত্র। ইহা শিবের জন্যই বিখ্যাত। ষ্টেশন হইতে মন্দিরটি প্রায় ৫০০ গজ দূরে অবস্থিত। সকল দিনেই দেবদর্শনার্থ লোকে এখানে সমাগত হয়; তবে সোমবারই অতিপ্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এখানে

আসিবার জন্য বৎসরের কোনও কাল নির্দ্দিষ্ট নাই। সকল ঋতুতে এবং সকল দিনেই এখানে আসিবার নিয়ম আছে। মহাদেবের পূজার জন্য জমীদারি আছে। তাহার উপস্বত্ব হইতে দেবপূজা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেবদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিদিগের পূজা হইতেও মন্দিরের বিলক্ষণ আয় হইয়া থাকে। মহান্ত শিবের পূজার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যাহা কিছু আয় হয়, সারাজীবন তিনিই তাহার ভোগ করেন। তারকেশ্বরে দুইটি মেলা হইয়া থাকেঃ—প্রথমটি শিবরাত্রের সময়; এবং দ্বিতীয়টি চৈত্রমাসের সংক্রান্তির সময়। শিব-রাত্রে অন্যূন বিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই সময় লোকেরা নির্জ্জল উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিয়া শিবপূজা করে। শিবরাত্রের মেলাটি তিন দিন থাকে। দ্বিতীয় মেলাটি চড়ক-পূজায় হয়। চৈত্রমাস ব্যাপিয়া শূদ্রসন্ন্যাসিগণ দিবাভাগে উপবাস করেন ও সূর্য্যাস্তে ভোজন করেন। চড়ক-সঙ্‌ক্রান্তির দিন তাঁহারা তারকেশ্বরে সমাগত হইয়া গৈরিক উত্তরীয় মোচনপূর্ব্বক শিবপূজা করেন। অধুনা চড়কোৎসব পূর্ব্বকালের ন্যায় ভয়াবহ নহে। পূর্ব্বে সন্ন্যাসিগণ স্বীয় চর্ম্মভেদ করিয়া ঘূর্ণি খাইতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কষ্ট যৎপরোনাস্তি হইত। এখন তাঁহারা কোমরে পেটি পরিয়া সেই পেটির সহিত চড়কগাছের আংটা লাগাইয়া ল'ন। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের কষ্টও হয় না এবং ঘূর্ণি খাইতে অনেক সুবিধা হয়।

তারকেশ্বরের মহাদেব সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, অযোধ্যার অন্তঃপাতী মহো-বাগোরকালিক-নামক স্থানের বিষ্ণুদাস-নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা মুসলমানদিগের অধীনে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া সহচর-সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমনপূর্ব্বক হরিপাল-নগরের সন্নিকটস্থ বলাগোড়ের রামনগর-নামক গ্রামে উপস্থিত হ'ন্‌। তাঁহার সহিত পাঁচশত অনুচর ছিল। এতদ্ব্যতীত একশতজন কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণও তাঁহার সহিত ছিলেন। নবাগত-ব্যক্তিদিগের বিচিত্র বেশ, বিচিত্র কেশ, বিচিত্র শ্মশ্রু প্রভৃতি ও তাহাদিগকে শস্ত্রপাণি দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাহা-দিগকে দস্যু বিবেচনা করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট তাহাদিগের আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করে। ফলে নবাব-কর্ত্তৃক রাজা আহূত হ'ন্‌। তখন রাজা স্বয়ং নবাবের সহিত সাক্ষাৎকারে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া থাকিবার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। নবাব রাজার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ চাহিলে রাজা উত্তপ্ত লৌহশলাকা হস্তে ধারণ করেন এবং তাঁহার কোনও দুরভিসন্ধি না থাকাতে তিনি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলেন না। তদ্দর্শনে নবাব তাঁহাকে ৫০০ বিঘা জমি থাকিবার জন্য দান করেন। এই জমীগুলি তারকেশ্বরের চারি মাইল দূরে অবস্থিত।

রাজা বিষ্ণুদাসের বরমলসিংহ-নামক জনৈক ভ্রাতা ছিলেন। ইনি সন্ন্যাসধর্ম্ম-পরিগ্রহ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তারকেশ্বরের জঙ্গলে তাঁহার অবস্থিতি-কালে একদা তিনি দেখিলেন যে, অনেকগুলি পয়স্বিনী গাভী দুগ্ধভারে মন্দ-গতি হইয়া বনে প্রবেশ করিল কিন্তু বন হইতে প্রত্যাগমনকালে তাহারা দুগ্ধভার-বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছে। তখন তাঁহার মনে

কৌতূহল জন্মিল যে, কে এই গাভীগুলিকে দোহন করিয়াছে? অনুসন্ধানেচ্ছু হইয়া তিনি একদিন গাভীদিগের সহিত বনে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু যাহা তিনি দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি দেখিলেন, গাভীগুলি একখণ্ড প্রস্তরের উপরে পর্য্যায়ক্রমে যাইয়া দণ্ডায়মান হইতেছে ও তাহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধধারা স্বতঃই নিঃসৃত হইয়া প্রস্তরোপরি পতিত হইতেছে। নিকটে সমাগত হইয়া আরও দেখিলেন যে, প্রস্তরটিতে রাখালগণ ধান কুটিয়া খাওয়াতে তথায় একটি গহ্বর হইয়া গিয়াছে; সেই গহ্বরেই দুগ্ধধারা পতিত হইতেছে। রাত্রে তারকেশ্বর মহাদেবের আকৃতিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "প্রস্তরটি স্থানান্তরিত না করিয়া তদুপরি তুমি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও। তুমিই সেই মন্দিরের প্রথম মোহান্ত হইবে।" বরমলসিংহ স্বীয় ভ্রাতাকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অবগত করাইলে উভয় ভ্রাতা মিলিত হইয়া একটি মন্দির নির্ম্মিত করেন। দেবাদেশানুসারে বরমলসিংহ তাহার প্রথম মোহান্ত হ'ন। কালে মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ত্তমান মন্দিরটি বর্দ্ধমানের মহারাজ নির্ম্মাণ করান। হাবড়া-নিবাসী চিন্তামণি দে মন্দিরের সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের একটি দালান প্রস্তুত করাইয়া দেন। চিন্তামণিবাবু অসাধ্য রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি এই মানস করেন যে, যদি তিনি রোগমুক্ত হ'ন তবে একটি দালান তৈয়ার করিয়া দিবেন। রোগমুক্ত হইলে তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। অসাধ্য-ব্যাধিগ্রস্ত হইলে লোকে তারকেশ্বরে আসিয়া হত্যা দেয়। স্বপ্নে যেরূপ আদেশ হয় তদ্রূপ করিলে লোকে রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

মোহান্তকে অবিবাহিত থাকিতে হয়। ইনি দশনামি-সন্ন্যাসিদলভুক্ত।

খড়দহ—(খড়্দা)।

খড়দহ বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারাকপুর 'সবডিভিসনে'র একটি গ্রামমাত্র। ইহা হুগ্‌লি-নদীর উপর অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা ১৭৭৭ জন। স্থানটী বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান। চৈতন্য-মহাপ্রভুর চেলা নিত্যানন্দ এইস্থানে বাস করিতেন। এতদ্ধেতু ইহা বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত প্রিয়। প্রবাদ এইরূপ যে, নিত্যানন্দ এস্থানে সন্ন্যাসিবেশে সমাগত হইয়া হুগ্‌লি-নদীতটে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন হঠাৎ তিনি একটী রমণীর অরুন্তুদ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক রমণীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রমণী বলিল যে, তাহার একমাত্র প্রাণসমা কন্যা বিগতজীবন হইয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কন্যাটী মরে নাই; নিদ্রা যাইতেছে। এ কথায় রমণীর কিন্তু প্রতীতি জন্মিল না। রমণী বলিলেন, যদি তিনি কন্যাকে সঞ্জীবিতা করিতে পারেন, তবে রমণী তাঁহার দাসী হইবেন। সন্ন্যাসী-ঠাকুরের অমত ছিল না। তিনি একে সন্ন্যাসী; তাহার উপর অকৃতদার। সুতরাং, এরূপ মাহেন্দ্রযোগ পরিত্যাগ করা অনুচিত বোধে তিনি কন্যাটীকে সঞ্জীবিতা করিয়া রমণীটীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। এখন সংসারে সন্ন্যাসী-ঠাকুর একা নহেন যে, যথাতথা

থাকিবেন। এখন তাঁহার একটী বাটীর আবশ্যকতা। জমীদারকে না ধরিলে স্থান পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া, তিনি জমিদারের নিকট গমন করিয়া স্থান প্রার্থনা করিলে, জমিদার দহে (নদীতে) একগাছা খড় নিক্ষেপ করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমার থাকিবার স্থান ঐখানে। নিত্যানন্দ প্রভাবশালী ব্যক্তি; তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই দহের জল তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল এবং তাঁহার থাকিবার উপযুক্ত একটু স্থান বাহির হইল। এইজন্যই গ্রামটি খড়দহ-নামে খ্যাত।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র হইতে খড়দহের গোঁসাই-বংশের উৎপত্তি। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। দোলযাত্রা ও রাসের সময় খড়দহে মেলা হইয়া থাকে। এখানে শ্যামসুন্দরের মন্দির আছে।

তিনশত বৎসরের অধিক হইল রুদ্র-নামে জনৈক হিন্দুযোগী শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বল্লভপুরে আসিয়া বসতি করেন। স্বপ্নে রাধাবল্লভ তাঁহাকে দেখা দেন ও গৌড়ে যাইয়া রাজধানীর দরজার উপরিস্থ প্রস্তর আনয়ন করিয়া দেবমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। রুদ্র গৌড়ে মুসলমান রাজপ্রতিনিধির মন্ত্রীর নিকট যাইয়া দেবাদেশ জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রি-মহাশয় হিন্দু ছিলেন। দেবাদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি প্রস্তরটীকে দেখিতে আসেন। এমন সময় দেখা গেল যে, প্রস্তর হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছে। তখন উপায় উদ্ভাবন করিতে আর বিলম্ব হইল না। তিনি অবিলম্বে স্বীয় মনিবকে তথায় আনাইয়া দেখাইলেন যে, প্রস্তরটী ক্রন্দন করিতেছে। এরূপ অপয়া প্রস্তর রাজবাটীতে রাখিতে নাই; সুতরাং, প্রস্তরটী দূর করা আবশ্যক। মুসলমান মনিব তৎক্ষণাৎ প্রস্তুটী অপসৃত করিতে আদেশ দিলেন। রুদ্র তখন প্রস্তরটীকে নৌকার উপর আনয়ন করিলেন। কিন্তু তাহা এত বৃহৎ যে নৌকায় তাহার স্থান হইল না। মাঝিরা নৌকা হইতে প্রস্তরটীকে জলে ফেলিয়া দিল। দৈবকৃপায় সেই প্রস্তর ভাসিতে ভাসিতে বল্লভপুরে পহুছিল। তখন সেই প্রস্তর হইতে তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মিত করা হয়। যথা, বল্লভ, শ্যামসুন্দর ও নন্দদুলাল।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র একটি মূর্ত্তি লইতে বাসনা প্রকটিত করেন কিন্তু, রুদ্র তাহাতে সম্মত নহেন। একদিন রুদ্র পিতৃ-শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন এরূপ সময় বীরভদ্র নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধ সময়ে বৃষ্টি আসিয়া পিতৃকৃত্যে বাধা দিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বীরভদ্র তখন করযোড়ে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। দৈব-শক্তিতে তথায় বৃষ্টি পতিত হইল না; কিন্তু তাহার চতুঃপার্শ্বে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। রুদ্র ব্যাপার-দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং বীরভদ্রকে একজন অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। সময় বুঝিয়া বীরভদ্র একটি মূর্ত্তি প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রও আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি দান করেন। এই মূর্ত্তিটী এখন খড়দহে আছে। রাধা-বল্লভের মূর্ত্তিটী বল্লভপুরে এবং নন্দদুলালের মূর্ত্তি সাহিবানা-নামক গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামটী ব্যারাকপুর হইতে তিন মাইল দূরে

দৃষ্ট হইয়া থাকে। একদিনে উক্ত মূর্ত্তিত্রয় দর্শন করিলে অনেক পুণ্য সঞ্চিত হয়। খড়দহের বৈষ্ণব মন্দিরের অদূরে ২৪টী শিব-মন্দির আছে।

খড়দহে জুতার ব্রুস্ ও ইঁট বহুল পরিমাণে তৈয়ার হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নব স্মৃতি।

মৃত-সঞ্জীবনী তোমার রাগিণী
মানস-তটিনী-তট উছলিয়া,
নব অনুরাগে বিনোদ সোহাগে
কোন্ শুভযোগে উঠিল বাজিয়া!
উঘারিয়া দ্বার হৃদয়ে আমার
প্রেমের ভাণ্ডার আছিল কি খোলা!
অলিকুল গুঞ্জে কুসুমের পুঞ্জে
পরাণের কুঞ্জে দি'ছিল কি দোলা?

বুঝি শুভ খনে অন্তর-গগনে
কবে কোন্ দিনে জ্যোছনা ফুটিল;
তরল সুধার শশীটি আমার
পরি তারা-হার হাসিয়া উঠিল!
নাচিয়া কাঁদিয়া তাপিত এ হিয়া
দিনু কি সঁপিয়া চরণে তোমার?
মধুর বচনে তোষিয়া যতনে
নি'ছিলে কি টেনে দীন-উপহার?

এ ক্ষীণ যৌবনে কবে কোন্ খনে
তোমার স্পন্দনে ডেকেছিল বান?
তুমি কি হে বঁধু, লুঠেছিলে মধু,
এসেছিলে শুধু শুনিয়া আহ্বান?
বসন্তের গানে তোমার মিলনে
ভাঙা এই বীণে বেজেছিল সুর?
আজি কোথা তুমি, হে হৃদয়-স্বামী,
ভাবি দিন-যামী কোথা—কতদূর!

আজি যে লাঞ্ছিত, ওগো ও বাঞ্ছিত,
হইয়া বঞ্চিত তব অনুরাগে;
আজি মম বীণা বাজে না বাজে না
প্রেমের মূর্চ্ছনা ললিত সোহাগে।
সুপ্ত এ জীবন, লুপ্ত ত্রিভুবন,
অলির গুঞ্জন থামিয়া গিয়াছে;
কোকিল-কাকলি পাপিয়ার বুলি
থেমেছে সকলি,—কলরব আছে!

দূরে—বহুদূরে লহরে লহরে
শুভ নব সুরে বাজিতেছে বাঁশী;
সুধা-তান তা'র শ্রবণে আমার
মথিয়া আঁধার আসিতেছে ভাসি!
আজি মনে পড়ে, নিকুঞ্জ-কুটীরে
বিনোদ বাহারে গেয়েছিনু গান;
আজি মনে পড়ে, বঁধুয়ার তরে
উঠেছিল সুরে আকুল আহ্বান!

পুনঃ বিনোদন! কর আগমন,
না-হয় যৌবন গেছে ফুরাইয়া;
যা' আছে এ ঘরে দিব তা' তোমারে,
এস হে অন্দরে আলো বিথারিয়া।
তোমার—তোমার, আমি যে তোমার!
কবে একবার দিছি ফিরাইয়া;
ওহে ভুলে যাও, আসিয়া দাঁড়াও,
সযতনে দাও ব্যথা মুছাইয়া।

দরবেশ।

মহাত্মা যিশু ও তাপস হোসেন মন্‌সুরের জীবনে সাদৃশ্য।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে দেখা যায়, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্ত সাধু মহাত্মগণ ধর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল নূতন সত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্যের প্রচার-কালে তাঁহারা কি কঠোর উৎপীড়নই না সহ্য করিয়াছিলেন !

মহাত্মা যিশুর জীবন-চরিতে দেখিতে পাই, তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি বিতাড়িত হইয়াছেন, প্রলোভনের সঙ্গে কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছেন এবং অবশেষে "মানব ঈশ্বরের সন্তান" এই নবসত্য প্রচার করিতে যাইয়া রাজাদেশে কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ হইয়া কণ্টক-মকুট মস্তকে ধারণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন !

মহাত্মা যিশুর ন্যায় মুসলমান তাপস হোসেন মন্‌সুরও "অনল্ হক্" (আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত) এই নব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া, নানা উৎপীড়ন সহ্য করিয়া অবশেষে তীক্ষ্ণ শূলাগ্রে কর্ত্তিত-পদ, কর্ত্তিতজিহ্ব ও উৎপাঠিত-চক্ষু হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই দুই মহাত্মার ধর্ম্মজীবনে এই একই আশ্চর্য্যজনক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাত্মা যিশু নরনারীর পাপ, মোহ ও অজ্ঞানতার কণ্টক সর্ব্ব অঙ্গে ও মস্তকে ধারণ করিয়া তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। তাহাতেই মানব পরিত্রাণের সমাচার পাইল; অজ্ঞানতা দূর হইল; মানব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইল। তখন মানব যিশুর নব সত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিল।

মহাত্মা হোসেন মন্‌সুরও যিশুর ন্যায় অনল্ হক্ "আত্মাই ব্রহ্ম" এই নব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া রাজাদেশে তীক্ষ্ণ শূলাগ্রে কর্ত্তিত-প্রত্যঙ্গ হইয়া ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিলেন,—"হে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, তুমি ইহাদিগকে কৃপা কর। এ দেহ কিছুই নয়, আত্মাই সর্ব্বস্ব, সেই স্থলেই তোমার প্রকাশ;—আত্মাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। আমার হস্ত, পদ, চক্ষু সকলই যাইল; জিহ্বাও এখনি যাইবে, কিন্তু প্রাণ আমার তথাপি বলিবে 'অনল হক্ (অহং ব্রহ্ম)।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার জীবন শেষ হইল।

দর্শকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; বলিল, "আমাদের কি ভ্রম ! আমরা ইঁহাকে অবিশ্বাসী কাফের বলিয়াছিলাম। ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-বিশ্বাসী। স্বয়ং ঈশ্বরই ইঁহার মুখ হইতে "অহং ব্রহ্ম" (অনল হক্) এই মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া ইহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হই নাই। আজ ইনি জীবন দান করিয়া এই নব মহাসত্য মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন যে, শরীর কিছুই নয়; আত্মাকে জান; আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত; আত্মাই আমি; 'অনল হক্'।"

শ্রীমতী—

আত্মার অমরত্ব।

কত অণু-পরমাণু-গঠিত শরীর,
রক্ত-মাংস-মেদ-পূর্ণ হয়েছে দেহীর!
চক্ষু কর্ণ নাসিকা সে সুন্দর বদন,
উজ্জ্বল লাবণ্য-রাশি মুগ্ধ করে মন!
অমিয় বচন-রাশি শ্রবণ জুড়ায়,
মানুষ সুন্দর রূপে জগৎ মাতায়!
হেন দেহে মানবের কতই যতন,
তিলেক হইলে ত্রুটি ভাবে অনুক্ষণ!

হেন দেহে সুখ-তৃষ্ণা অসীম ধরায়;
বল দেখি ক'দিনের সেই সমুদায়?
ধন-মান-পুত্রে লোক বিপুল আশায়—
বাহ্ সে অনিত্য সুখে, উন্মত্ত ধরায়;
কিন্তু হায়, অন্তরের আত্মা যায় ভুলে!
সকলি অসার কার্য্য;—ভ্রম দেখি মূলে!

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

অদৃষ্টলিপি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রমাকান্ত চলিয়া যাইলে ভুবনেশ্বরী সমস্ত বাড়ী অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সব চেয়ে তাহাদের শয়নগৃহে বড়ই শূন্যতা বোধ হইল। যেখানে 'চেয়ারে'র উপরে রমাকান্ত বসিতেন, যেখানে বসিয়া পত্নীর সহিত ধর্ম্মা-ধর্ম্মের কথা, কর্ম্মাকর্ম্মের কথা, দেশের কথা, সংবাদপত্রের মর্ম্মকথা, নিজোদয় আশা-ভরসার কথা বলা-বলি করিতেন, সেই সব স্থান প্রতিক্ষণে বৃশ্চিকরূপে ভুবনেশ্বরীকে দংশন করিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরীর বড় কান্না আসে; কিন্তু তাহার চক্ষে জল দেখিলে তাহার শিশু পুত্র সুধীর খেলা-ধূলা ছাড়িয়া মায়ের মুখের পানে আকুলনেত্রে চাহিয়া থাকে; সেটা তো সহ্য করা যায় না। তখন ছেলেকে কোলে তুলিয়া চুমা খাইয়া তাহাকে, হয় খেলানা, না হয়, খাবার দিতে হয়। তাহার স্নেহময় দাদা গোপীনাথও কত রকম সান্ত্বনা ও সহানুভূতি করেন। কখনও তিনি বলেন, "আজ তুই চুল বাঁধিস্ নি কেন, ভানু?" কখনও বা তিনি বলেন, "তোর মুখখানি দিনে দিনে যেন শুকিয়ে যাচ্ছে; নিজের খাওয়া-দাওয়ার দিকে তুই মোটেই যত্ন করিস্ না, এ তোর বড় দোষ। বউকে নিয়ে আস্‌তে বলিস্ তো এনে দিই। তা সে আবার বাড়ীঘর ছেড়েই বা কি করে আস্‌বে? তা লক্ষ্মী দিদিটী আমার! তুমি নিজের প্রতি একটু বিশেষ যত্ন কোরো।" গোপীনাথ মনে মনে জানিতেন, তাঁহার স্ত্রী মোহিনী বড় স্বার্থপরায়ণা, বড় মুখরা এবং বড়ই গর্ব্বিতা। তাহার জন্য গোপীনাথ এক-দিনের জন্যও একটু শান্তি পা'ন নাই। তাহাকে ভুবনেশ্বরীর নিকটে আনা কোনও মতে সঙ্গত নহে। যাহা হউক, সহোদরের সান্ত্বনা ও স্নেহে ভুবনেশ্বরী অনেক তৃপ্তি লাভ করিত। তবে রাত্রে যখন দাদা ঘুমাইতেন, খোকা ঘুমাইত, তখন প্রাণাধিক স্বামীর মধুমাখা স্মৃতি অগ্নিমাখা হইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রাণ পর্য্যন্ত

দগ্ধ করিত। তখন ভুবনেশ্বরী যুক্তকরে ডাকিত,"হে ভগবন্, তাঁকে ভাল রাখ ; তিনি ভাল আছেন্, সেই সংবাদ আমায় দাও।"

ভুবনেশ্বরীর এই রকম কাতরতার আরও একটী বিশেষ কারণ ছিল। তাহা বলিতেছি।

রমাকান্ত প্রাবাসে যাইবার পূর্ব্বদিনে দ্বিপ্রহরে নীচের তলায় বৈঠক্‌খানায় বসিয়া "বেঙ্গলি"-কাগজ পড়িতেছিলেন ও সদর দরজা খুলিয়া রাখিয়া, দ্বারবান্ রামদীন পাঁড়ে বেঞ্চির উপরে ঘুমাইতেছিল। রমাকান্ত সহসা মনুষ্যাগমন অনুভব করিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, পার্শ্বে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে।

রমাকান্ত দেখিলেন, আগন্তুকের বয়স নবীন, আকৃতি সুন্দর, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা, হস্তে ত্রিশূল ও পরিধানে গৈরিক বস্ত্র। বিস্মিত ভাবে রমাকান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি ?" আগন্তুক বলিল, "নবীনানন্দ স্বামী।"

ভিক্ষুক বা অতিথি পাইলে রমাকান্ত তাড়াইয়া দিতেন না ; যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি নবীনানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চান্ আপ্‌নি ?"

নবীনানন্দ উত্তর করিলেন, "আপাততঃ কিছুই নয়।"

রমাকান্ত বলিলেন, "বসুন।"

নবীনানন্দ বসিলেন না ; রমাকান্তের মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাবুজী প্রবাসে যাইতেছেন ?"

রমাকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কোথায় শুনিলেন ?"

ধীরে ধীরে নবীনানন্দ বলিলেন, "কোথাও শুনি নাই। আপনার অদৃষ্টলিপি দেখিতেছি।"

এ রকম ভাগ্যগণনায় যদিও রমাকান্তের বড় বিশ্বাস ছিল না ; তথাপি তিনি বলিলেন, "আবার ফিরে আস্‌ব কবে, বলুন দেখি ?"

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া নবীনানন্দ বলিলেন, "আপনার পত্নী পতিব্রতা সতী। তাঁহার একটী শিশুপুত্র আছে।"

রমাকান্ত চমৎকৃত হইলেন।

নবীনানন্দ পুনরপি বলিলেন, "ডাক্তারবাবু ! এ সুখের গৃহ ছাড়িয়া পুরুষোত্তমে গিয়া কি হইবে ?—আপনি যাইবেন না।"

রমাকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তা কি হয় ? এতটা প্রস্তুত হইয়া একটা পথের লোকের কথায় নিরস্ত হওয়া—ছি ! ছি ! তা কি হয় ?

কিছু ক্ষণ দুইজনেই নীরব। তারপরে নবীনানন্দ কহিলেন, "বাবুজী ! না গিয়া পারিবেন না। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইবেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমাকান্ত বলিলেন, "কেন ?"

ত্রিশূলধারী একটু বিলম্বে বলিলেন, "হয় তো শীঘ্র আসিতে পারিবেন না ! অদৃষ্টলিপি পাঠ করা কাহার সাধ্য ?"

এবার বিদ্রূপের ভাবে রমাকান্ত বলিলেন, "আপনার সাধ্য আছে বৈ কি ?"

নবীনানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আমি অতিক্ষুদ্র ব্যক্তি। আমি গুরুদেবের দাসানুদাস।"

ত্রিশূলধারীর কথা যে রমাকান্ত সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পত্নী উদ্বি-

হইবে ভাবিয়া, তাহার কাছে তিনি সে-প্রসঙ্গমাত্র করিলেন না। তবে সেই দিন সন্ধ্যাকালে দুইজনে যখন বারান্দায় বসিয়াছিলেন, তখন রমাকান্ত কথায় কথায় বলিলেন, "দেখ! মনুষ্য-জীবন তো নশ্বর। যদি আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন সহসা চলে যাই, তবে যে জীবিত থাক্‌বে, সুধীরকে প্রকৃত মানুষ করা তা'রই প্রধান কর্ত্তব্য হবে; এ আমাদের মনে রাখা আবশ্যক।"

শরীরের যেখানে বেদনা, সেই স্থানে আঘাত লাগিলে ব্যথী যেমন কাতর হইয়া পড়ে, স্বামীর কথা শুনিয়া ভুবনেশ্বরী তেমনি কাতর হইয়া পড়িল। সে বলিল, "তুমি অমন কথা বোলো না; শুন্‌তে আমার ভয় করে। আমি যেন জন্ম-এয়োতী হয়ে, সুধীরের সকল ভার তোমার ওপরে দিয়ে চলে যাই।" অবশ্য রমাকান্ত সহধর্ম্মিণীকে, হাসিয়া, আশ্বাস দিয়া আদর করিয়া সে ব্যথা ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি চলিয়া গেলে ভুবনেশ্বরীর মনে সেই কথা, সেই "পোড়া কথা" বারংবার জাগিত। তাহার স্বামীর জন্য এত অধিক কাতরতার প্রধান কারণ তাহাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমা—

প্রতীক্ষা।

জীবনে আমার সে-দিন কবে
আসিবে বিশ্বভূপ,
সবার মাঝারে যে-দিন আমি
দেখিব তোমার রূপ?
সংসার-মাঝে নির্ব্বোধ, তাই
বল গো অন্তরযামী,
কোন্ শুভদিনে তোমারে প্রভু
বুঝিতে পারিব আমি?

আছে মোর কান তবুও বধির;
কিছু না কখনো শুনি!
কবে গো শুনিব মঙ্গলময়,
তোমার অমৃতবাণী?
আমাদের মাঝে শুভাশীষ তব
কবে গো আসিবে নেমে,
শুষ্ক হৃদয় কবে গো আমার
ভরিয়া উঠিবে প্রেমে।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অশ্ব।

অশ্বের যত্নের ভার সহিসের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। কিন্তু তা বলিয়া যে গৃহকর্ত্রী এ-বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকিবেন, তাহা নহে। গৃহকর্ত্রী যেটী স্বয়ং না দেখিবেন, সেটী অসম্পন্ন রহিয়া যাইবে। প্রত্যেক অশ্বের জন্য একজন ঘাসওয়ালা এবং প্রত্যেক তিনটী অশ্বের জন্য একজন সহিস নিযুক্ত থাকা চাই। অশ্বের জন্য কৈফিয়ৎ সহিসকে দিতে হইবে। সহিস ঘাসওয়ালার বিরুদ্ধে যদি কিছু

বলে, তবে তাহার প্রতি　　ব না। সহিসকে সকল বিষয়ে দায়ী করিলে তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে হইবে বলিয়া, তাহার অনেকটা সময় যাইতে পারে; কিন্তু কখনও কখনও তাহাকে পুরস্কার দিলে সে আর ক্ষুণ্ণ হইবে না। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর একবার এবং সন্ধ্যার পর একবার সহিস আসিয়া গৃহকর্ত্রীর নিকট হইতে হুকুম লইয়া যাইবে। এরূপ করিলে সে ঘোড়াকে জুতিবার পূর্ব্বে তাহাকে উত্তমরূপে খাওয়াইবার অবসর পাইবে।

প্রত্যূষে ঘোড়ার দানার সিকি অংশ ঘোড়াকে খাওয়ান চাই। গ্রীষ্মকালে দানা খাওয়াইবার পূর্ব্বে ঘোড়াকে সামান্য জল খাওয়ান উচিত। শীতকালে এরূপ প্রথা অবলম্বন করার কোন প্রয়োজন নাই। দানা খাওয়ানর পর হাল্‌কা মালিশের আবশ্যক। ঘোড়ার গাত্রবস্ত্র উদ্ঘাটিত করিয়া একটী কোণে রক্ষা করিবে। অতঃপর অশ্বশালাকে পরিষ্কার করিবে। ইহার পর ঘাসওয়ালাকে ঘাস আহরণের জন্য পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু তাহাকে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিবে।

অশ্বারোহণের পর অশ্বকে ধরিবার জন্য সহিস অশ্বশালার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং ঘোড়ার উপর একখানা বস্ত্র রাখিয়া তাহাকে পাদচারণা করাইবে। এতদ্দ্বারা অশ্বের শৈত্য লাগিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ঘোড়া দলা হইলে তাহাকে জল খাওয়াইয়া অল্প পরিমাণে ঘাস খাইতে দিবে। ইতোমধ্যে যে সকল ঘোটক চড়া হয় নাই, তাহাদিগকে ঘুরাইয়া লইয়া আসিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের পর তাহাদিগকে জলপান করাইবে। অতঃপর সকল ঘোড়াগুলিকে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য শস্য খাইতে দিবে। বেলা তিনটার সময় তাহাদিগকে পুনরায় জল খাওয়াইয়া ৪টার সময় তাহাদিগকে পুনরায় শস্য খাইতে দিবে। অনন্তর উত্তমরূপে দলার পর তাহাদিগকে সান্ধ্য ব্যায়ামের জন্য বাহির করিবে। তাহারা প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগকে রাত্রিকালের জন্য ভোজন করাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ঘোড়াকে আহার তিনবার দেওয়া উচিত। ইহার কম আহার দেওয়া উচিত নহে। ছোলা শুষ্ক দেওয়াই বিধি; অথবা তাহাতে সামান্য জলের ছিটা দিতে পার। ঘোড়াকে ছোলা খাওয়াইবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে জল পান করাইবে; কিন্তু ছোলা খাওনর অব্যবহিত কাল পরে জল দিবে না।

একই আহার প্রতিদিন খাওয়ান উচিত নহে। তাহাতে স্বাস্থ্য বজায় থাকিতে পারে না। আহারের পরিবর্ত্তন স্বাস্থ্য-রক্ষার একটি প্রধান উপায়। শস্য খাওয়াইতে হইলে তাহার সহিত যব, ছোলা বা জৈ-চূর্ণ দিতে পারা যায়।

ঘোড়াকে সপ্তাহে একবার চোকর-মণ্ড খাওয়ান উচিত। এক বা দুই সের গাজর, কাঁচা গম, লুসার্ণ, ঘাস অথবা ইক্ষু যদি প্রত্যেক দিন খাওয়ান হয়, তবে ঘোড়ার স্বাস্থ্য অতিশয় উত্তম থাকে। ঘোড়ার কোনরূপ অসুখ হইলে সহিস যেন গৃহকর্ত্রীর নিকট গোপন না করে। যদি সময়ে সময়ে সহিসকে বক্সিস দেওয়া হয়, তবে সে কিছুমাত্র গোপন করিবে না।

শীত-সমাগমে অশ্বশালায় নিযুক্ত ভৃত্য-গণকে একখানা করিয়া কম্বল দিবে; নতুবা তাহারা ঘোড়ার কম্বল চুরি করিবে। অর্থের অস্বচ্ছলতা থাকিলে কম্বল তাহাদিগকে একেবারে দান করিবে না; বরং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, চাকুরি পরিত্যাগ করিলেই কম্বল ফেরৎ দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে কম্বলকে ধৌত করাইয়া গৃহে রাখিয়া দিবে।

ঘোড়া যদি উত্তমরূপে দলা হয় তবে তাহারা অত্যন্ত আব্ হাওয়ার অনুভাবক হয়। সুতরাং, ঘোড়ার কাপড় দিতে কখনও ক্ষুন্ন হইও না। যদি ঘোড়াকে সুস্থ রাখিতে হয়, তবে এরূপ করিতেই হইবে।

অশ্বশালার মেজে কাঁচা মৃত্তিকার হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সমতল হওয়া চাই। বন্ধুর মেজে ঘোড়ার কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। মেজেকে সপ্তাহে একবার গোবর, জল ও বালুকা দ্বারা লিপ্ত করা বিধেয়। খড় ঘোড়ার পক্ষে উত্তম বিছানা। যেখানে ঘাস অধিক সেখানে লোকেরা দূর্ব্বা ব্যবহার করিয়া থাকে। অশ্বশালায় ঘোড়াকে জলপান করাইবার জন্য একটা নাদ থাকা উচিত। জল টাট্‌কা হওয়া চাই। বেশী জল পরিত্যাজ্য।

এক্ষণে অশ্বরথীদিগকে কি কি করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

(১) ঘোড়াকে আহার করাইবার পূর্ব্বে জলপান করিতে দিবে; পরে নহে।

(২) শস্য কখনও আর্দ্র দিবে না।

(৩) সামান্য রোগ হইলে বা আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ত্রীকে জানাইবে।

(৪) ঘাসকে উত্তমরূপে পিটিয়া খাওয়াইবার একদিন পূর্ব্বে শুষ্ক করিতে দিবে।

(৫) ঘোড়া দলিতে হইলে দুইজনে দলাই বিধি।

(৬) ঘোড়ার পা কখনও ধৌত করিবে না। যদি কচিৎ ধৌত করা হয় তবে উত্তম-রূপে শুষ্ক করিতে হইবে।

সহিস যে কেবলমাত্র ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করিয়াই পরিত্রাণ পাইবে, তাহা নহে; তাহাকে ঘোড়ার সাজের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জিন্‌কে সাবান-দ্বারা সপ্তাহে এক-বার ধৌত করিলেই যথেষ্ট। ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিবার জন্য রেকাব প্রভৃতি লৌহ-পদার্থ শুষ্ক বালুকা দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হইবে। যদি জলে ধৌত করা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে জীনের মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে নষ্ট করে; সুতরাং, জীন্ রাখিবার স্থানের উপর কর্পূরের পুটুলি বা নিমপাতা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

বড় ও ছোট।

মোটর সম্ভাষি' কহে গরুর গাড়ীরে
"ধিক্ তোরে, মন্দবেগ ধরিস্ রে অতি।"
বিনয়ে গরুর গাড়ী উত্তরিল তারে
"বিকল হইলে তুমি আমি তব গতি।"

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

তপস্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৭)

বাংলা-দেশে মেয়ে দশ বৎসরে পড়িলেই তাহার বিবাহ দিতে হয়। নচেৎ সমাজ বড় চটেন! আত্মীয়-বন্ধুগণ কন্যার মাতাপিতাকে ঘৃণা করেন। প্রতিবেশিবর্গের হাসি-টিট্‌কারির জ্বালায় কন্যার মাতাপিতাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। যদি কাহারও কন্যা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে এমন বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইতে থাকে যে, তাঁহার নিরুদ্বেগে দিনযাপন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এ-দিকে প্রচুর অর্থের সংস্থান করিতে না পারিলেও কন্যার সৎপাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। কন্যাটী যতই সুন্দরী বা সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া হউক্ না কেন,—মনোমত দক্ষিণা না পাইলে কোনও ভদ্রনামধারী ব্যক্তি সে-কন্যা গ্রহণ করেন না। কাজেই বাংলাদেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া একটা বিষম সর্ব্বনাশের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই কন্যার বিবাহে বাঙ্গালীর গৃহে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দই অধিক দৃষ্ট হয়। তাই বাঙ্গালীর কন্যার জন্মমাত্র কি এক অশুভ আশঙ্কায় মাতাপিতার প্রাণ কাতর হয়। যেন একটা দারুণ অভিশাপ লইয়া বাঙ্গালায় রমণী জন্মগ্রহণ করে। আমাদের বালিকা বিভাও হতভাগিনী বঙ্গবালা। তাই দশম বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতে তাহার পিতা এবং মাতা বিভার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

বিভার পিতা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি নহেন। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে কোনও 'মার্চ্চেণ্ট'-আফিসে তিনি কেরাণীগিরি করেন; অনেকগুলি পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ তাঁহাকে করিতে হয়। আয় সামান্য বলিয়া বাসের বাড়ীখানির অর্দ্ধাংশ ভাড়া দিতে হইয়াছে; অপরার্দ্ধাংশে কায়ক্লেশে তাঁহারা বাস করেন। তাহাকে আরও দুইটী কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রীত্যানুযায়ী দক্ষিণাদানে অশক্ত হওয়ায় কন্যাগুলি মনোমত পাত্রে অর্পিত হয় নাই। দুইটীকেই যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ পাত্রের হস্তে অর্পণ করিতে হইয়াছে। প্রথম পক্ষের পাত্রের দর বড় চড়া; দরিদ্রের সে বাজারে প্রবেশ করিবার সাধ্য বা অধিকার নাই। বিভার জন্যও তিনি তাঁহার অবস্থার অনুযায়ী পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের আদৌ ইচ্ছা নহে যে, এমন প্রস্ফুটিত-গোলাপতুল্য সরলা বালিকা-ভগ্নীটিকে একটী বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করা হয়। কিন্তু মনের বাসনা থাকিলে কি হইবে? তাহার ত অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই! অর্থ ব্যতীত মনের মত পাত্র সে কোথায় পাইবে? সে চায় সর্ব্বগুণান্বিত একটী যুবকের হস্তে তাহার এই আদরিণী কনিষ্ঠা ভগ্নীটিকে প্রদান করে। অমৃতে অরুচি কাহার? কিন্তু অমৃত কিনিতে হইলে অর্থের আবশ্যকতা। অতুলের সে অর্থ কোথায়? অনেক ভাবিয়া

চিন্তিয়া একদিন সে সুধীরের কাছে বিভার বিবাহের কথা উত্থাপন করিল এবং সুধীর যাহাতে বিভাকে বিবাহ করে, সে অনুরোধও করিল।

সুধীর তাহাকে বলিল, "ভাই, তা'তে আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু বাবার অমতে ত বিয়ে কর্‌তে পার্ব্বো না।"

অতুল সাগ্রহে বলিল, "এই ত কথা!—যদি তাঁর মত হয়, তা'হ'লে তুমি ত বিনা দক্ষিণায় আমার বোন্‌টীকে বিয়ে কর্ব্বে?"

সুধীর বলিল, "নিশ্চয়।—আমরা দরিদ্র হ'লেও অর্থলোলুপ নই।"

সুধীরের কথায় তাহার বিশ্বাস হইল। কারণ, সুধীরের সহিত সে কমলাপুর গিয়া হরনাথবাবুকে দেখিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি যে অর্থ-পিশাচ হইতে পারে না, ইহা অতুল বুঝিল। তাই সে তাহার পিতাকে লুকাইয়া হরনাথবাবুকে এক পত্র লিখিল।

যথাসময়ে সে-পত্রের উত্তর আসিল। হরনাথবাবু আহ্লাদের সহিত জানাইয়াছেন যে, তিনিও সুধীরের বিবাহ দিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন। মেয়েটি যদি ভাল হয়, তা'হ'লে তাঁর এ-বিবাহে কোনও আপত্তি নাই। পত্র পাঠ করিয়া অতুলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহার আদরের ছোট বোন্‌টিকে যে একটা অপদার্থের হাতে পড়িয়া সারা জীবন অশান্তি ভোগ করিতে হইবে না; এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রিয়সুহৃদ্ সুধীর যে তা'র স্বামী হইবে; ইহা অপেক্ষা অতুলের আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? হায়! সংসারানভিজ্ঞ যুবক! এ-সংসারের কূট অভিসন্ধি তুমি এখনও কিছুই জান না!

পত্র-হস্তে অতুল একমুখ হাসি লইয়া মাতার নিকটে গিয়া বলিল, "মা, বিভার বিয়ের জন্যে আর তোমাদের ভাব্‌তে হবে না। আমি তা'র খুব ভাল পাত্র ঠিক্ করিছি।"

মাতা সাগ্রহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রে,—কোথায়?"

অ। এইখানেই।

মা। কি দিতে থুতে হবে?

অ। দিতে থুতে কিছু হ'বে না।—তবে আমরা মেয়ের গা সাজিয়ে এক এক খানা গহনা দেবো। তা'রা যেন ভদ্রলোক কিছু নেবেন না; তা'বলে আমাদের একেবারে কিছু না দেওয়া কি ভাল হয়? কি বল মা? কিন্তু এমন পাত্র লোকে টাকা দিয়েও পায় না।

মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমাদের পোড়া বরাতে কি আর এমন সুবিধে জুট্‌বে বাবা!"

অতুল হাসিয়া বলিল, "জুট্‌বে কি? জুটেচে! এখন বাবাকে ব'লে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়েটা দিয়ে ফেল! কি জানি নইলে হয় ত ফস্কে যেতে পারে।"

মা। পাত্রটী কে শুনি?

অ। আমাদের সুধীর গো—সুধীর।

মাতা, "ও—মা তাই বল!" বলিয়া নীরব হইলে, অতুল বলিল, "কি মা, চুপ ক'রে রইলে যে?"

মাতা মুখে একটি দুঃখ-সূচক শব্দ করিয়া বলিলেন,—"আ আমার কপাল, সে কি হ'বার যো' আছে বাবা!"